ছোটগল্প সংগ্রহ

তৃতীয় খণ্ড

ছোটগল্প সংগ্রহ

প্রমথনাথ বিশী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

অশোককুমার কুণ্ডু

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী রেখা দে

উত্তরা প্রকাশনী

১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৪

প্রথম প্রকাশ :

মহালয়া, ১৩৭২

প্রচ্ছদ :

শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৪

সম্পাদকীয়

'ছোটগল্প সংগ্রহ' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে প্রকাশের ব্যবধান প্রায় দু'বছরের। বিদ্যুৎ ও কাগজ যেভাবে ক্রমশঃই দুর্লভ হয়ে উঠছে তাতে এই পর্যায়ের চতুর্থ বা শেষ খণ্ডটি কবে প্রকাশিত হবে জানি না। তবে প্রমথনাথ বিশীরগল্পের পাঠকেরা যে আজও আগ্রহী তা তাঁদের প্রতিনিয়ত তাগিদদানেই আমরা অনুভব করতে পারছি এবং সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হতে পারল।

প্রথম দু'টি খণ্ডে আমরা যথাক্রমে ৫৩ ও ৪১টি গল্প প্রকাশ করেছিলাম, বর্তমান খণ্ডে আছে ৫২টি গল্প। ২য় খণ্ডে 'ধনেপাতা' গ্রন্থের ৩টি গল্প সঙ্কলিত হয়েছিল, ৩য় খণ্ডে বাকি তিনটি গল্প দেওয়া হল। 'অলৌকিক' গ্রন্থের কেবলমাত্র 'সিন্দুক' গল্পটি দেওয়া হল, কারণ অন্যান্য গল্পগুলি পূর্ববর্তী খণ্ডের 'অশরীরী' ও বর্তমান খণ্ডের 'নীলবর্ণ শৃগাল' গ্রন্থের মধ্যে আছে। 'নীলবর্ণ শৃগাল' ও 'এপার্জি' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই বর্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে, কেবলমাত্র শেষোক্ত গ্রন্থের 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি "চাপাটি ও পদ্ম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য ২য় খণ্ডেই তা প্রকাশিত হয়েছিল। 'অনেক আগে অনেক দূরে'র ৭টি গল্প দেওয়া হয়েছে, বাকি ৫টি গল্প 'ধনেপাতা' গ্রন্থের। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণের ৩টি গল্প নাদির-শা-র পরাজয়, মৌলাবক্স ও বাহাদুর শা-র বুলবুলি পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হবে। 'যা হলে হতে পারতো' গ্রন্থের তিনটি গল্প এই খণ্ডে প্রকাশিত হল। গ্রন্থভুক্ত বাকি গল্পগুলি ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলি নিয়েই চতুর্থ খণ্ডের ডালি সাজাবার ইচ্ছা আছে। গল্পরসিকদের সহযোগিতায় সে ইচ্ছাপূরণ ত্বরান্বিত হোক এই কামনা করি।

অশোককুমার কুণ্ডু

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রমথনাথ বিশী

মহেন্-জো-দড়োর পতন

সিন্ধু নদের তীর বরাবর সুদীর্ঘ, সুদৃঢ়, সু-উচ্চ বাঁধ। বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইটের তৈরী; এক সময়ে মানুষে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট; বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা। নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিহ্ন, কোন কোন অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বহু পুরুষ ধরিয়া মানুষে বাঁধটি দেখিতেছে; লোকে নদীর ঐতিহ্যের যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সম্বন্ধেও তাই—দুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, দুইটিকেই মানুষে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঁধের একদিকে নদী, অপর দিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশস্ত. ৫।৭ জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারী করিতে পারে, করেও তাই। ওখানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল বিকাল ওখানে হাওয়া খাইতে বেড়াইয়া থাকে।

আমাদের গল্পের সূত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে দুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া খাইতেছিল—এমন নয়; কারণ এখনো সান্ধ্য-বিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

দু'জন লোকই দীর্ঘকায়. একজনের দাড়ি গোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ; দু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা। বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য। দু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নীচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্রুতগামী নৌকা দেখিলে স্রোতের প্রচণ্ডতা অনুমান হয়—আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরঙ্গ—দূরে বলিয়া, নিচে বলিয়া দাবার ছকের মতো দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়ীগুলোও খেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উঁচু—আর

সম্মুখে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিরদাঁড়া—দুই দিকের দিগন্তে সূক্ষ্ম সূচালো হইয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি দুইজন এবারে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—এই আমাদের শত্রু, নদীই আমাদের শত্রু, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শত্রুতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত করা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—একজন নগরের সেনাধ্যক্ষ—অপর জন পূর্ত-সচিব, দু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় খুব জোর ধরবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কি ভাবে বুঝিলে?

দেখ না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতোমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্যা হইয়া থাকে।

—হোক প্রবল বন্যা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।

—প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ষা অন্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।

—আমিও তাহাই বুঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবেন?

—আমারও সেই আশঙ্কা। তাহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাঁহারা বলিবেন—ওটা পূর্তসচিবের একটা খেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য কেবল বাজে খরচের বাবদ অর্থ চান! কিন্তু—

—কিন্তু আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম!

—সেই তো বিপদ্! নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ মেরামতের অনিবার্য অর্থ দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিঙ্গ স্থাপন করিতেছে,

অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবাণী তাহারা শুনিতে চায় না।

—ঐ আর এক বিপদ্। আমাদের প্রাচীন মৎস্য-পূজায় এখন আর কাহারো মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-পূজায় এখন সকলেই উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখো, সে পূজা কত সরল ছিল, আড়ম্বর ছিল না, আবার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। আর এই মৎস্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।

—সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক্ হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক্ হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিকটা দেখিয়াছ কি? এবার বর্ষায় যদি টেঁকে—সৌভাগ্য, বর্ষার অন্তে মেরামত না করিলেই দুর্ভাগ্যের চরম হইবে।

—পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরী সময় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দূত দুই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।

—এমন বিপদ কেন ঘটিল? বন্যা?

—না।

—অগ্নি?

—না।

—ভূমিকম্প?

—তবে কি শত্রু?

—এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

—কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য অস্ত্র ছিল না?

—ছিল বই কি।

—তবে?

—আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।

—হইলেও মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

—সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার দ্রুতগামী জীব। সেই

বায়ুগতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন ?

—এত সংবাদ দূত রাখিল কি প্রকারে ?

—একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

—কি সেই জন্তু ?

—দূত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।

—ছবিখানা দেখিয়াছ ? দেখিয়া কি বুঝিলে ?

—বুঝিলাম, সে জন্তু তেজস্বী, দ্রুতগামী ; আর বুঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জন্তু নাই !

—কিন্তু দুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হইবার তো কারণ দেখি না।

—পূর্ত-সচিব, যে বন্যায় আমরা সর্বদা শঙ্কিত, তাহা তো আরও দূর হইতে আসিয়া থাকে।

—তা বটে।

—আর এমন দ্রুতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে ? সিন্ধুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌঁছিবে না ?

—এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, আজ তোমার আবাসে গিয়া সেই অদ্ভুত জীবের ছবিটা দেখিব, সেখানা আছে তো ?

— আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

দুইজনে যখন বাঁধ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, নত হইয়া অভিবাদন করিল ; বলিল—নগরপ্রধানগণ শীঘ্র আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন।

—কেন হে বাপু ?

—তাহা আমি জানি না, তবে কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।

—তাঁহারা কোথায় ?

—মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্বরে সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

—ভিড়ের মধ্যে কি আছে ?

—তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম

—আচ্ছা, চলো যাওয়া যাক্।

তখন তাহারা দুইজনে দূতের অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হইতে

নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, সত্যই এক বৃহৎ জনতা, চত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল; বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

হঠাৎ এমন কি বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝখানটা ফাঁক, আর সেখানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু!

পূর্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখ এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অদৃষ্ট নয়; এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই; দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মুখ পাংশু! পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শস্পমুষ্টি ধরিতেছে; কিন্তু তেজস্বী জন্তুটার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘূর্ণিত করিতেছে, দূর পথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতেছে—আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেতখামার এখান হইতে দূরে, প্রায় দুই দিনের পথ, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্য খাইতেছে, তখন—

—দাঁড়াও। দু'দিনের পথ তুমি একদিনের মধ্যে আসিলে কি প্রকারে?

—উহার পিঠে চড়িয়া।

—তোমার খামার কোন্ দিকে?

—উত্তর দিকে।

—সর্বনাশ!

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ বুঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা বুঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনি একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনাদের আপত্তি না থাকে তো, আমার ভবনে আসিলে সুখী হইব।

সকলে বলিল—আপত্তি কি ?

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশ্যে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তখন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মহেন্-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচহাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

২

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে সব কথা সে বলিয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কাষ্ঠফলকে যে জন্তুর চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেখাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নূতন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তাহারা অজেয়। তাহাদের হাতে দুইশত ক্রোশ দূরবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যেভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্য খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে হইবে।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে, নগরের দুটি শত্রু। একটি নদী—এতদিন তাহাকেই মাত্র শত্রু বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শত্রুর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্য উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিকটায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কি হয় বলা যায় না। আর কোনমতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া

গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরের কি অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু তাহাদের কথায় কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই দুই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদ-গৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্য সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, দু'একজনকে প্রৌঢ়ও বলা যাইতে পারে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উদ্বেগের কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন সম্ভাবিত শত্রু রহিয়াছে, তাহার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রা দুরূহ হইয়া পড়ে। একটি অদ্ভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় আসে নাই, আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা বুঝি না। বাঘের মতো তাহার নখ নাই, গণ্ডারের মতো তাহার খড়্গ নাই, হস্তীর মতো তাহার দন্ত নাই—কোথায় তাহার ভীষণতা।

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল। কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাকে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল; বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্র তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কতকাল নির্মিত হইয়াছে কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদিনের মধ্যে বাঁধ ভাঙ্গে নাই, কাজেই এবারে ভাঙ্গিবে, এমন আশঙ্কা অমূলক। আর

যদিই ভাঙে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তঙ্কা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক ব্যয় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের দাবী যে কত দূর ভিত্তিহীন, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বৃহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলে পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বৃহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগরকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের সুখ-সুবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন; তিনি বলিলেন—বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দূরবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় দুই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ আভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? আসল বিপদ আততায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানাগারে কেহ কেহ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি, তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনো সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপদকালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবার পরামর্শ আছে—আগে বিপদ আসুক, তার পরে বৃদ্ধেরা যেন মুখ খোলেন। এখনই বাক্যে কি প্রয়োজন! বৃদ্ধের মুখে বাচালতা নিতান্তই অশোভন।

—কিন্তু অর্বাচীন যখন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুঃসময় ঘরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাহার নিজ ভবন। আর সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়, আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল; বলিল—এই সব দূরস্থিত বিপদের কচকচানি আর ভালো লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজরাত্রে বৃক্ষপূজার তিথি। সাতটি নরবলি হইবে। বলি প্রস্তুত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভালো। এখানে রাজপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই নূতন স্নানাগার-নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সম্মতি অনুসারে নূতন স্নানাগার নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তখন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মৃতের মতো গালে হাত দিয়া সেই শূন্য সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজপুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্যও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

৩

এই ঘটনার পরে পুরা তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সুদীর্ঘ সময়-মধ্যে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার লক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্বয় সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিক হইতে অজ্ঞাত শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিক্‌ হইতে পরিজ্ঞাত নদী বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগান্তকারী বিপদ্‌ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ্‌ কখনোই আসিবে না—এমন কথা মূর্খ ছাড়া কেহ বলে না। মানুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনো নগরে আছে। লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নখদন্তহীনতা স্মরণ করিয়া 'নখদন্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে 'ভাঙা বাঁধ', আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

এই ভাবে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বৎসরে বর্ষাকালে বন্যায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্‌টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

বাঁধ রক্ষার জন্য পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সংকট রক্ষা করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহারা দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মহেন্-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। স্নানাগারটি এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এইস্নানাগারের মধ্যভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণ-বাপী আছে।......এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল।......বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।" *

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জলক্রীড়া করিতেছে। সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় সুসংবাদ। বাঁধ ভাঙাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

*'প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়ো'—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃ. ২৪-২৭

আর একজন বলিল—তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আর একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত সচিব বাঁধ ভাঙিয়া জল ঢুকিবে—দুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলের সঙ্গে যে প্রচুর মাছ ঢুকিবে—সে সুসংবাদ কি রাখেন?

হাসিতে হাসিতে বারংবার সুবৃহৎ স্নানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

অপ্রস্তুত দূত প্রস্থান করিল।

রাজপুরুষরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ, বুড়ো দু'টোকে আর সহ্য করা যায় না।

কেহ বলিল—এ দু'টো আমাদের সকল সুখের কাঁটা!

কেহ বলিল—মরেও না, মুখও বোজে না!

—কেবল শত্রু আর বন্যা!

—কেবল এলো এলো, গেলো গেলো!

—ভয় দেখিয়ে আমাদের ভালো করিতে চান!

—আমরা খারাপটাই বা এমন কি?

—ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা শুনেছি তো ঠাকুমার কাছে!

—রসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কি বলো।

—সেদিন 'নখদন্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

—হয়েছে! একেবারে হওয়া শেষ! কি সর্বনাশ!

—এবারে বুড়ো দু'টোকে সরানো দরকার।

—না হে, দু'টো একটা বুড়ো থাকা ভালো, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবার সুবিধা হয়।

—তবে ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।

—তা না হলে আর বুড়ো কেন?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আর বন্যার তীব্রতার অভাবেই হোক, বাঁধটা সে বার রক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল, বাঁধ ভাঙিবার নয়। আর যা ভাঙিবে না,

তাহা রক্ষা করিবারই বা উদ্যম কেন! ঐ সূত্রে আরও একটা প্রসঙ্গ অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঙ্গা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উত্তর দিকে অশ্বারোহী আততায়িগণ দেখা দিয়াছে। সে বলিল—ষোল ক্রোশ উত্তরে যে নগর আছে, অশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল, তাহারা সংখ্যায় কত?

—পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

—তাহারা কি এ নগরে আসিবে?

—আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল। ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায়, আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা কোথায় থাকিবে। স্নানাগারের দ্বিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়া যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং দুইজনে স্নানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেখানে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বৎসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে! এতদিন যদি আসিয়া না থাকে, তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কি?

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আজ না আসুক, কাল আসিবে।

—তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিতে দিন।……নাও—তোমার রাজাকে সামলাও।

সেনাধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া উঠিল; বলিল—আপনাদের সব খেলাই একেবারে শেষ হইবে।…

—দেখো মন্ত্রী গেলো!

একজন রাজপুরুষ বলিল—শত্রু আসে—যুদ্ধ করুন।

—শত্রু আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

—আমরা তাহার কি করিব?

—কি করিব? আপনারাই কি এজন্য দায়ী নহেন? সৈন্যদলের প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নূতন নূতন লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব?

—তবে এক কাজ করুন, অর্থ দ্বারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।

—আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক; আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দালালী করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

—তখন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।

—ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আসুন, সৈন্যদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই না কেন?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দুইজনে মিলিয়াছে ভালো! যান, আপনারা দুইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।

—তা থাকিবেন কেন?

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্নানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিঙ্গপূজায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন? বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি! 'এই হইবে',

'আগামী বৎসর হইবে'! পাছে আমার গুপ্তচরেরা অশুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বৃক্ষদেবের নিকটে বলি দিয়াছেন! এখন যখন বিপদ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচ-ফ্যাচ করিবেন না, যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষগোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠগোলক তাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুণ্ঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভালো! হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শত্রুর বিরুদ্ধে উঠুক।

—শত্রু আপনার মাথায়।

—তাই বুঝি সেখানে আঘাত করিলেন! আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমান্ও বটে।—বলিলেন পূর্ত সচিব।

—শত্রু আসুক, তখন দেখা যাইবে।

—শত্রু অবশ্যই আসিবে, তখন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

—নাও, তোমার রাজা গেলো!

—মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধূলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভালো করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপরে উঠিল; যাহার তখনো নিদ্রিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কি হইয়াছে' শুধাইতে শুধাইতে বাহিরে আসিল!

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহারা অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল।

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল,—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্তটাই আপনাদের কল্পনা!

অরণ্যাধিপতি বলিল—দূরে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কি করিব?

—সেজন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্য্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কাছে, আরো কাছে। ক্রমে ধূলিপটল ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপ্তচরের অনুমান ভুল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তুর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধলগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্গা; আর সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ময় কান্তি। তাহারা দেখিল—আততায়ীদের বর্ণ গৌর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘ-প্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুহীন। শত্রু হইলেও তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে!

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েক-জন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে কি সব কথাবার্ত্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানাপ্রকার খাদ্য অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে, মূল্যবান্ রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে! তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পন্থাটাই গৃহীত হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আততায়িগণ ঘোড়ার মুখ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল।

তখন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার মুখেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হ'লো তো যে আমরা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

পূর্ত-সচিব। ইহার নাম আত্মবিক্রয়, আত্মরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত ; নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না, এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতি প্রদর্শন?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ শুনিতে পারি?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্যান্য লুন্ঠিত নগরের মতো ইহাও একটি ক্ষুদ্র পত্তন, তাই সামান্য সংখ্যায় আসিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিন্ধুপত্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম নগর। তৃতীয় কারণ, বুঝিয়া গেল যে, এই নগরে কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও কাপুরুষের বাস ; বুঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের পরাস্ত করিবার বা উৎকোচ দ্বারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ, ইহারা বীর পুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর! ঐ তো চেহারা! পাথর-চাপা-পড়া ঘাসের মতো, বিবর্ণ রঙ্! বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে! যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান্, তেমনি বুদ্ধিমান্!

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্মুখে এই সুবৃহৎ দেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ বিস্তারিত। এখনো সতর্কবাণী অবধান করুন, অবিলম্বে প্রস্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অস্তমান সূর্যের মতো বিলয়ের দিগন্ত স্পর্শ করিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হুঁশ হইল। তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত!

পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বৃথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ভোজের নিমন্ত্রণটা বিস্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যসূচী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবকে কেহ আহ্বান করিল না। তাহারা সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে মূঢ়ের মতো নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেও সাহস হইল না।

৪

সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়; কিন্তু শত্রু বুঝিয়াছে, দুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্যের চেয়ে স্বর্ণ অধিক শক্তিক্ষম। তাহারা সৈন্যদল একেবারেই ভাঙিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মুষ্টিমেয় অনুচরকে দূর করিতে পারে নাই। সৈন্যে আর প্রয়োজন কি? শত্রুরা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না? আর যদিই বা আসে, যুদ্ধে বৃথা রক্তক্ষয় না করিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিয়া নগরের সাধারণ লোকেরাও বিলাসের সুলভ সংস্করণ প্রচারণায় লাগিয়া গিয়াছে। আগে যে অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষবাসে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্নানাগার তৈয়ারী করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্নানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয়; স্থানে স্থানে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অন্ততঃ তাহার সঙ্গে মাছমাংসের ৫।৭টি পদ আহার করিয়া থাকে। রাজপুরুষগণের আহার্য কমপক্ষে দশপদী। রাজপুরুষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করে; লোকসাধারণ আগে মৃন্ময় পাত্র ব্যবহার করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয়

বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। বিশেষ সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মরিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কি? শত্রুকে বশ করিবার মতো নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে! কোন সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যখন বেশী ভরসা করে, বুঝিতে হইবে, তখন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্গের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না। প্রয়োজন কি! ঐ তো এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয়, আমাদের সৈন্য নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিবার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্য এবং মরিবার জন্য। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গৌরবদ্যোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণস্বাদলুব্ধ শত্রু আবার আসিবে এবং তাহা অগৌণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বন্যার পঞ্চবার্ষিক জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্কার সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায়? লোকজন কোথায়? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মুষ্টিমেয় অনুচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মুষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া আততায়িগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, দুই বিপদ্ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যখন মারে, তখন একেবারে সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ষার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘুরিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশেই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে জননীর মতো, বন্যাপ্রহত নগরের ঊর্ধ্বে পূর্ত-সচিব ও

সেনাধ্যক্ষ—দু'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে, স্রোত প্রতিদিন প্রবলতর হইতেছে; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনো নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অনুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়া যায়। মানুষের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিগরেরা দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেখিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতিমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার সূচনাতেই এমন তো কখনো দেখি নাই।

পূর্ত সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দ্বিধা হইয়া নগরকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সে যেন সাপের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা; একটা আসিতেছে পূব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে—দু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত।

সেনাধ্যক্ষ। পূবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কি?

পূর্ত-সচিব। স্বপ্নের আবার বোঝাবুঝি!

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদ্‌ও আমাদের আসন্ন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভালো। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই। ঐ যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে সূপকার্যের ধূম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ কর্মকোলাহল, ঐ যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ঐ যে আরও দূরে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধূমের নবাঙ্কুর, ঐ যে গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ প্রভৃতি—পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে?

সেনাধ্যক্ষ। তোমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা—

পূর্ত-সচিব। পূবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উত্তরেরটা? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মানুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কোন

সেনাধ্যক্ষ। কি জানি। ও কিসের গর্জন।

পূর্ত-সচিব। নদীর পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে! কিন্তু আজ সমস্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম পর্দা যেন পড়িয়া গিয়াছে!

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল শুধাইল সংখ্যায় কত?

—অগণ্য, অসংখ্য, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অনুচরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটই যেন থাকে, ডাকিবামাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল; কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে; কেহ বলিল, আগে আসুক, কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখে! দূত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল।

৫

নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাঁধের উপরে দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিগরেরা ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্নের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব. কোন্ কথা?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ্ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্তুতঃ উত্তর দিগন্ত কখন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মুখ করিয়া

তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। যে কোন মুহূর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাহ্ন কাটিল, অপরাহ্ণও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে তারা ফুটিল; পূবে একখানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চামুণ্ডামূর্তি ধরিল।

পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিয়া যাইবে, এমন সময়ে পূর্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি!

—তাই তো ও কি!

উত্তর দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু।

—ওখানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয়!

—যাহা নয়, তাহাই হইতে চলিয়াছে।

—তবে কি…

কোন সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূব হইতে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়—আর, অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন, অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু! আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অনুভব করিল। মৃত্যু যদি মোহন মূর্তিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমস্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন-জো-দড়োর উত্তরদিক্ আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসন্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুঞ্জন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নগরবাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে কাটাইয়া দিল; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির; কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির

চাবুকের আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় রহিল।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধশস্যপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রান্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ! অশ্বারোহিগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে; অশ্বসকল স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নীচু করিয়া ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিযুক্ত। আবার আততায়িগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে অট্টালিকারণ্যসদৃশ সেই সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়িশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভার-পূর্ণ শকট। তাহারা বুঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষগণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া খাদ্যসম্ভার ও সুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এবারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দলপতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা 'আর্য' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তাহারা উপঢৌকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথ্যাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে?

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুখে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ কর বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়িগণ যে যাহার অশ্বে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহিগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত সমুদ্র তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পরে আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে

লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল; একদিকে অসহায় আর্তনাদ, অপরদিকে অশ্ব ও মানুষের বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহৃত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্য হয় না, চলিলাম।

পূর্ত-সচিব বুঝিল, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল।

পূর্ত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি। কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভালো করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মুষ্টিমেয় অনুচর-পরিবৃত সেনাধ্যক্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণখণ্ড ভাঙিয়া যেমন শত খণ্ড হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈন্য কয়জন মুহূর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষগণ আগেই করিয়াছিল, এবারে পূর্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, এখন বহু সহস্র অশ্বারোহী বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, সুযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল—কাল রাত্রিতে বন্যার জল ও স্রোত-দুই-ই বাড়িয়াছে!

তখন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল—হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শত্রুকবলগ্রাসের গ্লানি হইলে তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্যদেব, আমি দুর্বল, আমার মনে বল দাও!

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন তোমাকে বিষম শত্রু মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র। হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি, আজ বুঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শত্রুকবল হইতে রক্ষা করো! হে নদ, তুমি মৎস্যদেবের বাহন, এ নগর মৎস্যদেবের আশ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো!

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, —বল দাও, দেবতা, বল দাও!

এই বলিয়া নীচে যেখানে কারিগরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সে নামিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা সকলে হাত লাগা!

প্রভুর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে সুরু করিল, কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উল্টো হাত লাগা!

—সে কি, প্রভু!

—ঐ তো রে। যখনকার যা নিয়ম! ভাঙ! ভাঙ! বাঁধ ভাঙিয়া ফেল! সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যথা করিতে পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত; বিশেষ দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল। গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত দ্রুত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্যার প্রচণ্ড সহযোগিতা! দেখিতে দেখিতে দণ্ড দুই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেখানে জল ঢুকিল; জলের পথ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা সুবৃহৎ তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা খসিয়া পড়িয়া মৎস্যদেবের তরঙ্গশীর্ষ জয়রথ নগরমধ্যে বিজয় কল্লোলে ঢুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সানুচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণশোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহিগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট। নদী তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে! জল অতলস্পর্শ। তখন পিছু হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে লাগিল; সকল দলই ডুবিয়া মরিল। অশ্বারোহিগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে সেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল! সকলে ডুবিল! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তখনো নগর-সমীপে আসিয়া

পৌঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল; তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুততর বেগে ছুটিয়া পলাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধন জনসমৃদ্ধ মহানগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেখানে দেখা গেল—দুস্তর জলমরুর অমেয় বিস্তার!

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হইতে সে দেয় নাই।

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো সেদিনও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারা উঠিল!*

* এই গল্প-রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসের দুটি কারণ অনুমান করা হয়, সিন্ধুর বন্যা ও আর্যজাতির আক্রমণ। ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ধনেপাতা

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা বলিতেছি। কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর সহরের চকে প্রাতঃকালে প্রাত্যহিক বাজার বসিয়াছে। বড় বড় দোকানগুলি সব রাজপুতদের, মাড়োয়ারীদের, কতক কচ্ছিও আছে; ছোটখাটো দোকানগুলি স্থানীয় লোকদের। চকের চার দিকে দোকানঘর; মাঝখানে ফাঁক, সেখানে দুই দুই সারিতে তরি-তরকারি, ফল-মূল, শাকসব্জির দোকান, এমন অনেকগুলি সারি, মাঝখানে লোক চলাচলের পথ। আর পাহাড়ীরা পাহাড় হ'তে জ্বালানি কাঠ, চাকের মধু, মোম প্রভৃতি আনিয়াছে, বাজারের খাজনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহারা একেবারে চকের প্রান্তে বসিয়াছে—সীমানার ঠিক বাহিরেই।

খুব ভোরে বাজার বসে, ভোর হইতেই খরিদ্দার জমিতে থাকে। লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়; আবার লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়—এমান ভাবে চলিতে থাকে।

আজকের দিনেও বাজারের যেমন দৃশ্য, যেমন হাঁক-ডাক, যেমন জন জনতা, হাজার বছর আগেও তেমনি ছিল কল্পনা করিয়া লইলে ভুল হইবে না।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বাজার প্রায় ভাঙে ভাঙে অবস্থা। এমন সময়ে একজন সব্জিওয়ালা পার্শ্ববর্তীকে সভয়ে বলিয়া উঠিল—ভাই দেখো, দেখো।

পার্শ্ববর্তী সে দিকে তাকাইয়া বলিল—তাই তো, ঠকুররা আসছে, এইবার ঝগড়া সুরু হ'ল।

তখন দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের দরজা বন্ধ করিতে সুরু করিল, যাহারা বাহিরে বসিয়াছে, তাহারা অবিক্রীত জিনিষগুলি এদিকে ওদিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিল, ভুক্তভোগী দু-একজন বিক্রয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়া পসরা মাথায় তুলিয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইল। সমস্ত বাজারময় একটা 'রাখ্-রাখ্' ঢাক্-ঢাক্' ভাব।

একজন বলবান্ লোক বলিল—আর ভাই সেদিন এক পোড়ো ঠকুর আমার পাঁঠার বাচ্চাটা এমনি নিয়ে যায় আর কি। আমি চাইলাম ছ'টা পয়সা, দুটো পয়সার বেশী দিলে না।

—দু'ঘা দিয়ে দিলে না কেন?

—ইচ্ছে তো করছিলো, কিন্তু ওদের যে শরীর, ভয় হ'ল, মট ক'রে ভেঙে যাবে!

—যা বলেছ, এদিকে শরীর তো ঐ, কিন্তু সাজের বাহার দেখে মনে হয় রাজপুত্ত,'র।

—বলে তো তাই! ওরা সবাই নাকি রাজার ছেলে।

—গৌড়ে এত রাজা?

—তা' হলেই বুঝতে পারছো, সে দেশের অবস্থা কেমন? আমরা একটা রাজার ভার সইতে পারি না।

—রাজপুত্তূর, তাতে আর সন্দেহ কি? পড়বার নাম ক'রে এখানে এসে দিন নাই, রাত নাই, পাহাড়ী মেয়েগুলোর সঙ্গে নাগরপনা করা!

—ওদের দেশে কি মেয়ে নেই?

—আরে ভাই, ঐ যে কথায় বলে—'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।' ওদের মুখে কাশ্মীরী নাশপাতি গৌড়ী আমের চেয়ে অনেক মধুর।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে গৌড়ীয় ঠকুরগণ সব্জিওয়ালাদের কাছে আসিয়া পড়িল।

—সংখ্যায় ইহারা আট-দশ জন হইবে।

"এই সকল বিদ্যার্থীদের মুখে পান, পরনে ধুতি, গায়ে উত্তরীয়, বাবরী চুল স্কন্ধে লম্বিত, হাতে ছত্র, নখ লাল রঙে রঞ্জিত; ইহারা ধীরে ধীরে পথ চলে, থাকিয়া থাকিয়া দর্পিত মাথাটি এদিক-ওদিক দোলায়; হাঁটিবার সময়ে ইহাদের ময়ূরপঙ্খী জুতার মচ-মচ শব্দ হয়, মাঝে মাঝে নিজেদের সুবেশ-সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখে; আর কটিতে ইহাদের লাল কটিবন্ধ।"

কয়েকজন ভিক্ষুক ইহাদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। কোন ভিক্ষুক বলিতেছে "সোনার চাঁদ," কোন ভিক্ষুক বলিতেছে "গৌড়ের রাজা," কোন ভিক্ষুক বা "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিতেছে।

অভিধাগুলি বিদ্যার্থীদের ভালই লাগিতেছে মনে হয়; মাঝে মাঝে দু'একজন মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছে, কোনো অভিধা নিজের প্রতি কথিত হইয়াছে মনে করিলে ভিক্ষুককে একটি কড়ি ফেলিয়া দিতেছে

এক ঠকুর অপর জনকে বলিল—নরেন্দ্র, তুমি উহাকে কড়ি দিলে কেন? ব্যক্তি "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" আমাকে বলিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—ধীরেন্দ্র, এ কেমন তোমার আচরণ, ঐ ব্যক্তি আজ দুই বৎসর তামাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিতেছে।

—বুঝিলে কি প্রকারে?

—আমি যে উহাকে চিনি, লোকটা অন্ধ—

—তাই বলো, অন্ধ বলিয়াই বলিয়াছে। নতুবা—

তখন দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা প্রকাশ্য বাজারে এরূপ ব্যবহার করিওনা, মনে রাখিও. একমাত্র গৌড়বাসিগণই "কৃষ্টিসম্পন্ন"—অন্য কোন দেশের লোকের কৃষ্টি নাই। তাহারা এতদবস্থায় গৌড়বাসীকে দেখিলে কি ভাবিবে?

তখন নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র একযোগে বলিল—যথার্থ বলিয়াছ! কৃষ্টি রক্ষার্থ আমরা, গৌড়বাসীরা সকল প্রকার সংযম করিতেই পারি, এমন কি, রসনা সংযমও অসম্ভব নহে!

দীনেন্দ্র বলিল—তা ছাড়া বাজার করাও আবশ্যক। সেটাও তুচ্ছ নয়।

—নিশ্চয় নয়, কৃষ্টির সঙ্গে যখন কাঁকুড়ও যুক্ত হয়, তখন তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

—শুধু কাঁকুড়ই বা কেন? কৃষ্টির সঙ্গে কবুলা।

কৃষ্টির সঙ্গে কদলী।

কৃষ্টির সঙ্গে কাঁকরোল।

—কৃষ্টির সঙ্গে কয়েৎবেল।

—কৃষ্টির সঙ্গে কচু।

দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা কি মুখে মুখেই বাজার শেষ করিবে?

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বাতাসে বেতের লতাসকল যেমন একযোগে দুলিতে থাকে, তেমনি নিজেদের রসিকতার বেগে তাহাদের তনু দেহ তালে তালে এদিক্-ওদিক্ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

একজন সব্জিওয়ালা মৃদুস্বরে বলিল—দেখো ঠকুর, ভেঙে না যায়।

আর একজন বলিল—দেহটা গেলে সাধের সাজ-পোষাকগুলোর কি হবে?

একজন ভিক্ষুক বলিয়া উঠিল—"মেনকা বাঈ" "মেনকা বাঈ।"

নিজেকে মেনকা বাঈ বলিয়াছে ভাবিয়া প্রত্যেক ঠকুর ভিক্ষুকের উদ্দেশ্যে একটা করিয়া কড়ি ছুঁড়িয়া দিল। মেনকা বাঈ শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ নর্তকী।

এবারে সকলের হুঁস হইল। নরেন্দ্র বলিল—ভাই, বাজার যে ভেঙে গেল।

—যাবে না? যত সব পাহাড়ী ভূত ভোর না হতেই এসে হাজির হয়। আমরা তো এক প্রহরের আগে শয্যাত্যাগই করতে পারি না।

—আর করবোই বা কেন? যারা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, তারাই ভোরে ওঠে। কৃষ্টিমান্‌দের একটু বিলম্ব হবেই।

—তা তো হবেই, কিন্তু বাজারে যে কিছুই নাই দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে তাহারা এ-দোকান ও-দোকান দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোকানীরা গৌড়ীয়দের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত, বলিতেছে—

—ওটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

—ওটা অমুকে কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

—ওটা পচা।

এমন সময়ে নরেন্দ্র সকলকে তারস্বরে ডাকিল, ও ভাই এদিকে এস, এদিকে এস।

—কি ব্যাপার?

একদল ফড়িঙের ন্যায় ঠকুরগণ সে দিকে ছুটিল, কাছে গিয়া দেখিল, কৃষ্টিমান্ নরেন্দ্র সেই প্রকাশ্য বাজারে, সহস্র দৃষ্টির সম্মুখে মেনকা বাঈয়ের নৃত্যকে পরাজিত করিয়া নাচিতেছে—তাহার হাতে এক আঁটি শাক—

ধইন্যা পাতা, ধইন্যা পাতা।

সকলে নৃত্যের কারণ বুঝিল, আরও বুঝিল, ইহার চেয়ে নৃত্যের যোগ্যতর কারণ হইতেই পারে না, কাজেই তাহারাও নৃত্যপর নরেন্দ্রকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল, সকলেরই মুখে 'ধইন্যা পাতা, ধইন্যা পাতা।'

বাজারের লোকে অবাক্। ঠকুরদের এমন বিহ্বল অবস্থা তাহারা আগে দেখে নাই। কিন্তু সর্বজ্ঞ হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত, যে কারণে কলম্বাস অকূল সমুদ্রে ভগ্ন বৃক্ষশাখা দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিল, ইহাদের উল্লাসের কারণও তাহা হইতে ভিন্ন নয়। গৌড়বাসীর একটি শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য ধনেপাতা। বিদেশে বহুকাল পরে অকস্মাৎ সেই ধনেপাতা আবিষ্কার করিয়া তাহারা যেন স্বদেশকেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন অবস্থায় আত্মবিস্মরণ সম্ভব এবং তাহা মার্জনীয়।

বিহ্বল অবস্থা কাটিলে নরেন্দ্র দোকানীকে শুধাইল—কত দাম?

বেচারা দোকানী ঠকুরদের উল্লাস দেখিয়া দাম চড়াইয়া দিল, বলিল—চার কড়ি।

—চাঁদ কড়ি!

—সোনার চাঁদ আর কি?

—অর্ধেক রাজত্ব।

—তার সঙ্গে রাজকন্যা।

—কিছু না দিলেই ওর যথার্থ দণ্ড হয়।

—ঠিক, ঠিক, ওকে কিছু দেওয়া নয়—বলিয়া সকলে গৃহাভিমুখে ছুটিল, পিছু পিছু আর সকলেও ছুটিল; তাহাদের মুখে "ধইন্যা পাতা" "ধইন্যা পাতা" ধ্বনি; তাহাদের উত্তরীয়, বাবরী, কোঁচা বাতাসে লটপট করিয়া উড়িতে লাগিল, ময়ূরপঙ্খী জুতা আর্তনাদ তুলিল—সবশুদ্ধ মিলিয়া সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, প্রভাস হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোক রুদ্ধবাক্ অবস্থায় গৌড়ীয় ঠক্কুরগণের দিকে তাকাইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কথা সরিল না।

অবশেষে একজন শুধাইল—ক্যাও এ লোক বাওরা হ্যায়!

অপরে বলিল—নেহি নেহি, গৌড়মে সব লোগোকোঁ এহি হাল হ্যায়!

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—অচ্ছা দেশ। বাপ রে! বাপ!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—সীয়ারাম। সীয়ারাম।

সব্জিওয়ালা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নাগানন্দের চতুষ্পাঠীর দিকে ছুটিল।

২

প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ ইতিমধ্যেই দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া তর্ক বিতর্ক, তর্জন গর্জন করিতে করিতে হঠাৎ একজন আর একজনের পেটে খাগের কলমকাটা চাকু বসাইয়া দিয়াছে।

চাকু মারিয়াছে নরেন্দ্র, চাকু খাইয়াছে ধীরেন্দ্র।

এই ঘটনার পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আবাসিকগণ কেবলই কোলাহল করিতেছে, পাড়ার লোকে বিচলিত হইবার ভাব দেখায় নাই; কারণ, তাহারা জানে, গৌড়ীয় ছাত্রাবাসে আজ ধনেপাতার শাক আসিয়াছে, আজ অনেক কিছুই ঘটিতে পারে।

নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র সহপাঠী, সহদেশী, এমন কি, তাহাদের সহগ্রামী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন ক্ষেত্রে একজন কেন অপরের পেটে ছুরি মারিল, জানিবার ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক।

ধনেপাতা লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল, ধনেপাতা কি অবস্থায় খাওয়া হইবে, কাঁচা না তরকারির সহিত রাঁধিয়া?

নরেন্দ্র বলিল—আমরা চিরকাল কাঁচা খাইতেছি।

ধীরেন্দ্র বলিল—আমার ঠাকুরমা সর্বদা রাঁধিয়া খাইবার পক্ষে।

—তোমার ঠাকুরমা মূর্খ।

—কাঁচা খাওয়াই তোমাদের স্বভাব, তোমরা গরু।

তখন ঠাকুরমার প্রকৃতি ও অপর পক্ষের স্বভাব লইয়া যে সব বিশেষণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তাহা কেবল গৌড়ীয়গণের মধ্যেই সম্ভব।

ক্রমে সমস্ত ছাত্রই এক এক পক্ষভুক্ত হইয়া গেল এবং উত্তেজনা এমন তীব্রতা পাইল যে, ক্ষণকালের জন্য ধনেশাকের প্রসঙ্গও বিস্মৃত হইল।

তখন দীনেন্দ্র বলিল—ভাই সব, মনে রাখিও, আমরা গৌড়ীয় ছাত্র, সাধারণ উড়ে বা মেড়ো বা ছাতু নই; কাজেই ঝগড়ায় কাজ নাই, ধনেশাক দুই রকমেই প্রস্তুত হোক, যাহার যেমন অভিরুচি খাইবে।

নরেন্দ্র বলিল—এমন হইতেই পারে না, তাহাতে ধনেশাকের অপমান।

ধীরেন্দ্র বলিল—তাহাতে আমার ঠাকুরমার অসম্মান।

আবার কলহ তীব্র হইয়া উঠিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র ধীরেন্দ্রের পেটে ছুরিকাযুক্তি প্রয়োগ করিল।

এই হঠকারিতায় কেহ অপ্রস্তুত হইয়াছে মনে হইল না, এমন কি, ধীরেন্দ্রের ভাবখানাও বিশেষ অসন্তোষজনক নয়, সে যেন মৌন সম্মতির দ্বারা বলিল—গৌড়ীয়দের মধ্যে এমন হইয়াই থাকে।

কিন্তু সমস্যার তো মীমাংসা হইল না। তখন দীনেন্দ্র বলিল—বৃথা কলহে প্রয়োজন কি। এসো, আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের দ্বারা সিদ্ধান্ত করি।

তাহার প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইল।

গৌড়দেশে একটি চমৎকার প্রথার প্রচলন আছে। কোন গুরুতর সমস্যার অন্য উপায়ে মীমাংসা না হইলে, সমস্যার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার রীতি বর্তমান। যে পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা অধিক হয়, সেই পক্ষেরই জিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাতেও মীমাংসা হইল না, যেহেতু কাঁচা শাক ও রাঁধা শাকের পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা সমান সমান হইল। গৌড়ীয় ছাত্রগণ সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—এখন উপায়!

দীনেন্দ্র আবার নূতন প্রস্তাব করিল, সে বলিল—ভাই, কাঁচাও থাক, রাঁধাও থাক, এসো—আজ আমরা নাসাভোজন করি, ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—আজ ধনে শাকের গন্ধ শুঁকিয়াই ক্ষান্ত হই।

তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে গৌড়ীয়গণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়াই এমন এক বিকট জয়োল্লাস করিল যে, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ক্যা হুয়া ?

গৌড়ীয় ছাত্রগণ বলিল—আরে শিয়ালকা মাফিক্ 'হুয়ো হুয়ো' মৎ করো।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ অন্যান্য দেশের লোকের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন দুর্বলতা বলিয়া মনে করে। বিশেষ তাহাদের ধারণা এই যে, যাহারা গৌড়ীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত নাসাভোজন করাই স্থির হইল। মাঝখানে ধনেশাকের আঁটি ঝুলাইয়া রাখিয়া সকলে যথেচ্ছ শুঁকিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সে দিনের মতো ধনে শাকের প্রসঙ্গ ঐখানেই মিটিয়া গেল।

৩

শ্রীনগরে অবস্থিত নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী একটি ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখানে ভারতের সকল অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া থাকে, গৌড় হইতেও আসে। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নে যেমন পশ্চাৎপদ, নিজেদের ও অন্য দেশের ছাত্রের সঙ্গে কলহে ও দুর্ব্যবহারে তেমনি তাহারা অগ্রণী। অন্য অঞ্চলের ছাত্ররা পরস্পরের ভাষা শেখে, গৌড়ীয়গণ অন্য কোন অঞ্চলের ভাষা শিখিবে না, অন্য কাহারও সঙ্গে মিশিবে না, নিজেদের মধ্যে জটলা করে, নিজেদের ছাত্রাবাসের নাম দিয়াছে 'প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাস,' অন্য অঞ্চলের ছাত্রগণ শুধু অঞ্চলটির নামটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বোধ করে, এক কথায়, শ্রীনগর সহরে তাহারা ক্ষুদ্র একটি গৌড়দেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সমানে সমানে মিল হয়, গৌড় ও অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষার এমন তারতম্য, মিলনের ক্ষেত্র কোথায় ?

বৃদ্ধ নাগানন্দ স্বামী পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চরিত্রের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়, কেবল গৌড়ীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ নহে, গৌড়ীয়গণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়া থাকে, লোকটা পণ্ডিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌড়ের সীমার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াই সব মাটি করিয়া ফেলিয়াছে।

ধনেশাক প্রসঙ্গের পরদিন নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী বসিয়াছে।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—গৌড়ীয় ছাত্রদের যে দেখিতেছি না।

একটি মারাঠী ছাত্র বলিল—আচার্য, তাহারা তো সময়মতো কখনই আসে না।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—ওটি তাহাদের একটি মহৎ দোষ।

তারপরে বলিলেন, কাল বাজারে কি ঘটিয়াছিল, তোমরা কেহ দেখিয়াছ?

মারাঠী ছাত্রটি বলিল—ঐ যে তাহারা আসিতেছে। একেবারে তাহাদেরই শুধাইবেন। আমরা কি বলিতে কি বলিব, গৌড়ীয় ছাত্রগণ বড় পরমত-অসহিষ্ণু।

এমন সময় গৌড়ীয় ছাত্রগণ প্রবেশ করিল।

অন্য দেশের ছাত্রগণ প্রথমে আচার্যের পাদবন্দনা করিয়া নিজেদের মধ্যে কুশল সম্ভাষণ করিয়া, তবে আসন গ্রহণ করে, ইহারা সেরূপ কিছুই করিল না। আচার্যের দিকে মাথা দিয়া একটা ঢুঁ মারিবার ভঙ্গী করিয়া সকলে একান্তে বসিয়া পড়িল এবং অনতিনিম্নস্বরে কথাবার্তা বলিতে সুরু করিল।

আচার্য বলিলেন, কাল তোমরা বাজারে কি করিয়াছিলে? একজন দরিদ্র সব্জিওয়ালা আমার কাছে অভিযোগ করিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—আপনার কাছে দর্শন পড়িতে আসিয়াছি, পড়ান, ওসব ব্যাপারের মধ্যে আপনি যান কেন?

আচার্য। আমি আর গেলাম কই। দায়ে পড়িয়া সে লোকটা আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি রাজা না কোটাল! আপনার কাছে আসে কেন?

আচার্য। তোমাদের গৌড়দেশের রীতি কি জানি না। অন্য সর্বত্র আচার্যের স্থান—রাজা ও কোটালের উপরে। একথা নিতান্ত অশিক্ষিতেও জানে, তাই রাজদ্বারে না গিয়া আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি আমাদের দেশ তুলিয়া কথা বলিবেন না।

আচার্য। তোমাদের আচরণেই যে তোলায়, অন্যান্য দেশের ছাত্রগণের সঙ্গে তোমাদের প্রভেদ কি বুঝিতে পারো না?

নরেন্দ্র। ওরা ছাতু খায়, ভুট্টা খায়, জোয়ার খায়, চানা খায়, পুঁদিনার শাক খায়।

আচার্য। তাহাতে ক্ষতি কি? যাহার যা খাদ্য।

নরেন্দ্র। ক্ষতি এই যে, ওরা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, ভূত।

এমন সময়ে একটি গুজরাটি ছাত্র বলিল, তোমরা যে ধনেপাতা খাও।

ধীরেন্দ্র। আমাদের খাদ্য তুলিয়া কথা বলিও না।

আচার্য। তোমরা অনেক বেশি তুলিয়াছ।

ধীরেন্দ্র। আপনি উহাদের দিকে টানিয়া বলিলেন।

আচার্য। তোমাদের দিকে ঘেঁষিতে দাও কই?

সেই গুজরাটি ছাত্রটি বলিল—যাহারা তুচ্ছ ধনেশাকের জন্য পরস্পরের পেটে ছুরি মারিতে পারে—

ধীরেন্দ্র। কে বলিল ছুরি মারিয়াছে?

গুজরাটি ছাত্র। তোমার পেটে ও পটি বাঁধা কেন?

ধীরেন্দ্র! তোমার পেটে তো বাঁধিতে যাই নি, তোমার ক্ষতি কি?

আচার্য। এখন বিতণ্ডা থাক। সব্জিওয়ালা দাম পায় নাই, দুটা কড়ি চাহিতেছিল, দিয়া দিয়ো।

নরেন্দ্র। ওর প্রতি আপনার এত দরদ কেন? কিছু ভাগবখরা হইয়াছে বুঝি!

তাহার বাক্যে গৌড়ীয়গণ ছাড়া আর সকলেই অষ্টস্তব্ধ হইয়া গেল। আচার্যের সম্বন্ধে এমন কথা! যাঁহার সম্মুখে স্বয়ং কাশ্মীররাজ আসন গ্রহণ করেন না।

আচার্যের অপমানে অন্যান্য ছাত্রগণ এবারে গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিল—এখনি আচার্যের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করো।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—কখনোই নয়, কখনোই নয়, প্রাণ থাকিতে নয়।

সরু সরু লিকলিকে কেঁচো যেমন কুণ্ডলীকৃত অঙ্গভঙ্গী করে, শীর্ণকায় গৌড়ীয় ছাত্রগণের কঙ্কালসার দেহ তেমনি পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল! 'ইস্‌' আমাদের এমন অপমান! থাকিত আজ গৌড়রাজের সৈন্য।'

আচার্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, গৌড়ীয়দের প্রতি বলিলেন আচরণ সংশোধন করিবার পরে তোমরা এখানে আসিও, আজ বিদায় হও।

গৌড়ীয়গণ চীৎকার করিতে লাগিল—দেখিব, তুমি কেমন ফলনা আচার্য, দেখিব, তুমি কেমন চতুষ্পাঠী করো, সব ভাঙিয়া দিব! আমাদের এখনো

তুমি চিনিতে পারো নাই, এবারে পারিবে, পারিয়া নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে, ইত্যাদি।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে নাগানন্দ স্বামী তাঁহার কুটিরের দ্বার খুলিয়াই দেখেন যে, গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ ঠিক দরজার সম্মুখেই সারি বাঁধিয়া শুইয়া আছে, পা ফেলিবার জায়গা নাই।

তিনি শুধাইলেন—বাপু, তোমরা এখানে এভাবে শুইয়া পড়িলে কেন?

একজন বলিল—আমরা প্রায়োপবেশন করিতেছি।

নাগানন্দ। প্রায় উপবেশন আর কোথায়? ইহাকে তো শয্যাগ্রহণ বলে।

গৌড়ীয় বিদ্যার্থী। ইহাই প্রায়োপবেশনের রীতি।

নাগানন্দ। আচ্ছা, না হয় তাহাই হইল; কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যে কি আর স্থান ছিল না? আমার দরজার সম্মুখে কেন? বাহির হইব কি উপায়ে?

—আমাদের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাও।

নাগানন্দ। তোমাদের যে পাঁজর বুক, মচ্ করিয়া ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু বাপু, প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য কি?

—আপনার মত পরিবর্তন করাইতে চাই।

নাগানন্দ। আমার অপরাধ কি?

—কাল আপনি আমাদের অপমান করিয়াছেন।

নাগানন্দ। লোকের ধারণা তো ঠিক অন্যরূপ, তোমরাই আচার্যের সঙ্গে অনার্যোচিত ব্যবহার করিয়াছ।

—আবার অপমান করিলেন। আমাদের অনার্য বলিলেন।

নাগানন্দ। বলিলে অন্যায় হয় না, কিন্তু সত্যই কি বলিয়াছি?

—সে লোকে বিচার করিবে। এই আমরা শুইয়া রহিলাম, আপনি যা পারেন করুন।

অগত্যা নাগানন্দ স্বামী ঘরের মধ্যেই রহিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশ বিদ্যার্থী শুইয়া রহিল, কেবল জনদুই একটা জগঝম্প পিটিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমিয়া গেল।

সকলে অবাক্। এমন দৃশ্য তাহারা কখনো দেখে নাই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সায়াহ্ন আসিল, না উঠিল বিদ্যার্থীগণ, না থামিল জগঝম্পের বাজনা।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—তোমরা কি স্নানাহার করিবে না?

—না।

—তোমরা কি আচার্যকে বাহিরে আসিতে দিবে না?

—তিনি স্বচ্ছন্দে বাহিরে আসিতে পারেন, আমরা আটকাই নাই।

—ইহাকেই তো আটকানো বলে।

—মোটেই নয়, ইহাকে বলে সাত্ত্বিক প্রায়োপবেশন।

—কিন্তু আচার্যও যে প্রায়োপবেশন করিতে বাধ্য হইতেছেন

—আমরা তাহার কি করিব?

রাত্রি আসিল। ভিড় কমিয়া গেল। কিন্তু প্রায়োপবেশকদল উঠিল না, বাজনাও থামিল না। নাগানন্দ ঘরের মধ্যে বন্ধ রহিলেন, কিন্তু অভুক্ত রহিলেন না। তিনি যোগী পুরুষ, যোগবলে ঘরে বসিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করিলেন। অভুক্ত বিদ্যার্থীদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল, ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগবলেও জীবনের সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। তিনি আধুনিক কালের লোক হইলে নিরম্বু উপবাস করিতে বাধ্য হইতেন।

এই ভাবে তিন চার দিন গেল। প্রতিদিনই ভিড় বাড়িতে লাগিল। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল যে, বিদ্যার্থিগণ আজ চার দিন অভুক্ত, অথচ দিব্য প্রফুল্লমূর্তি, মুখে ক্লেশ বা অনশনের চিহ্নমাত্র নাই।

কেহ বলিল—উহারা মায়া জানে।

কেহ বলিল—উহারা যোগী।

কেহ বলিল—ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিবার কৌশল শিখিবার উদ্দেশ্যে একবার গৌড়ে যাইতে হইবে দেখিতেছি।

অবশেষে ব্যাপারটা রাজার কানে পৌঁছিল। তিনি মন্ত্রীকে দিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যার্থীরা সম্মত হইল না। অবশেষে রাজা কোটালকে আদেশ করিলেন, সৈন্য দিয়া ছাত্রদের যেন ঘিরিয়া রাখে, নতুবা লোকে তাহাদের বিরক্ত করিতে পারে।

এই আদেশ শুনিয়া বিদ্যার্থীরা ঘোরতর আপত্তি করিল, বলিল—তাহা হইলে রাজদ্বারেও প্রায়োপবেশন সুরু করিতে হইবে দেখিতেছি।

রাজা বলিলেন—থাক, বাদ দাও, উহাদের ভালোর জন্যই ঘিরিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছিলাম, উহারা না চায়, নাই ঘিরিয়া রাখিলে, আমার কি শিরঃপীড়া!

আরও চার পাঁচ দিন গত হইল। রাজা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, একটা অঘটন ঘটিয়া গেলে গৌড়েশ্বর কি বলিবেন। তিনি রাজবৈদ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন,—যাও, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ছাত্রদের শরীরের অবস্থা কিরূপ ?

বিদ্যার্থীরা রাজবৈদ্যকে কাছে ঘেঁষিতে দিল না।

রাজা প্রধান অমাত্যগণকে পাঠাইয়া দিলেন, একবার কহিয়া দেখো, অনশন ত্যাগ করে কি না!

বিদ্যার্থীরা কাহারো কথা শুনিল না, বরঞ্চ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আগে নাগানন্দ মত পরিবর্তন করুক, তারপরে আমাদের অনুরোধ করিও।

অমাত্যগণের মুখ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কালো হইয়া গেল, তাঁহারা ভাবিতে লাগিল, রাজাকে গিয়া কি বলিবে।

এমন সময় এক বুড়ো মিঠাইওয়ালা তাহাদের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কর্তা, আপনারা ছাত্রদের জন্য চিন্তা করিবেন না, তাহারা কদাচ অনাহারে মরিবে না।

একজন কৌতূহলী হইয়া শুধাইল, কেন এমন বলিতেছ ?

কিন্তু মিঠাইয়ালাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

আরও চার দিন গেল। বিদ্যার্থীদের প্রায়োপবেশনের আজ পঞ্চদশতম দিবস।

গৌড়বাসীর অনশনক্ষমতায় সমস্ত কাশ্মীর হতবুদ্ধি।

একজন বলিল—অনশনেই ওরা অভ্যস্ত, তাই না ওরূপ চেহারা।

আর একজন বলিল—মনের বলই বল, শরীরটা তো তুচ্ছ, নিতান্ত না থাকিলে নয়, তাই আছে।

অপর আর একজন বলিল—যা বল, ওরাই আসল ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত উচ্চারণ যেমনি করুক না কেন।

ক্রমে অনেক লোকেই বিদ্যার্থীদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া উঠিল, তাহারা বিদ্যার্থীদের অপরাধ ভুলিয়া গেল, এমন কি, কেহ কেহ নাগানন্দকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিল। জনমত যখন বিদ্যার্থীদের দিকে ঘুরিবার মুখে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটিল।

সে দিন অনশনের ষোড়শতম দিবস। দুইজন গৌড়ীয় বিদ্যার্থী (সেই যাহারা

অনমত জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে জগঝম্প পিটিত) অতি প্রত্যুষে ছুটিতে ছুটিতে রাজবৈদ্যের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজবৈদ্য শুধাইল—এত ভোরে। কি সংবাদ ?

—আপনাকে একবার যাইতে হইবে।

—কোথায় ?

—প্রায়োপবেশন ক্ষেত্রে।

—সঙ্কট দেখা দিয়াছে বুঝি ! আগেই জানিতাম, এমন হইবে। হিক্কা, না শ্বাস, না দুই-ই ?

—আজ্ঞে, দুই-ই।

—হিক্কা আর শ্বাস ?

—আজ্ঞে, না, ভেদ আর বমি !

—উদরাময় ?

—তাইতো মনে হইতেছে।

—কি আশ্চর্য ! প্রায়োপবেশনের ফলে উদরাময়, এমন তো শাস্ত্রে লেখে না।

—আজ্ঞে তবু সত্য, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—কেন এমন হইল বলিতে পারো ?

—আজ্ঞে, ঘৃতটা কিঞ্চিৎ নীরেস ছিল।

—ঘৃত ? এর মধ্যে ঘৃত কোথা হইতে আসিল ?

—এক বেটা বুড়ো মিঠাইওয়ালার অনবধানেই এমন ঘটিয়াছে।

—মিঠাইওয়ালা ? তোমরা কি তবে প্রায়োপবেশন কর নাই ?

—আজ্ঞে প্রায় উপবেশন করিয়াছিলাম বলিয়াই এমন দুরবস্থা ঘটিল, ও উপবেশন করিলে বোধ করি এমন হইত না।

তারপরে রাজবৈদ্যের চিকিৎসার গুণে উদরাময়ের রোগীরা কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল, আর নাগানন্দ স্বামীও গৃহাবরোধ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীররাজ গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে বলিলেন—বৎস, এবার তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও।

বিদ্যার্থীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিল—আমাদের পাথেয়ের অভাব।

রাজা বলিলেন—রাজকোষ হইতে দিতেছি।

বিদ্যার্থীরা বলিল—সঙ্গীর অভাব।

রাজা বলিলেন—কয়েকজন সৈন্য তোমাদের সঙ্গে গৌড় পর্যন্ত যাইবে।

তখন বিদ্যার্থীরা বলিল—আমরা যে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, এমন অভিজ্ঞানপত্র দিতে হইবে।

রাজা বলিলেন—তাহাও দিতে পারি। কিন্তু তোমরাই জানো, কত দূর কি শিখিয়াছ, দেশে গিয়া ধরা পড়িবে না?

বিদ্যার্থীরা বলিল—আজ্ঞে, সে আশঙ্কা নাই; কারণ, দেশের লোকেরা আমাদের চেয়েও মূর্খ!

রাজা বলিলেন—তবে তাহাই হোক। তোমাদের অভীষ্ট সব বস্তুই পাইবে, এখন যাও, প্রস্তুত হও গিয়া।

তারপর একদিন সুপ্রভাতে গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ রাজব্যয়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চারিদিকের জনতাকে অভিভূত করিয়া দিয়া বিদ্যার্থিগণ 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ধ্বনি করিতে লাগিল এবং পালাক্রমে 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ও 'গৌড় উন্নত হউক' ধ্বনি তুলিতে তুলিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিস্ময়ের ভাব কতকটা কাটিলে একজন বলিয়া উঠিল—'দুনিয়া তো এক আজব চিড়িয়াখানা হ্যায়। ঔর গৌড় উসীমে বন্দরকা মোকাম! সীয়ারাম, সীয়ারাম।'

পরিশিষ্ট

বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া বর্তমান লেখকের একটা দুর্নাম আছে। এই গল্পটি তাহারই দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইবে আশঙ্কা। কাজেই যে উৎস হইতে গল্পটির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত অংশ পড়িলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, হাজার বছর আগেও বাঙালী-চরিত্র একই রকম ছিল, তাহার নিন্দা করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন, নির্জলা সত্যকথনই যথেষ্ট, আর যিনি এ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিও বাঙালী ছিলেন না। কাজেই বিবরণটিকে ও বর্তমান গল্পটিকে নিরপেক্ষ চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বর্ণনা দিয়াছেন। দশম একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুৎমার্গী, ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু পাতঞ্জলভাষ্য, তর্কমীমাংসা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই। ...ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক্ সেদিক্ দোলান। হাঁটিবার সময় বিদ্যার্থীর ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ হয়; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত দন্তপংক্তিতে তাহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটি স্বর্ণকর্ণভূষণ, হাতে যষ্ঠি, দেখিয়া মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন, সাধারণ একটু কলহে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিষ দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন। (বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৫৫১—৫৫২, নীহাররঞ্জন রায়।)

মহালগ্ন

মাসিডনপতি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শা এশিয়া মাইনর অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছেন।

তাঁহার অজেয় অশ্বারোহী বাহিনীর আঘাতে ছোট-বড় কত রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল; পারস্য গেল, মিশর গেল, বাহ্লীক গেল, কোন রাজাই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তিনি হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া কাবুলে পৌঁছিলেন।

সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া এমন শিক্ষা পাইল যে, তাহা ভুলিতে তাহাদের দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তিনি একদা বসন্তকালে সিন্ধু-নদ পার হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তাহার আগে পাশ্চাত্য খণ্ডের আর কোন দিগ্বিজয়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, আর কাহারো মুগ্ধদৃষ্টি ভারতবর্ষের উদার সৌন্দর্য দর্শন করে নাই।

সিন্ধুনদ পার হইয়া সেকেন্দর শা তক্ষশীলা নগরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সিন্ধু ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড আম্ভীরাজের অধিকারভুক্ত, তাহার রাজধানী তক্ষশীলা। আম্ভীরাজ তখন প্রতিবেশী রাজন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি দিগ্বিজয়ী বীরকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, তিন হাজার সুপুষ্ট পুংগব ও দশ হাজার মেষ উপঢৌকনস্বরূপ তাঁহার শিবিরে পৌঁছাইয়া দিলেন। সেকেন্দর তক্ষশিলা-রাজের ব্যবহারে প্রীত হইয়া সেনাগণকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। বিতস্তার পরপার পুরুরাজের অধিকার। তিনি গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইয়াছেন যে, পুরুরাজ বীরপুরুষ, তিনি ত্রিশ হাজার পদাতিক, চার হাজার অশ্বারোহী, তিন শত রথ এবং দুই শত মদমত্ত হস্তী লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার উপরে সম্মুখে প্রশস্ত নদী, এখন আষাঢ় মাসের শেষে নদী বন্যাময়ী, পরাক্রমশালী শত্রুর উপস্থিতিতে নদী পার হইবার উপায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশ্যই শত্রুর অগোচরে নদী পার হইতে হইবে, তাহার জন্য রাত্রির প্রয়োজন; নৌ-সেতু প্রস্তুত করিবার সময় পাওয়া যাইবে না, সেজন্য নদীর একটা অগভীর স্থান আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ যখন তক্ষশিলার নারী-বিক্রয়-বিপণীতে আত্মবিনোদনে মগ্ন, সেকেন্দর শা তখন সৈন্য-তরণযোগ্য স্থান সন্ধান করিয়া নদী-

তীরে একাকী অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই পর্যন্ত ইতিহাস। এর পর আমাদের গল্প।

২

মাসিডন হইতে যে সৈন্য-বাহিনী লইয়া সেকেন্দর শা বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা সকলে তক্ষশীলায় পৌঁছায় নাই। কিছু যুদ্ধে হতাহত হইয়াছে, আর অনেকে পথের যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যে বিপুল জনসজ্ঘ ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাকে দেখিলে সেকেন্দর শার সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিবে। এই জনসমাবেশের সামান্য অংশই সৈন্যদল, বাকি অধিকাংশই বে-সরকারী জনতা।

এই জনতার মধ্যে স্ত্রী আছে, পুরুষ আছে, গ্রীক আছে, পারসীক আছে। লাঙলের ফলা ভূমি কর্ষণ করিয়া গেলে তাহাকে অনুসরণ করিয়া যেমন খড়-কুটা, তৃণখণ্ড চলিতে থাকে, তেমনি দিগ্বিজয়ীর অস্ত্রাঙ্কিত পথ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন দেশের বিচিত্র লোক আসিয়াছে। কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, কেহ সৈন্যদলে গৃহীত হইবার আশায় আসিয়াছে, কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে লুঠ করিবার আশায় আসিয়াছে, কেহ বা কৌতূহলে আসিয়াছে, আর অনেকে কিছু করিবার নাই বলিয়া শুধু শুধুই আসিয়াছে এবং জনতা বেসরকারী হইলেও সৈন্য-বাহিনী ইহাদের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের জন্য ইহাদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এক মুদ্রার দ্রব্য পাঁচ মুদ্রা মূল্যে ইহারা বিক্রয় করে। চোরাকারবার একালের মতো সেকালেও ছিল, উহা হালের আমদানী নয়, চৌর্যব্যবসায়ের মতোই উহা নিতান্তই সনাতন। মোটকথা, এইজন্যই সেকেন্দর শার সৈন্য-বাহিনীর কমিশারিয়েট ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র। নিতান্ত শিশু ও অশক্ত বৃদ্ধ ব্যতীত আর সব বয়সের নরনারীই এই জনতার অন্তর্ভুক্ত আগেই বলিয়াছি।

৩

অন্ধকার রাত্রির প্রথম প্রহর। এখনো চাঁদ ওঠে নাই, মেঘ উঠিয়াছে, আষাঢ় মাসের রাত্রে যেমন হইয়া থাকে। বিতস্তার নির্জন তীরভূমি বাবলা-জাতীয় বৃক্ষে আচ্ছন্ন; তীরভূমি নির্জন, কিন্তু নির্জীব নয়, প্রথম প্রহরের যামঘোষ কিছুক্ষণ আগে প্রহরী হাঁকিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে এক আধ বার চকিত শৃগালের পদশব্দ শ্রুত হয়, এক আধ বার তাহার ভীত তীক্ষ্ণ ডাক ধ্বনিত হয়—তা' ছাড়া সব নিস্তব্ধ। দূরে তক্ষশীলা নগরীর কোলাহল ও দীপমালার আভা ঠাহর

করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। আগেই বলিয়াছি, এই রকম সময়ে—এই রকম স্থানে সেকেন্দর শা সৈন্য-তরণযোগ্য স্থান সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পরে বাবলাবনে অশ্বচালনা অসম্ভব দেখিয়া একটি গাছের সহিত ঘোড়া বাঁধিয়া তিনি পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অন্ধকারের মধ্যে আর একজন লোক ইতস্তত ঘুরিতেছিল। সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করিলে বোঝা যায় যে, লোকটি যুবক, যুবকটি বীর, তাহার অবয়ব ও অস্ত্রশস্ত্রেই তাহা সপ্রমাণ। তাহার ডান কাঁধ হইতে একখানা সুদীর্ঘ সরল অসি শরীরে বাম দিকে নামিয়া গিয়াছে, বাম হাতে অশ্বারোহীর ত্রিকোণ ঢাল, অশ্ব নাই, যুবক পদব্রজী। আরও সতর্কতার সহিত দেখিলে বোঝা যাইবে, তাহার পা পাদুকাহীন, তাহার অর্ধেক জংঘা অবধি ভেজা; যুবা এইমাত্র জল হইতে উঠিয়াছে, খুব সম্ভব দূর দেশ হইতে আগত, পোষাকে নানা রঙের ধুলা। একদিনে নিশ্চয় অনেক দিনের পথ অতিক্রম করিয়াছে; অশ্ব ব্যতীত এমন সম্ভব নয়। তাহার সিক্ত বস্ত্রেই বর্তমান অশ্বাভাবের রহস্য, ঘোড়াটিকে পরপারে রাখিয়া যুবক একাকী নদী পার হইয়াছে।

বাবলা-বনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া যুবা দূরবর্তী তর্কশিলার দীপমালা লক্ষ্য করিল, তারপরে দ্রুত চলিতে সুরু করিল। কিছুক্ষণ চলিবার পরে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল—কান পাতিয়া শুনিল—অন্ধকারের মধ্যে অদূরে আর্তস্বর। আবার শুনিল, আবার সেই আর্তস্বর এবং সেই স্বর নারী-কণ্ঠের। যুবক সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, কিন্তু বেশী ছুটিতে হইল না, দেখিল—একটি অশ্ব মাঝারি বেগে আসিতেছে, সেই অশ্বপৃষ্ঠে আর্তধ্বনি।

যুবক অগ্রসর হইয়া ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া ফেলিল, বাধা পাইয়া ঘোড়া থামিল, ঝাঁকুনি খাইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে কে একজন পড়িয়া গেল, আর্তস্বর এবার ভূপতিত। এ সমস্তই লহমার মধ্যে ঘটিয়া গেল।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একজন লোক, সেও যুবা এবং কোমরবন্ধের আসিতে মনে হয় বীর পুরুষ, অবতরণ করিল, আর বল্গাধারী যুবককে শুধাইল—কে তুমি? আমার অশ্বরোধ করিলে কেন?

বল্গাধারী বলিল—আমার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তুমি যে চোর, তাহা বুঝিয়াছি, এই রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলে।

যুবকটি বলিল—আমি চোর নই, আমি গ্রীক।

পূর্ববর্তী যুবক হাসিয়া বলিল—বেশ, তা-ই হইল, তুমি গ্রীক চোর।

এবারে গ্রীক যুবকটি বলিল—তোমার দুঃসাহসের অন্ত নাই, তুমি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শার অনুচরদের চোর বলিতেছ ?

—চোরের অপর নাম আমাদের দেশে নাই। জিজ্ঞাসা করি, পরস্বাপহরণ করিতেছ কেন ?

গ্রীক যুবা বলিল—এবারে ভুল হইল, রমণী পরস্ব নয়, ও গ্রীক।

—গ্রীসে বুঝি পরের দ্রব্য লইলে চুরি হয় না।

—তাহার উত্তর পাইতে চাও তো গ্রীসে চলো। এখন পথ ছাড়ো—

এই বলিয়া সে রমণীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভারতীয় যুবক পথরোধ করিয়া বলিল—থামো।

গ্রীক যুবক বলিল—তোমার কি প্রাণ হারাইবার ভয় নাই ?

—সে ভয় উভয়তঃ।

—গ্রীক কখনো যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না।

—এবং পরস্বাপহরণ করিতেও বটে।

শ্লেষের আঘাতে যুবক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—তবে বর্বর, তোর তরবারি খোল্।

ভারতীয় যুবক বলিল—বেশ, তাই খুলিতেছি। কিন্তু আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি, আমাকে বর্বর বলিয়া মনে হইল কেন ?

—তা' জানো না ? জগতে দুইটি জাতি আছে, গ্রীক আর বাকি সব বর্বর ! এবারে বুঝিলে ?

—গ্রীক-সভ্যতার পরিমাপ বুঝিলাম।' তারপরে শুধাইল—তরবারি খুলিব কি ?

—যদি ভয় না পাইয়া থাকো!

ভারতীয় যুবক স্কন্ধ হইতে অসি উন্মোচিত করিল. গ্রীক যুবকটি আগেই কোমরবন্ধনীর অসি খুলিয়াছিল।

গ্রীক অসি হ্রস্ব, ছোরার চেয়ে কিছু বড়, ভারতীয় অসি প্রায় তিন হাত।

গ্রীক যুবক বলিল—তোমার অসি অনেক বড়, এ অসম যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত নয়।

—বর্বরের নিকটে ন্যায়ের আশা করো কেন ? যাই হোক, তোমার অসিখানা দেখি ! ভয় নাই, আমরা নিরস্ত্রকে আঘাত করি না, আমরা গ্রীক নই।

গ্রীক যুবক ক্রমেই ধৈর্যহীন হইতেছিল, কিন্তু নিরুপায়, নিজের অসি ভারতীয়ের হাতে দিল।

ভারতীয় যুবক গ্রীক অসির মাপে নিজের অসিখানা মাপিয়া ভাঙিয়া ফেলিল, তারপরে গ্রীকের হাতে তাহার অসি ফিরাইয়া দিয়া শুধাইল. এইবারে হইল তো! এখন আর নিশ্চয় অন্যায় যুদ্ধ হইবে না?

গ্রীক যুবকটি প্রতিপক্ষের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, আলো থাকিলে দেখা যাইত যে, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

এবারে ভারতীয় যুবকটি বলিল—অন্ধকারে তোমার অসুবিধা হইবে না?

গ্রীক বলিল—আমার কাছে চকমকি আছে, মশাল নাই।

—সেই তো স্বাভাবিক, চোরের পক্ষে মশাল অনাবশ্যক—গৃহস্থের পক্ষে মশাল দরকার।

এবারে রমণী প্রথম কথা বলিল, সে বলিল—চকমকি আমার হাতে দাও, আমি আলো জ্বালিয়া দিতেছি।

গ্রীক যুবক ঘোড়ার জিনের তলদেশ হইতে চকমকি ও শোলা বাহির করিয়া ভারতীয়ের হাতে দিল, ভারতীয়ের হাত হইতে রমণী লইল। তারপরে অনায়াসে আপন বহির্বাস ওড়না খুলিয়া চকমকির আগুনে ধরাইয়া যুবকদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। হঠাৎ আলো জ্বলিয়া ওঠাতে বাবলা গাছের একদল পাখী কিচমিচ করিয়া উঠিল, অদূরবর্তী একটা কৌতূহলী শৃগালের পীতাভহরিৎ চক্ষুতারা ঝকমক করিয়া উঠিল, নিকটবর্তী ভূমি যেমন আলোকিত হইল, দূরবর্তী অন্ধকার তেমনি নিবিড়তর হইল।

কিন্তু যে জন্য এ আয়োজন, তাহাতেই ক্ষণকালের জন্য বাধা পড়িল—যুদ্ধ-বাসনা ভুলিয়া দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর মুখে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে-রূপ হিংসা ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা দৈহিক নয়, তাহা আত্মার জ্যোতি। ট্রয় অবরোধকালে কৌতূহলী হেলেন যখন নগরপ্রাকারে উঠিত, গ্রীক ও ট্রয়-বাহিনী তখন জিঘাংসা ভুলিয়া, জিগীষা ভুলিয়া নিশ্চয় এমনি ভাবে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিত।

৪

মোহ কাটিলে ভারতীয় যুবক বলিল—এবার এসো।

গ্রীকের মোহভাব তখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—অন্ধকারেও ভুল করি নাই।

কথাটি ভারতীয়ের কানে গেল, সে বলিল—অভ্যস্ত চোরের চক্ষু অন্ধকারেও ভুল করে না।

শ্লেষের আঘাতে গ্রীকের মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, উদ্যত অসি লইয়া সে আক্রমণ করিল, ভারতীয় যুবক প্রতিরোধ শুরু করিল। সৌন্দর্যকে সাক্ষী করিয়া গ্রীক ও ভারতীয়ের ইহাই প্রথম অস্ত্র-বিনিময়।

দু'জনেই অসি-চালনায় সুনিপুণ, তবে ভারতীয় যুবকটি মাথায় বেশি উঁচু, ঐখানে তাহার সুবিধা, তার উপরে গ্রীক যুবকটি আজ প্রথম হইতেই বিড়ম্বিত, কাজেই সে অভ্যস্ত নিপুণতা দেখাইতে পারিতেছে না; তাই বলিয়া সে যে কুণ্ঠিত, এমন মনে করিবার কারণ নাই। তাহার হাত ও মুখ দুই-ই চলিতেছে, হাত বেশী চলিলে আজ সে জিতিত।

ভরেতীয়কে একবার অসি দ্বারা আঘাতের চেষ্টা করিতে করিতে গ্রীক যুবক শুধাইল—বর্বর, তোমাকে দাহ করিব, না মাটিতে পুঁতিব?

—সে চিন্তা করিবার সুযোগ হইবে না।

—তবু শুনিয়া রাখি। ইলিয়াড কাব্য পড়িলে জানিতে পারিতে, আমরা নিহত শত্রুর সৎকার-সংস্কারে সাহায্য করিয়া থাকি।

ভারতীয় যুবক তাহাকে অসি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল—তোমাদের সংস্কার কি, বলিয়া রাখো।

—আঃ! গ্রীক যুবকটি আহত হইল।—গ্রীকরা পরাজয় স্বীকার করে না।

—কিন্তু পলায়ন করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আহত, পর্যুদস্ত যুবকটি রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবারে রমণী কথা বলিল—কি করিতেছ! অনুসরণ করিয়া উহাকে হত্যা করো।

পলায়নপরকে আমরা বধ করি না, তা ছাড়া চারি দিক্ যে অন্ধকার।

সত্যই অন্ধকার। রমণীর ওহাডনী জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে। ক্ষণিক আলোকের অবসানে চতুর্দিক ঘনতর অন্ধকার।

যুবকটি রমণীকে বলিল—চলো, তোমাকে স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া আসি।

রমণী এতক্ষণে ভীত হইয়াছে, বলিল—না, না, সে হইবে না, আজ রাত্রে আমি কিছুতেই নগরের দিকে যাইব না, বরং আমাকে তোমার স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া এসো।

—আমার স্বজনগণ এখন কোথায় ?

—কোথায় তোমার দেশ ?

—এই মহাদেশের প্রায় পূর্বপ্রান্তে।

ঐ নদীর পরপারে ?

—ঐ রকম শত শত নদীর পরপারে।

বিস্মিতা রমণী বলিল—এদেশ আমাদের গ্রীসের চেয়েও বড় দেখিতেছি। তারপরে একটু থামিয়া বলিল—তুমি যেখানে থাকো, সেখানে লইয়া চলো।

যুবক অন্ধকারের মধ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—আমি নদীর মধ্যে দ্বীপের ঐ পাহাড়টার গুহার মধ্যে থাকি।

—ওখানে! ওখানে কেন ?

—সে অনেক কথা। তবে এখন এইটুকু শুনিয়া রাখো যে, আমি তক্ষশিলায় আসিতেছিলাম। কালকার রাত্রি ঐ গুহায় কাটাইয়াছি, আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে তক্ষশিলা পৌঁছিব ভাবিয়াছিলাম, মাঝপথে এই ঘটনা। ভাগ্যে তোমার দেখা পাইয়াছিলাম, নতুবা আমার কি হইত!

—এখন কি করিবে বলো ?

—আমাকে তোমার গুহায় লইয়া চলো।

—ভয় করিবে না ?

—ভয় ? তুমিই তো ভয় হইতে উদ্ধার করিলে।

—আর কোন ভয় নাই তো ?

—সে তুমি জানো—

এই বলিয়া রমণী হাসিল।

—ভালো, তবে আমার সঙ্গে এসো। তখন দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর চলিবার পরে দেখিতে পাইল যে, একটি গাছে একটি ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। যুবক ভাবিল—এ মন্দ হইল না, একটি ঘোড়াও জুটিয়া গেল। কিন্তু ভাবিল, পরের ঘোড়া লওয়া যে পরস্বাপহরণ!

তাহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া রমণী বলিল—এ বোধ হয়, সেই লোকটার ঘোড়া।

—তবে লইতে পারি। আততায়ীর ঘোড়া লওয়া পরস্বাপহরণ নয়।

রমণী শুধাইল—তোমার ঘোড়া কি হইল ? অস্ত্র দেখিয়া তোমাকে তো অশ্বারোহী মনে হয়।

যুবক বলিল—আমার ঘোড়া নদীর পরপারে ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার

বিশ্বাস ছিল যে, নদীতে যখন অনেক জল, ঘোড়া পার হইবে না, কিন্তু এই দ্বীপটা থাকাতে এখন জল কম, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, আমি হাঁটিয়া পার হইয়াছি। ঘোড়াটাও হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে।

একটু থামিয়া বলিল—সঙ্গে একটা ঘোড়া থাকা ভালো।

তখন সে ঘোড়াটাকে খুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। অশ্বটি তেজস্বী, বীরের স্পর্শে সে অভ্যস্ত, যুবকের স্পর্শে বুঝিল, যুবক যেই হোক, সে বীর পুরুষ। নদীতীরে আসিয়া যুবক রমণীকে বলিল—তুমি ঘোড়ায় চড়ো, আমি উহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাই, নতুবা তুমি পায়ে আঘাত পাইবে, কাপড়-চোপড়ও ভিজিয়া যাইবার আশঙ্কা।

বাক্যব্যয় না করিয়া রমণী ঘোড়ায় চড়িল, যুবক তাহার বল্‌গা ধরিয়া আগে আগে সাবধানে চলিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বীপটিতে গিয়া পৌঁছিল, জল কোথাও জানুর বেশী নয়।

রমণী নামিল, বলিল—হাঁটিয়া আসিলেও চলিত দেখিতেছি, জল এখানে সামান্য।

যুবক বলিল—শুধু এখানে নয়, দ্বীপের ওদিক্‌টাতেও জল সামান্য, নদী এখানে অনায়াসে হাঁটিয়া পার হওয়া সম্ভব, আমি গতকাল হাঁটিয়াই পার হইয়াছি।

—অথচ নদীতে এখন বন্যা, সর্বত্র গভীর জল।

—এ দ্বীপটা ডোবা পাহাড়ের অংশ, মাঝখানে এই পাহাড়টা থাকায় জল এখানে অগভীর।

এই সব কথা বলিতে বলিতে তাহারা গুহামুখে আসিয়া পৌঁছিল। ঘোড়াটিকে একটি পাথরের সঙ্গে বাঁধিয়া যুবক বলিল—দাঁড়াও, আলো জ্বালি, গুহার মধ্যে চকমকি ও শোলা আছে।

রমণী দাঁড়াইলে যুবক চকমকির সাহায্যে শুকনা কাঠে আগুন জ্বালিল। রাত্রে প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া দিনের বেলাতেই কাঠের টুকরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আলোতে গুহার ভিতরটা প্রকাশ পাইল, মাঝারি আকারের গুহা, নীচের পাথর সমতল, তার উপরে খান দুই কম্বল, একটি জলপাত্র, পাশে কিছু ফল-মূল—আর কোথাও কিছু নাই।

যুবক বলিল—আমার রাজপ্রাসাদ দেখিলে তো?

রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী, বলিল—তুমি কি রাজার ছেলে?

—একথা কেন শুধাইতেছ ?

—তোমার মুখে ঐ রাজপ্রাসাদ শব্দটা শুনিয়া।

যুবক একটু দ্বিধা করিয়া বলিল—না, আমি রাজপুত্র নই।

রমণী এবার বলিল—তবে তোমার রাজা হইবার ইচ্ছা আছে ?

—রাজা হইতে কাহার না ইচ্ছা ?

যুবকের পরিহাসে রমণী হাসিল, রমনীর হাসিতে যুবকটি হাসিল, পৌরুষ আর সৌন্দর্য যখন একযোগে হাসে, দেবতারা সে দৃশ্য উপভোগ করিয়া ধন্য জ্ঞান করেন।

যুবক শুধাইল কি, এখানে রাত্রিবাস করিতে রাজি তো ? এখনো বলো, তোমাকে তক্ষশিলায় রাখিয়া আসি।

—আমি এখানেই থাকিব—বলিয়া রমণী গুহা মধ্যে ঢুকিয়া কম্বলের উপরে উপবেশন করিল, অগত্যা যুবা পুরুষও প্রবেশ করিল।

৫

অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া গেলে ভারতীয় যুবক ও গ্রীক রমণী কম্বলশয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিল। চরাচর নিস্তব্ধ ও নির্জন। কেবল কান পাতিয়া থাকিলে শোনা যায় যে, বিতস্তার পশ্চিম তীরে প্রহরী গ্রীক সৈন্যেরা তখন পাশ্চাত্যখণ্ডের আদি কবি হোমারের ইলিয়াডগাথা গান করিতেছে, আর পূর্বতীরে পুরুরাজের প্রহরী ভারতীয় সৈন্যেরা প্রাচ্যখণ্ডের আদি কবি বাল্মিকীর রামায়ণ কাব্য গান করিতেছে—আর তাকাইয়া থাকিলে গুহামুখের আকাশে আকাশপ্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎসুক সপ্তর্ষিগণ মহালগ্ন সমাসন্ন জানিয়া সকৌতূহলে অপেক্ষা করিয়া আছেন। দুই আদি কবির মাঙ্গল্য মন্ত্রের সঙ্গীতে, অনাদিকালের নক্ষত্রলোকের সাক্ষ্যে এই মুষ্টিমেয় গুহা-মধ্যে ভারত ও য়ুনানীমণ্ডলের বসনাঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া গেল।

রাত্রি আরও গভীর হইল। আদিকবির কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল, সপ্তর্ষিগণ স্নানার্থে মানসযাত্রা করিলেন, কেবল কন্দর্পের স্বর্ণোজ্জ্বল সিঁধকাঠির মতো কৃষ্ণাদশমীর তীক্ষ্ণ চন্দ্রকলার আকাশের প্রান্তে সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার আর বিরাম হইল না।

নিশান্তের অন্ধকার থাকিতেই যুবক-যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দুইজনে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তখন যুবক শুধাইল—তোমার নাম কি? রমণী বলিল—ক্লিওফিস (Kleophish)। যুবক উচ্চারণ করিল—ক্লিওফিস। এবারে রমণী শুধাইল—তোমার নাম কি?

যুবক বলিল—চন্দ্রগুপ্ত।

রমণী উচ্চারণ করিল—স্যান্ট্রাকোটাস্ (Santrakottas)।

উচ্চারণ করিয়াই রমণী বুঝিল—হয় নাই, অপ্রস্তুত হইয়া হাসিল।

তাহার হাসিতে যুবকটিও হাসিল, বলিল—ঠিক হইয়াছে।

তখন দুইজনে গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে আসিবামাত্র রমণী বিস্ময়ে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—এ কি করিয়াছ?

—কেন, কি হইয়াছে?

—এ কার ঘোড়া আনিয়াছ?

—কেন? কার?

—এ যে স্বয়ং মাসিডনপতি সেকেন্দর শার ঘোড়া! কে না চেনে? সর্ব্বনাশ!

ভয়ে সে বসিয়া পড়িল।

যুবক ভীত হইবার লক্ষণ দেখাইল না, বলিল—এ তো শুভ লক্ষণ! দিগ্বিজয়ী রাজার ঘোড়া ঘরে আনিয়াছি, আমিই কেন দিগ্বিজয়ী রাজা না হইব?

—না, না, পরিহাস নয়। ওকে এখনি ছাড়িয়া দাও—

তাপরে সবিস্ময়ে বলিল—আমি ভাবিতেছি, ও তোমার সঙ্গে আসিল কেন?

—ও বুঝিয়াছে, কালক্রমে আমিও দিগ্বিজয়ী রাজা হইব, তাই আসিয়া আজ আমার রাজপ্রাসাদটা দেখিয়া গেল।

কিন্তু এই পরিহাসেও রমণীর ত্রাস কমিল না, তখন যুবকটি বলিল—চলো, নদীর তীরে উঠিয়া ওকে ছাড়িয়া দিতেছি।

তারপরে বলিল—ভয় পাইও না, রাজার ঘোড়া রাখিব না, খাইতে দিব কি? নিজেই খাইতে পাই না।

তখন তাহারা ঘোড়াটিকে লইয়া বিতস্তার পশ্চিম তীরে আসিয়া উঠিল এবং ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিল। অশ্ব তক্ষশিলার অভিমুখে ছুটিল।

যুবক যুবতীও ভিন্ন পথে তক্ষশিলার দিকে চলিল।

সেকেন্দর শা পুনরায় আজ অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে নদীতীরে আসিয়াছেন। গোপনে সৈন্যতরণ-যোগ্য স্থান এখনও খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার দৃষ্টি পর-

পারের দিগন্তে নিবদ্ধ, মর্মর-কঠিন ললাটের অভ্যন্তরে ইতিহাসের ভ্রান্তির কী তরঙ্গের ওঠাপড়া চলিতেছে; বল্‌গা শিথিলভাবে ধৃত, ঘোড়া আপন মনে চলিয়া সুযোগ পাইয়াছে।

সেকেন্দর শার দৃষ্টি যখন ঘোড়ার দিকে ফিরিয়া আসিল, দেখিলেন যে, ঘোড়া নদীর একটি নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। নদীর মধ্যে একটি দ্বীপ। ঘোড়া আপন মনে নদীতে নামিতে লাগিল, কৌতূহলী বীর বাধা দিলেন না,ঘোড়া অনায়াসে নদী হাঁটিয়া পার হইয়া দ্বীপটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেকেন্দর শা আনন্দিত বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন—এত দিন তো তিনি এই স্থানটিরই সন্ধান করিতেছিলেন! তাঁহার অভ্যস্ত দৃষ্টিতে বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, দ্বীপের ওদিকেও জল অগভীর। এবারে গোপনে সৈন্যতরণ-যোগ্য স্থান পাওয়া গেল!

সেকেন্দর শা ভাবিলেন, ঘোড়া এ স্থানের সন্ধান পাইল কি ভাবে? তখনি তাঁহার কাল রাত্রে ঘোড়ার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের ও সারা রাত্রি অনুপস্থিতির ঘটনা মনে পড়িল। তিনি স্থির করিলেন—আর কিছুই না, ঘোড়াটা উপলক্ষ মাত্র, তাঁহার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ বীর হারকিউলাস ঘোড়াটিকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। নতুবা ঘোড়ার কি সাধ্য! তখন তিনি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় হারকিউলাসের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানাইলেন এবং তখনি হৃষ্টচিত্তে তক্ষশিলার অভিমুখে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া যাত্রা করিলেন।

সিন্দুক

কলিকাতার সহস্র বিদ্যুতালোকের তলে বসিয়া মন নিশ্চেস্ট বলে যে, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কিছু থাকিতে পারে না ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্রে বসিয়া বলা সম্ভব বটে যে, সংসারে অলৌকিক বলিয়া কিছু নাই, কেননা বিজ্ঞান সমস্ত ত্রিলোকের সীমা সহব্রহ্ম মাপিয়া-জুখিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, কোথাও অলৌকিকত্ব পায় নাই। এ সবই সত্য স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, সংসারের সবটাই কলিকাতা নয়। এমন স্থানও আছে, যেখানে কি বিদ্যুতের আলো, কি বিজ্ঞানের আলো কিছুই প্রবেশ করে নাই। সেখানে মনের এমন নিশ্চিন্ত ভাব থাকে কি? দিনের বেলায় যাহারা ভূতে বিশ্বাস করে না, রাতের বেলাতেই তাহারাই ভূতের কথা শুনিলে জড়ো-সড়ো হইয়া বসে। প্রভেদ ঘটায় ঐ আলোতে। সে আলো বিদ্যুতের হইতে পারে, আবার বিজ্ঞানেরও হইতে বাধা নাই। যাক্, ও সব তত্ত্ব আলোচনা এক্ষেত্রে বাহুল্য। আজ আমি একটি ঘটনার বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, কলিকাতার পাঠক কতখানি বিশ্বাস করিবে, জানি না। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, তাঁহারা সকলেই যে মূর্খ বা গ্রাম্য লোক এমন নহে। তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। বিশেষ, যাঁহার সঙ্গে এই ঘটনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী এবং বিজ্ঞান বিষয়েও কৃতবিদ্য। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অন্যতম। তাঁহার নামোল্লেখ করা উচিত হইবে না! কাজেই এই কাহিনীর মধ্যে তাঁহাকে র-বাবু বলিয়া উল্লেখ করিব।

র-বাবু আমার অনেককালের বন্ধু। একবার তিনি জানাইলেন যে, এবারে বড়দিনের বন্ধে আমাদের গ্রামে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

—চলুন না, এ সময়ে দুধ-মাছ প্রচুর।

—তা ছাড়া আর কিছু আছে কি ?

—আবার কি থাকা সম্ভব ?

—এই যেমন প্রাচীন ভগ্নাবশেষ।

—গ্রামে তো সবই প্রাচীন এবং তাহাও ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

না, পরিহাস নয়। কাছাকাছি প্রাচীন গ্রাম নেই কি? ভালো ক'রে ভেবে দেখুন।

তখন মনে পড়িল যে, আমাদের গ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে চাঁপাডাঙা নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। গ্রাম মানে কেবল নামটাই আছে, জনপ্রাণীও নেই, সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। প্রবাদ আছে যে, নবাবী আমলে চাঁপাডাঙায় নবাবের ফৌজদার থাকিতেন, তখন গ্রামটির বিপুল সমৃদ্ধি ছিল। তারপরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ফৌজদারী পদ লোপ পায়। কিন্তু গ্রামের সমৃদ্ধি তখনও ছিল। কিছুদিন পরে একবার মহামারীতে নাকি গ্রামের বারো আনা রকম লোক মারা যায়, বাকী সকলে উঠিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। সেই হইতে গ্রাম শ্মশান। শ্মশান বলিলে কম বলা হয়—সমস্ত অঞ্চলটি ছোটখাটো একটি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল সেকালের স্মৃতি জাগাইয়া পড়িয়া আছে প্রকাণ্ড সব অট্টালিকা, একটির পরে আর-একটি, এমনি দু'তিন শত বিঘাব্যাপী। অধিকাংশ অট্টালিকাই এমন ধ্বংসস্তূপ, কোনটার প্রাচীর নাই, কোনটার ভিত্তি টলিয়া গিয়াছে, ছাদ বোধ করি কোনটারই নাই। সেখানে সাপ ও শিয়ালের অবাধ অধিকার। শীতকালে সাপ থাকে না, তবে মাঝে মাঝে গো বাঘা বাহির হয় বলিয়া শুনিয়াছি। সেদিকে কাঠুরে ছাড়া আর কেহ যায় না, প্রয়োজন নাই বলিয়া যায় না, ভয়ের কারণ আছে বলিয়া যায় না। তবে কখনো কখনো গ্রামান্তরের বালক ও যুবকেরা চড়িভাতির জন্য গিয়া থাকে বটে, আমরাও কখনো কখনো গিয়াছি।

র-বাবুর কাছে চাঁপাডাঙার বর্ণনা করিলাম। ভাঙা বাড়ীর বিবরণ শুনিয়া মানুষের মুখ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না, দেখিবার পরেও মাঝে মাঝে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি শুধাইলেন—আর কিছু আছে কি?

—আর কি থাকবে?

—এই যেমন শিলালিপি, কি মূর্তি?

—মুসলমান ফৌজদারের গ্রামে মূর্তি কেমন ক'রে থাকা সম্ভব? তবে শিলালিপির সন্ধান তো কেউ করে নি, চলুন না, আপনি করবেন।

—বেশ তাই হবে। বড়দিনের ছুটির তো আর ক'দিন মাত্র বিলম্ব।

—ঠিক কথা, আর একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক আছে।

—ভিতরে কি আছে?

—কেমন ক'রে জানবো?

—কেন?

—কেউ খুলতে পারলে তো! আমরা একবার জন-দশেক মিলে চেষ্টা ক'রে দেখেছি ডালা তোলা যায় না!

—তালা বন্ধ?

—তালা বলে কিছু নেই। হয়তো ভারী বলেই তোলা যায় না, নয়তো ভিতর থেকে কোন কৌশলে আটকানো।

—খুব ইনটারেষ্টিং। ওটা খুলতে পারলে পুরানো কাগজপত্র পাওয়া যেতে পারে।

লোকে বলে, ওর মধ্যে থাকতো নবাবের খাজনার টাকা।

—অসম্ভব নয়।

—লোকের বিশ্বাস ওর মধ্যে বাদশাহী মোহর আছে।

—তার মানে পুরানো মোহর, র-বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—পুরানো মোহর অত্যন্ত দামী জিনিস।

—নূতন মোহরটাই যেন খোলামকুচি—

—না-না, সে দামের কথা ভাবছি না. ওর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অসীম।

—চলুন, গিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু একথা জানবেন যে, ও সিন্দুক খোলা মানুষের সাধ্য নয়।

কেন?

—কেউ এ-পর্যন্ত খুলতে পারেনি, তা'ছাড়া ভয়ের কারণও নাকি আছে বলে শুনেছি।

এবার র-বাবু প্রত্নতাত্ত্বিক হাসি হাসিলেন, বলিলেন, পুরানো বাড়ীর সঙ্গে সর্বত্রই স্মৃতি জড়ানো, বিশেষ ভূতের ভয় করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ অচল হ'য়ে দাঁড়ায়। তা' কত পুরানো জায়গাতেই তো ঘুরলাম, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা. অলৌকিক-অপ্রাকৃত তো কিছু চোখে পড়ল না।

দু'দিন হইল র-বাবুকে লইয়া আমার গ্রামে আসিয়াছি। স্থির হইয়াছে যে, আগামীকাল বেলা দশটার মধ্যে আহার সারিয়া র-বাবু, আমি এবং গ্রামের আরও চার-পাঁচজন যুবক চাঁপাডাঙায় রওনা হইব। পাঁচ মাইল

পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করা শীতের দিনে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব।

পরদিন বেলা একটার মধ্যেই চাঁপাডাঙায় আসিয়া পৌছিলাম। অরণ্যের গভীরতা এবং ভগ্নস্তূপের প্রাচুর্য দেখিয়া র-বাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক মন ভারী খুশী হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, এই যে আর একটা গৌড়। হাঁ, এমনটিই আশা করছিলাম।

তারপর তাঁহার পিছু পিছু আমরা চলিলাম। যেখানে বেশী ভাঙা, সেইখানেই তাহার বেশী আকর্ষণ। আস্ত দেয়াল দেখিবামাত্র সেদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন, আবার ভাঙা দেয়াল দেখিলেও সেই অবস্থা।

—র-বাবু একটু সরে দাঁড়ান, থামটা ধসে পড়তে পারে!

—দাঁড়ান একটা ছবি তোলবার চেষ্টা করি। র-বাবু ক্যামেরা বাগাইয়া ধরিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের অপরিহার্য সঙ্গী ক্যামেরা।

কখনো বা একটা ভগ্ন থামের কাছে আর একটা ভগ্নপ্রায় থামের মতো নিশ্চল হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। কি দেখিতে পান, তিনিই জানেন।

মোট কথা, তাঁহার সঙ্গে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পারতপক্ষে কেহ যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে না বাহির হয়।

এবারে তিনি বলিলেন—চলুন, সিন্দুকটা দেখে আসি।

যে অট্টালিকার মধ্যে সিন্দুকটা আছে, লোকে তাহাকে সিন্দুক-বাড়ী বলে। তাহার দরজা-জানালা কিছুই নাই, তবে ছাদটা আছে, সেইজন্য ভিতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার।

সিন্দুকটা দেখিয়া র-বাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন—এ যে একটা ছোটখাটো ঘর, মশাই।

—তা বই কি। ওর মাপ-জোখ আমাদের জানা আছে। পাঁচ ফুট খাড়াই, আর দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে দশ ফুট ও আট ফুট।

—হবেই তো। সেকালে তো কারেন্সী নোট ছিল না, খাজনার টাকা রাখবার জন্য প্রকাণ্ড সিন্দুকের দরকার হ'ত। কিন্তু কই, তালাচাবি তো দেখি না!

আমি বলিলাম—হয়তো এককালে ছিল।

—কিন্তু খুলতো কি উপায়ে?

আমি বলিলাম—হয়তো খুলবার কিছু কৌশল ছিল ; নইলে শুধু গায়ের জোরে খোলা অসম্ভব।

—বাপ, এর ডালারাই তো ওজন বোধ করি পঞ্চাশ মণ হবে, বলিলেন র-বাবু।

—হবেই তো।

—সংখ্যায় আমরা বেশী হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে না-হয় দেখতাম।

—আমরা বিশজনে চেষ্টা ক'রে দেখেছি।

আর একজন সঙ্গী বলিল—সেবার আমরা শিকারে এসেছিলাম। ফিরবার পথে সকলে মিলে চেষ্টা করলাম, সংখ্যায় জন-ত্রিশেকের কম ছিলাম না।

এমন সময়ে একদল চামচিকা ফরফর শব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল এবং একটা ভীত শিয়াল পাশ দিয়া ছুটিয়া পালাইল।

আমি বলিলাম—চলুন, বাইরে যাওয়া যাক্, ভিতরটায় কেমন ভাপসা গন্ধ, আর কেমন একরকম ছমছমে অন্ধকার।

আর একজন সঙ্গী বলিল—হাঁ, এবার কোথাও বসে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

সঙ্গে ফ্লাস্কে চা ও টিফিন ক্যারিয়ারে খাদ্য ছিল।

সকলে বাহির হইলাম এবং বসিবার মতো পরিচ্ছন্ন স্থান সন্ধান করিতে লাগিলাম। মনোমত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে মিনিট দশেক সময় লাগিল, যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম, দেখি র-বাবু নাই! কোথায় গেলেন? দু'চার মিনিট অপেক্ষা করিয়া নাম ধরিয়া ডাকাডাকি সুরু করিলাম! যে ঘন জঙ্গল, দলচ্যুত হওয়া বা পথ হারানো মোটেই অসম্ভব নয়।

যখন অনেক ডাকাডাকির পরেও উত্তর পাইলাম না, তখন চারিজন চারদিকে বাহির হইলাম। এ তো বিষম মুশকিল হইল দেখিতেছি।

কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে সমস্ত অঞ্চলটা প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

চারজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, এ যে র-বাবুর স্বর!

—কোন্ দিক থেকে আসছে?

—চলো, সিন্দুক-বাড়ীর দিকে দেখা যাক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৌতূলের অবসান হইল।

সিন্দুক-বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম, সিন্দুকের কাছে র-বাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত। আর কিয়দ্দূরে তাঁহার ক্যামেরা পড়িয়া আছে।

—কি ক'রে হ'ল?

—কেন হ'ল?

—ভয় পেয়েছেন?

—না, না, ক্লান্তি। কলকাতার লোক, বেশী হাঁটার তো অভ্যাস নেই!

আমি বলিলাম—আগে বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে অন্য কথা।

চারজনে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া মাঠের মধ্যে শোয়াইয়া দিলাম এবং একজন মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। আমি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলাম—না নাড়ীর গতি ঠিক আছে, ভয় নেই।

—কিন্তু ওঁর গায়ের কাপড়টা গেল কোথায়?

—দেখো তো অজয়, বোধ হয় সিন্দুকের কাছেই কোথাও পড়ে আছে।

এক মুহূর্ত পরে অজয় ছুটিয়া বাহিরে আসিল, মুখ তাহার শাদা।

—কি ব্যাপার! গায়ের কাপড় কই?

অস্ফুটকণ্ঠে অজয় বলিল—আপনারা কেউ যান।

—সে আবার কি?

আমি অগ্রসর হইতে যাইব, সে জামা ধরিয়া টানিল—একা যাবেন না।

—বেশ তো তুমিই এসো না।

এতক্ষণ পরে সাহস পাইয়া কিংবা কৌতূহলের তাড়নায় সে আমার পিছু পিছু আসিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখি গায়ের কাপড়খানা মাটিতে লুটাইতেছে। আমি শুধাইলাম, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

সে কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিত করিল, দেখিয়া মুহূর্তের জন্য আমার গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল, দেখিলাম, গায়ের কাপড়ের একপ্রান্ত সিন্দুকের ডালা-চাপা!

দু'জনে তখনি বাহির হইয়া আসিলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরে একখানা গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া র-বাবুর অর্ধ সংজ্ঞাহীন দেহ তাহাতে চাপাইয়া দিয়া রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, ভয়ের কারণ নাই, কোন কারণে অকস্মাৎ নার্ভাস শক পাইয়াছেন। অপ্রীতিকর আলোচনা উঠিতে পারে, এমন কোন

প্রসঙ্গ তুলিতে নিষেধ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। সামান্য গরম দুধ মাত্র পান করিয়া র-বাবু তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া রহিলেন।

পাশের ঘরে আমরা পরস্পরকে শুধাইতে লাগিলাম, গায়ের কাপড় সিন্দুকের ডালা চাপা পড়িল কি-রকম ভাবে?

—ও ডালা পঞ্চাশজন লোকে ঠেলে তুলতে পারে না।

—আর খুব সম্ভব ভিতর থেকে বন্ধ!

—তবে কি!

র-বাবুর মূর্ছা আর আমাদের কাছে বিস্ময়জনক নয়, আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম মূর্ছার কারণ ঐ অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে নিহিত। কিন্তু সেটা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল? হয়তো র-বাবু বলিতে পারেন, কিন্তু ও-সব প্রসঙ্গ তুলিতে ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ।

এই ঘটনার পরে র-বাবু আমাদের গ্রামে মাত্র আর তিনদিন ছিলেন। সকলেই বলিল—আর নয়, একটু সুস্থ হইবামাত্র ঘরের ছেলেকে ভালোয় ভালোয় ঘরে পাঠাইয়া দাও। যে কয়দিন তিনি ছিলেন, একদম কথাবার্তা বলিতেন না, এমন কি পাশে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিলেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অতএব তাঁহার দ্বারাও যে রহস্যভেদ হইবে, সে আশা বড় রহিল না এবং সত্য সত্যই আমাদের সম্মিলিত কৌতূহলকে অপরিতৃপ্ত রাখিয়া তিনদিন পরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে র-বাবুর চিঠি পাইলাম, তিনি লিখিতেছেন—

'এতদিনে সুস্থ হ'য়ে উঠেছি এবং বোধ হয় ধীরভাবে চিন্তা করবার শক্তিও ফিরে পেয়েছি, কাজেই ভাবছি যে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যা লিখবো তাতে আপনাদের কৌতূহল শান্ত হবে কিনা সন্দেহ, কেননা সেদিন যা ঘটেছিল আমি আজও তার পূর্বাপর খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল লিখছি।

আপনাদের সঙ্গে সিন্দুক-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেই মনে হ'ল যে সিন্দুকটা একটা ছবি তুলে নিলে হ'ত। আপনারা তখন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন, তাই আপনাদের আর ডাকলাম না, ভাবলাম ছবি তোলা দু' মিনিটের ব্যাপার।

আবার সিন্দুক-বাড়ীতে ঢুকলাম। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখি যে সম্ভব নয়। একে তো ভিতরটা অন্ধকার তারপরে আবার বেলা পড়ে এসেছে, দু'চার

মিনিট চেষ্টা ক'রে যখন বুঝলাম যে অসম্ভব তখন বের হবার জন্ম মুখ ফেরালাম। এমন সময়ে অনুভব করলাম আমার গায়ের কাপড়খানা ধরে কে যেন টানছে, ফিরে দেখি, সিন্দুকের ডালা একটু ফাঁক হয়েছে, আর ভাবলে এখনো সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, তার মধ্যে থেকে একখানা হাতের কিয়দংশ, সে হাতে রক্তমাংস নেই, ধূসর চর্ম দিয়ে শুধু হাড় ক'খানা ঢাকা, সেই হাত আমার চাদর ধরেছে। এক মুহূর্তের জন্ম আমার শরীরের রক্ত জমে গিয়ে আমি যেন পাষাণ হ'য়ে গেলাম, তার পরেই মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলাম। পড়বার সময়ে খুব চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম, সেই চীৎকার শুনেই আপনারা এসে থাকবেন।

আর কিছুই মনে নেই, তবে এ নিশ্চয় বলতে পারি, অত বড় ভারী ডালাটা যে ফাঁক হ'ল, এতটুকু শব্দ হয়নি, আর এটাও অর্ধচৈতন্য অবস্থায় মনে আছে যে, ডালাটা নেমে যাবার সময়েও এতটুকু শব্দ করেনি! ঐ এক মুহূর্তের মধ্যেই সিন্দুকটার ভিতরেও বোধ করি আমার দৃষ্টি একবার পড়ে থাকবে, নইলে এ স্মৃতি কোত্থেকে এল, ভিতরে যে পুঞ্জিত ধোঁয়ায় গঠিত বিরাট একটা দেহ সিন্দুকটার সমস্তটা পূর্ণ ক'রে রয়েছে। আর কিছু মনে নেই। তা ছাড়া ঐ স্মৃতিটাই বিষাক্ত বলে' মনে হচ্ছে, ওটাকে সযত্নে চাপা দিয়ে রাখছি। যেটুকু নেহাত না লিখলে নয়, আপনারা নিশ্চয়ই জানবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাই লিখলাম। এ বিষয়ে আর কোন প্রকার আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই।'

র-বাবুর চিঠিতে রহস্যভেদ না হইয়া রহস্য ঘনতর হইয়া উঠিল মাত্র।

ইহার পরে আর অল্পই বলিবার আছে। র-বাবু চলিয়া আসিবার পরে একদিন আমরা আট-দশজনে মিলিয়া চাঁপাডাঙায় গিয়াছিলাম গায়ের কাপড়-খানার কি হইল জানিবার উদ্দেশ্যে। সিন্দুকের কাছে গিয়া দেখি তার কাপড়খানার চিহ্নমাত্র নাই। তখনি আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সকলেই মনে মনে বুঝিলাম, যদিচ মুখে কেহ কিছু প্রকাশ করিলাম না যে কাপড়খানা সিন্দুকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে, অন্য কোন প্রকারে তাহার লোপ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অবচেতন

এতদিনে সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ করা যাইতে পারে। কাহিনী বলিতে সাধারণত অবাস্তব ও অলৌকিক কিছু বোঝায়। যে-বিবরণ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা আমার পরিচিত এক ব্যক্তির স্বচক্ষে দৃষ্ট, তবু কাহিনী ছাড়া আর কোন শব্দ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কে বিশ্বাস করিবে, কে না করিবে, সে চিন্তা আর করিব না, ঐ চিন্তা করিয়াই কাহিনীটি এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু এখন শ-বাবুর মৃত্যু হওয়ায় কাহিনী প্রকাশের মূল প্রতিবন্ধক দূর হইয়াছে।

আমি নিজে শ-বাবুর মুখে গল্পটি একবার শুনিয়াছি। তাহার প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের আশায় দুইজনে মিলিয়া ঘটনার উপরে যুক্তি ও বিচারের আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিয়াছি, যত রকমে সম্ভব তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়াছি, ব্যাপারটা অবচেতন মনের লীলা, না অতি প্রাকৃতের খেলা, না কেবলি চোখের মরীচিকা, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমবার শুনিয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, আজও তেমনি হতবুদ্ধি আছি। বরঞ্চ সে-ভাবটা যেন আরও বাড়িয়াছে। অসম্ভবের রঙ কালক্রমে ফিকা হইয়া আসে, কিন্তু ইহার রঙ ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছে। তাহার উপরে শ-বাবুর মৃত্যুতে এ-বিষয়ে আলোচনা করিবার সঙ্গীরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় একাকী মনে মনে ঘটনাকে ওলট-পালট করিয়া দেখি, যথা পূর্বং তথা পরম্, কোন তল পাই না।

অবশেষে এক সময়ে শ-বাবুকে বলিয়াছিলাম, "বিচার-বিশ্লেষণ থাকুক, আমার অবচেতন থিওরি আর আপনার অতিপ্রাকৃত থিওরিও থাকুক, এক কাজ করুন, ঘটনার বিবরণ লিখে ফেলুন।"

আমার কথা শুনিয়া শ-বাবু বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কী সর্বনাশ! তাহলে লোক মনে করবে আমি গাঁজা ভাঙ খাই।"

"সে-ভয় করলে সাহিত্যিকদের ব্যবসা বন্ধ করতে হয়।"

"আমি তো সাহিত্যিক নই।"

"সেই জন্যই তো লোকে সহজে বিশ্বাস করবে। কাহিনী রচনা করে লোক ভোলানো তো আপনার পেশা নয়।"

"না মশায়, ও অনুরোধ করবেন না! যার রহস্য নিজেই উদ্ধার করতে পারলাম না, সে-বস্তু আমি পাঠকদের ঘাড়ে চাপাতে চাইনে।"

প্রথম দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল। তারপর দিনে দিনে বারে বারে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহার মন অনুকূল করিয়া আনিলাম, আর অবশেষে ঘটনাটির বিবরণ তিনি লিখিয়া ফেলিলেন। আমি শুনিয়া বলিলাম, "চমৎকার হয়েছে। কে বলল আপনি সাহিত্যিক নন।"

"আপনিই প্রথম বললেন যে, আমি লিখতে পারি।"

"সে-কথা জানিনে। তবে এ-ঘটনা এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এর উপরে সাহিত্যিক ছলাকলা আরোপিত হলে ঘটনার স্বাভাবিক ভয়াবহতা ক্ষুণ্ণ হত ছাড়া বাড়ত না। এবারে এক কাজ করুন, রচনাটি কোন কাগজে পাঠিয়ে দিন।"

"ক্ষেপেছেন নাকি?"

"ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি এই যে লোকে গাঁজাখোর ভাববে।"

ভাবিলাম আজ আর বেশী ঘাটাইয়া কাজ নাই, অনুরোধ করিয়া যখন লিখাইতে পারিয়াছি, তখন একদিন ছাপাইতে রাজি করাইতেও পারিব;

কিছুদিন ব্যাপারটা চাপা পড়িয়াছিল, শ-বাবু কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপরে ফিরিয়া আসিয়া একদিন রচনাটি হাতে করিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "নিন, এটা আপনার কাছে রেখে দিন।"

বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, "হঠাৎ?"

"কোন দিন মরে যাই; কেউ জানতেও পাবে না।"

"আপনি তো কাউকে জানাতে চান না। তা ছাড়া, হঠাৎ মরতেই বা যাবেন কেন?"

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বটে। তবে কি জানেন, লেখাটা আপনার কাছেই থাকুক, আপনার উৎসাহেই লিখেছিলাম কিনা।"

ভাবিলাম, হাতে যখন আসিল, এখন ছাপিতে পারিব। কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করিয়া কৃত্রিম বৈরাগ্যের সহিত বলিলাম, "থাকুক, কিন্তু সর্ত কী?"

"আমি জীবিত থাকতে প্রকাশ করবেন না, মরবার পরে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আপনার রইল।"

তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কিন্তু একটি অনুরোধ, রচনার বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ হলে আপনি তাতে যোগ দেবেন না, বলবেন যে, লেখকের নিষেধ আছে।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু মৃত্যুর কথা এত ভাবছেন কেন?"

"নিকটতম প্রতিবেশী সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।"

"আচ্ছা, আপনি সচেতন থাকুন, আমি আপনার সর্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকলাম।"

এই বলিয়া লেখাটি হাতবাক্সের তলায় সযত্নে রাখিয়া দিলাম।

হঠাৎ নিকটতম প্রতিবেশী শ-বাবুকে স্মরণ করিলেন। শ-বাবুর মৃত্যু একেবারেই অপ্রত্যাশিত; তাঁহার কোন রোগও হয় নাই, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, আর বয়সও পঞ্চাশের নীচে। অকালমৃত্যুর শোচনীয়তায় ঘটনাটি প্রতিভাত হইল। তখন তাঁহার কথা মনে পড়িল, মৃত্যুর সম্ভাব্যতার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন, মৃত্যুর কোন বয়স নাই।

এবারে রচনাটি প্রকাশের পক্ষে আর কোন বাধা নাই, কাজেই সেটি কাগজে পাঠাইয়া দিতেছি। বলা অনাবশ্যক হইলেও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রচনার একটি অক্ষরও আমি অদল-বদল করি নাই, কিংবা একটি কমা-সেমিকোলনও বসাই নাই, যেমন ছিল অবিকল তেমনি আছে। কেবল শ-বাবু রচনার নাম দিয়া যান নাই, একটি নাম দরকার, তাই নামটি আমি বসাইয়া দিলাম অবচেতন। শ-বাবুর শর্তানুযায়ী বাদানুবাদে নামিতে আমি অপারগ; যাঁহার খুশি বিশ্বাস করিবেন, যাঁহার খুশি নয় অন্যথা করিবেন; স্বয়ং লেখক এখন সমস্ত প্রশ্নের অতীত, আর তাঁহারই অনুরোধে আমারও এখন মুখ বন্ধ।

* * *

বড়জামদা থেকে রওনা হয়ে ডিভিশন্যাল রেঞ্জার মিঃ শ্রীবাস্তব আর আমি একদিন দুপুর বেলা থলকোবাদ ফরেস্ট বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বেয়ারা বারান্দায় দু'খানা চৌকি বের করে দিল, আমরা বসলে সে চা আনতে গেল।

মিঃ শ্রীবাস্তব আরম্ভ করলেন, "জানেন মিঃ রায়, সারান্দা ফরেস্টের মধ্যে এই বাংলোটাই সব চেয়ে উঁচুতে, প্রায় আড়াই হাজার ফুট হবে।"

"কেন, এর চেয়ে উঁচু পাহাড় কি আর নেই ?"

"থাকলেও সেখানে বাংলো নেই।"

তারপরে আবার শুরু করলেন, "প্রায় বছর কুড়ি আগে পার্কার নামে একজন রেঞ্জার ছিল, লোকটার সুন্দর দৃশ্যের উপরে খুব টান ছিল; তাই বেছে সুন্দর জায়গাতে সে ফরেস্ট-বাংলো তৈরি করিয়েছে। ছোটনাগরা, আঙ্কুয়া সমস্তই মনোরম স্থান, কিন্তু এই থলকোবাদের কাছে কেউ নয়।"

শ্রীবাস্তব লোকটি খুব মিশুকে আর গল্পবিলাসী। আমি গল্প করতে পারি জেনে আমার মত সামান্য ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। যখনি 'টুরে' বের হন, আমার ছুটি থাকলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

আমি বললাম, "এ-জায়গা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু সুন্দর তো কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনও। আমার এ-জায়গা কেন ভাল লাগছে জানেন ?"

"কেন শুনি।"

"এ জায়গাটির মধ্যে একটি প্রচণ্ড ভয়াবহতা আছে।"

"ভয়াবহতা না থাকলে সৌন্দর্য দীর্ঘকাল মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। ক্ষুদ্র সৌন্দর্য চোখ ভোলায়, মহৎ সৌন্দর্য মন ভোলায়।"

আমি বললাম, "যেমন সমুদ্র আর হিমালয়।"

"আর যেমন এই থলকোবাদ পাহাড়।"

আমি বললাম, "তা বটে, এই দেখুন ঘড়িতে এখন একটার বেশী নয়, কিন্তু রোদের তেজ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচটা বাজে।"

"পাঁচটা যখন সত্যি বাজবে, তখন ঘোর অন্ধকার হবে।"

আচ্ছা—ঐ যে অনেক দূরে ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে একটা সাদা রেখার মত দেখা যাচ্ছে, ওটা কি নদী নাকি ?

"কোয়েল নদী, ঘণ্টা খানেক আগে পার হয়ে এসেছি।"

এমন সময়ে বেয়ারা এসে জানাল যে খানা তৈরি হয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে মিঃ শ্রীবাস্তব বললেন, "মিঃ রায়, আপনি একটু বিশ্রাম করুন; কিছু সরকারী কাজ বাকি আছে, আমি সেরে নিই। বড় জোর ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"বেশ আপনি কাজ করুন, আমার চারদিকটা একটু ঘুরে দেখি।"

"কিন্তু মশায়, "খুব দূরে যাবেন না, পথ ভুল হলে বিপদে পড়বেন।"

"না না, দূরে যাব কেন, তা ছাড়া তিনটের মধ্যেই ফিরব।"

"নিশ্চয়, অন্ধকার হইলেই বাঘভালুক বের হয়।"

"ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।"

"ওকি, আবার ঝোলা কাঁধে করেন কেন?"

আমি হেসে বললাম, "দুর্লভ ফুলের নমুনা সংগ্রহ করবার এক বাতিক আছে আমার, যন্ত্রপাতি আছে ঝুলিতে।"

"আচ্ছা আসুন, দুর্লভ ফুলের অভাব হবে না, কিন্তু খুব সাবধান।"

মোটরের চওড়া পথ ছেড়ে পায়ে চলা শুঁড়ি-পথ দিয়ে নামবার চেষ্টা করছি, হাতে আছে একটা লাঠি।

এমন সময়ে বুধন সিং সেলাম করে দাঁড়াল। বুধন সিং বাংলোর রক্ষক।

"কি ধার যা রহে হেঁ সাহাব?"

আমার আবার রাষ্ট্রভাষা ভাল আসে না, যাই হোক তবু যতটুকু পারি গুছিয়ে বললাম, "ঘুম্‌নে কো।"

"ঘুম্‌নে কো লায়েক জায়গা হ্যায় খাস, লেকিন উধার মৎ যাইয়ে হুজুর।"

বলে সে একটা দিক দেখিয়ে দিল। আর দশটা জায়গা থেকে কোন প্রভেদ বুঝলাম না।

কেন নিষেধ করছে, বাঘভালুক আছে না আর কিছু হবে, আর-কিছু হবেই বা-কী, এ-সব সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা প্রকাশ করবার মত রাষ্ট্রভাষার পুঁজি আমার নেই, কাজেই সংক্ষেপে বললাম, "ঠিক হ্যায়, উধার নেহি যায়গা!"

শুঁড়ি-পথ দিয়ে সাবধানে নামছি, কখনো গাছের ডাল ধরে. কখনো লাঠিতে ভর দিয়ে, কিন্তু মনটার মধ্যে বুধন সিং এর নিষেধ-বাক্য পাক খেয়ে মরছে. 'উধার মৎ যাইয়ে সাহেব'।

প্রত্যেকটি শাল গাছ জাহাজের মাস্তুল হবার যোগ্য, বনস্পতি একেই বলে। মাটি থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে কাণ্ডের গায়ে কোথাও শাখাপ্রশাখা নেই, সরল সমান্তরাল বলিচিহ্নগুলোতে বহু বর্ষার, বহু বর্ষণের শ্যামলতা। এমন শত শত হাজার হাজার বনস্পতি। বনের বারো আনাই শাল। তাছাড়া আছে পিয়াশাল কেঁদ, মহুয়া, অর্জুন, আর আছে দুর্ভেদ্য পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়। সব কাঁধে কাঁধে মিলে এমন ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক স্থানেই রোদ মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, সব একটানা ছায়া, ভেজা স্যাঁতসেঁতে। সব সুদ্ধ মিলে সরীসৃপের শীতস্পর্শ সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে রোদের কুচি সেই

সরীসৃপের গায়েরই রঙ বাহার। কিছুক্ষণ এসব জায়গায় থাকবার পরেই অতলে তলিয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি জন্মায়, যেন ঐ আদিম অতিকায় সরীসৃপটার জঠরে তলিয়ে গেছি, মনে হয় যে, বিশ্বজগৎ নেই, কিন্তু আমি তবু আছি।

এ-সব বনের মস্ত একটা সুবিধা যে, তলাটা বেশ পরিষ্কার, যেদিকে খুশি যাওয়া যায়। যাচ্ছিও তাই। ইতিমধ্যেই ফুলের নমুনায় কাঁধের থলিটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। যত ফুল তত প্রজাপতি। সমস্তই অজ্ঞাত, অপরিচিত; উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এদের খবর রাখে না। এত রঙও আছে ফুলের, এত ঢঙও আছে প্রজাপতির পাখার। আর যখন দুয়ে মেলে;—মরি মরি, হেন কবি নেই, হেন চিত্রী নেই, যাদের তুলি-কলম সে-সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে। কখনো ফুলগুলোকে মনে হয় প্রজাপতির ঝাঁক, কখনো প্রজাপতির ঝাঁককে মনে হয় ফুলের স্তবক। ফুল তুলছি তো তুলছিই, বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই, মনের সাধ আর মেটে না। বেলা অনেকটা গড়িয়েছে, শরীর যে পরিশ্রান্ত হয়েছে তা প্রথম জানিয়ে দিল আমার পা দুটো, হঠাৎ তারা অবস্থান-ধর্মঘট ঘোষণা করল। অগত্যা একখানা কালো পাথরের উপরে একটা শাল গাছের তলায় বসতে বাধ্য হলাম। সম্মুখে একটা আগাছার শাখায় একটা অজানা ফুলের উপরে বসে অজানা একটা মস্ত প্রজাপতি দোল খাচ্ছে। ফুলটা তুলবার ইচ্ছা হলেও উঠিবার শক্তি আর হল না। চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মনটা হঠাৎ দোল খেয়ে উঠল ঐ প্রজাপতির মত অতীতকালের দীর্ঘশ্বাসে। আর ফুলটা? ফুলও ছিল।

আজকে আমি বিহারের এক গ্রাম্য ইস্কুলের মাস্টার। কিন্তু এ-পরিণাম কি দশ বছর আগেও কেউ কল্পনা করেছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সব পরীক্ষাগুলো পাকা ঘোড়ার মত যখন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শত্রু মিত্র, আত্মীয়-পর সকলেই কল্পনা করেছিল যে, সিভিল সার্ভিসের নিরাপদ আস্তাবলে আমার যাত্রার স্পৃহণীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে। ঘটতও তাই। এমন সময়ে ভাগ্যের শনিগ্রহের মত আমার অদৃষ্টাকাশে উদিত হল সুতপা। তার শাড়ির রাঙা পাড়ের রক্তবেষ্টনী, তার খোঁপার রক্তকরবীর বঙ্কিম ঈক্ষণ, তার লজ্জারুণ কপোলের ভাব-বলাকাবিলাস, তার রক্ত-অধরপুটে চুম্বনের অর্ধস্ফুট কুঁড়িটি, সব মিলে কি বলব, আমি তো কবি নই, কাজেই কবির কথা ধার করে নিয়ে প্রকাশ করি—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তাহার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

সর্বনাশ বটে! রইল পড়ে আমার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া, রইল পড়ে আমার সিভিলিয়ান স্বর্গ, রইল পড়ে আমার ভবিষ্যৎ। আমার একমাত্র তপস্যা হল সুতপার প্রসন্নতা অর্জন।

সুতপার মন আমার উপর প্রসন্ন ছিল না, একথা বলে তার ও আমার প্রতি অবিচার করতে চাইনে। হয়তো সেই প্রসন্নতার পূর্বরাগ পরিণয়ের ভাস্বরতায় একদিন পরিণত হত। কিন্তু সংসারটা এমন কত 'হলে-হতে-পারত' ছিন্ন সুতো দিয়েই না সেলাই করা। অভিজ্ঞতার অর্থ ই হচ্ছে আশার সীমাস্তোপলব্ধি। তারপরে একদিন বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে সুতপার বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র। আমিও সেদিন রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জারের বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে রওনা হয়ে এলাম এখন যেখানে ইস্কুল মাস্টারি করছি সেখানে।

আবার একদিন শত্রু-মিত্র আত্মীয়-পর অবাক হয়ে গেল, বলল, ছেলেটার ভবিষ্যৎ ছিল, কিন্তু নিজের দোষে তা খোয়ালে। আসল ব্যাপার জানল না। তাই কেউ বলল, ছোকরাকে মার্কসিজমের ভূতে পেয়েছে, চলল গণদেবতার সেবা করতে। কেউ বলল, গান্ধী গান্ধী করেই গোল্লায় গেল, গেল গাঁওমে সেবা করতে, তাও কিনা আবার বিহারী ভূতদের গাঁও। সবাই জানে তারা অভ্রান্ত। এমনি করেই মানুষের বিচার হয়।

* * * *

সুতপা বলল, "ঐ ফুলটা কি সুন্দর!"

"বেশ তো দেখো না কাছে গিয়ে।" কাছে যেতেই প্রজাপতিটা উড়ে গেল। সে অপ্রতিভ, আমি হেসে উঠলাম।

রাগের ও লজ্জার রাঙা পাড়টানা কালো দৃষ্টির গোটা দুই প্রজাপতি নিক্ষেপ করে সুতপা বলল, "তুমি ভারি দুষ্টু।"

"কেন, প্রজাপতিকে ফুল করতে পারিনি বলে? তা স্বীকার করছি, করছি, ও-কাজ আমার অসাধ্য।"

"আগে বলনি কেন?"

"বলবার আর সময় দিলে কই?"

"এমন বোকা বনলাম!"

"যা গোড়া থেকেই আছ, তা নতুন করে আর বনবে কীভাবে।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা অসম্ভব।"

"শোনো রাগ করোনা, আমার কী মনে হয় জানো? ঐ প্রজাপতিগুলোও ফুল, কেবল ওদের গাছ গিয়েছে হারিয়ে, আর ওরা তাই কেবলই খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।"

"যেমন তুমি! গাছ খুঁজে পেলে কি?"

"গাছ কী বলে জানিনে, আমার মন তো বলছে পেয়েছি।"

"আর ঐ ফুলগুলো প্রজাপতি নয়?"

"হাঁ, গাছ পেয়ে গিয়েছে বলে আর উড়তে চাইছে না।"

"যদি ভুল গাছ হয়?"

"সংসারে অনেক সময় ভুলকেও সয়ে নিতে হয়, মানুষ তো ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়।"

"ইস্, আমি হলে ভুলের বোঁটা ছিড়ে উধাও হয়ে যেতাম।"

* * * *

এসব অনেকদিন আগেকার কথাবার্তা। কার্যত দেখা গেল আমার কথাই ঠিক, ভুলকেই সয়ে নিল সুতপা, বোঁটা ছিঁড়ে উধাও হয়ে গেল না। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, শেষ পর্যন্ত বোঁটার বাঁধন তার পক্ষে ভুল হয়নি। ঐ কথাটা ভাবতে আমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগে বটে, কিন্তু আত্মসম্ভ্রম তো তারও আছে, ভুল হলেই বা স্বীকার করবে কেন সে!

একি, এ যে ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে! ঘড়িতে মাত্র চারটা, কিন্তু এ যে সন্ধ্যার ছায়া! শ্রীবাস্তব তো বলেই দিয়েছিলেন যে এখানে পাঁচটায় 'বাঘ-ভালুক-বেরনো' সন্ধ্যা নামে। ইস, অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সুতপার কথায় আমার কালজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।

লাঠি ও থলি নিয়ে উঠে পড়লাম আর দ্রুত চলতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা চলবার পরে হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা অতিকায় বনস্পতি কদম গাছ দেখে! কই যাওয়ার সময়ে তো এটাকে দেখিনি! তবে কি পথ ভুল হল! গহন বনের মধ্যে একবার ঐ ধারণা মাথায় জন্মালেই সর্বনাশ! লিভিংস্টোন, স্ট্যানলিরও পথ ভুল হবেই।

একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সম্মুখে, একবার পিছনে চলতে চলতে যখন একটা মুখর ঝরনার ধারে এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ও পথভ্রান্তি দুইকেই স্বীকার কার নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুঝলাম আজ সম্মুখে সর্বনাশ ও রাত্রি!

পথ যখন হারিয়েছি তখন সামনে পিছনে দুই-ই সমান। কাজেই ঝরনাটা পার হলাম। ঝরনা পার হতেই একটি নাতিবৃহৎ উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। চারিদিক উঁচু-নিচু পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর ঐ ঝরনার নিত্যধ্বনিত হুড়হুড় দুড়দুড় শব্দ যেন উপত্যকার একটিমাত্র দরজায় নিরন্তর হুড়কো টেনে দিচ্ছে। উপত্যকাটায় ঢুকতেই সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল, গাঁয়ে কাঁটা দিল। এ-কয় বছর এ-অঞ্চলে বনে পাহাড়ে আমি কম ঘুরিনি, মাঝে মাঝে পথ হারাতেও হয়েছে, কিন্তু ঠিক এ-রকম অকারণ ভীতির অনুভূতি এই প্রথম। তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এসেছে, চরাচরের অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ ঝরনার কলধ্বনি যেন শিকল নামিয়ে দিয়ে তল মাপবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, সন্ধ্যার সময়েই বাঘ-ভালুক-হাতি বের হয় জল পান করতে, যাবে তারা ঐ ঝরনায়। পার হবার সময়ে ওর ধারে এক জায়গায় সহস্র নখের আর পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল। ভাবলাম রাতটা একটা গাছে উঠে কাটাতে হবে। এমন অভিজ্ঞতা একেবারে নূতন নয়। আগে দু'একবার বনের মধ্যে গাছে চড়ে রাত কাটিয়েছি। একটা শক্ত উঁচু গাছের সন্ধানে চোখ যখন ব্যস্ত, দেখতে পেলাম অদূরে উঁচু একটা বস্তু। কাছে গিয়ে দেখি, অভাবিত সৌভাগ্য। কাঠের মোটা মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, প্রাচীরও কাঠের, ছাদও তাই। এ-রকম বন্য ঘর আমার পরিচিত। বড় বড় কাঠের ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে তৈরি করে রাখে, পথ হারিয়ে গেলে বা মধ্যপথে রাত হয়ে গেলে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে। মনটা খুশী হল, যাক্, রাত্রিটা আর গাছে চড়ে কাটাতে হবে না। থলিতে টর্চ ছিল, বন ভ্রমণের কালে সর্বদাই একটা টর্চ আমার সঙ্গে থাকে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরটা দেখলাম। আর-দশটা বন্য ঘরের মতই, তবে দীর্ঘকাল যে এখানে কেউ রাত্রিযাপন করেছে তা মনে হল না! ভিতরে ঢুকে পড়লাম, খানকতক তক্তা সাজানো, বসে শুয়ে রাত্রি কাটানো যায়, দরজার ফাঁকটা বন্ধ করবার জন্যে কাছেই পড়ে রয়েছে আর খানকতক ছোট বড় কাঠের টুকরো। আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে দরজার ফাঁকটা যথাসম্ভব বন্ধ করে দিলাম,

কাঠের টুকরো সাজিয়ে। সবটা বন্ধ হল না, উপরে আধহাত খানেক ফাঁক রইল, ভিতরে কাঠের তক্তার উপরে বসলে বাইরের দৃশ্য বেশ চোখে পড়ে। শীতকাল, তাই সাপখোপের ভয় ছিল না। ভাবলাম রাতটা নিরাপদে কাটবে।

শক্ত নিরাবরণ কাঠের তক্তার উপরে বসলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে করলাম গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিতে যেন বসে আছি। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের তরল অন্ধকার, অরণ্য ও পাহাড়ের জমাট অন্ধকার, গোটা দুই তারার ফুটকি চোখে পড়েছে, তবে এ রেলগাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, এই যা প্রভেদ।

একটু স্থির হয়ে বসতেই নিজের অবস্থা মনে পড়ল, আর রাগ হল নিজের উপরেই। কী দরকার ছিল থলকোবাঁদ বাংলোয় আসবার, কী দরকার ছিল বাংলো থেকে একাকী বের হবার। শ্রীবাস্তব না জানি কত ভাবছে, আর বুধন সিং তো স্পষ্টই নিষেধ করেছিল। কিন্তু এই উপত্যকাটাই কি তার উদ্দিষ্ট—'উধার'? উপত্যকায় ঢুকতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, মনে পড়ল, মনে পড়ায় আবার গা ছম ছম ক'রে উঠল।

গহন অরণ্যে একাকী রাত যে না কাটিয়েছে তাকে সে-অভিজ্ঞতা বোঝানো যাবে না। দিনের বেলায় যে-বন নিস্তব্ধ, রাতে সেখানে যে কত রকম শব্দ ওঠে, দিনের বেলায় যে-বন নির্জন, রাতে সেখানে যে কী ঠাসাঠাসি, এ-সব রহস্য বলে বোঝাবার নয়। একবার বাইরে টর্চের আলো ফেললাম. অনন্ত কালোর পর্দা একটুখানি ফাঁক হল। বেবাক শূন্য, ধারে কাছে কোথাও গাছপালা নেই। শূন্যতা যে কত গুরুভার, এই রকম স্থানে এই রকম সময়ে বুঝতে পারা যায়।

* * * * *

"সুতপা, আজ তোমার ঠোঁট দু'খানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

"বাঃ, দোষ করলে তুমি, আর রাগ আমার উপরে।"

"বাঃ রে, আমি কোথায় দোষ করলাম!"

"ঠিক তুমি নও, তোমার ঠোঁট দুটি। ও একই কথা।"

"তারই বা কী দোষ?"

"নইলে অমন সুন্দর দেখাতে গেল কেন?"

"তাতে দোষটা কিসের শুনি।"

"অপরকে প্রলুব্ধ করছে, abetment, আইনে সেটাও দণ্ডনীয়।"

"তোমার যত বাজে কথা।"

"ঠিক, সে-দোষ স্বীকার করছি, এবারে কাজ নামা যাক্।"

হঠাৎ আমার মুখ নত হয়ে পড়ল তার ঈষদুন্নত অধরোষ্ঠের দিকে।

অর্ধস্ফুট গোলাপের কুঁড়িটা যখন উচ্ছিন্ন হবে, ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে দু'জন দু'দিকে ছিটকে সরে গেলাম। ফিটন গাড়িখানা পাথরে হুঁচোট খেয়েছে। নলের রাজহংস দময়ন্তীর কাছে এসেই ফিরে গেল, হল না হাতে পত্র সমর্পণ। দময়ন্তীর মুখমণ্ডলে একসঙ্গে পরপর আশাভঙ্গ, উল্লাস, নৈরাশ্য, আত্মধিক্কার প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের সা রে গা মা গেল খেলে।

"নাঃ, তোমাকে আর বিশ্বাস নেই, গাড়িতে কি করতে কী করে বসবে।"

"এসো তবে গাড়ি বাঁধি।"

সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

* * * *

এমন সময়ে বিকট একটা গর্জন উঠল। অনভিজ্ঞে শুনলে ভাববে গাধা ডাকছে! যা ডাকছে তা হচ্ছে বুনো হাতি এবং তা অদূরেই। আর ওরা যে দল বেঁধে ছাড়া নড়ে না, একথা কে না জানে। ওরা চলেছে ঝরনায় জলপান করতে।

হাতির ডাক থেমে যেতেই বন আবার দ্বিগুণ নির্জন হল, শোনা গেল টুং টুং ধ্বনি, গোরুর গলার ঘণ্টায় যেমন আওয়াজ ওঠে। ও এক রকম পাহাড়ী পাখি ডাকছে।

ক্রমে সারা দিনের ক্লান্তিতে ঘুম পেতে লাগল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরায় যেমন অনেকবার ঘুমিয়েছি।

* * * *

অচেনা গাছ অচেনা ফুল। গাছটি সুন্দর, কিন্তু ফলের বোধকরি তুলনা হয় না। অর্ধবিকশিত ফুলটির অর্ধোন্মোচিত পাঁপড়িগুলোর কী রঙ, কী ভঙ্গিমা, আর মৃদু সূক্ষ্ম সুগন্ধই বা কত। সুস্ফুট ফুলে মহিমা আছে, কুঁড়িতে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু অর্ধস্ফুট ফুলের রহস্য হার মানিয়েছে আর সবকিছুকে। যতই হাত বাড়াই ফুলটি সরে যায়, বাতাসের এ কেমন লীলা। আর এমনতর মেজাজী ফুলও তো দেখিনি। একটু বেশী চেষ্টা করে যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি—

"গাড়ির মধ্যে এসব কী হচ্ছে ?"

"তুমি আবার ফুল সেজেছিলে কেন ?"

"ফুল সেজেছিলাম ? সে আবার কী !"

"মনে হচ্ছিল, তুমি একটা গাছ হয়ে গিয়েছ, আর তোমার ঠোঁটে ফুটে রয়েছে একটা অচেনা সুন্দর ফুল।"

"একটা কথা সত্যি করে বলবে ? আমাকে সত্যিই কি খুব সুন্দর লাগে তোমার ?"

দুই ফুসফুসে এক আকাশ বাতাস টেনে নিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "সুন্দর, সুন্দর, তুমি অপূর্ব সুন্দর !"

সেই প্রচণ্ড চেষ্টায় ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম কাঠের আসনের উপরে। চিৎকার বোধহয় সত্যিই করেছিলাম, প্রতিধ্বনির শেষ রেশটুকু তখনো মিলিয়ে যায়নি, সমস্ত অরণ্য বোধ করি চকিত চমকিত হয়ে উঠেছিল অতৃপ্ত প্রণয়ীর ব্যর্থ কামনার নিষ্ফল উল্লাসের অদম্য ক্রন্দনে। বুকের মধ্যে একটা দুর্দম জ্বালা, দুর্মদ ক্ষুধা, দুস্তর আকাঙ্খা তোলপাড় করতে লাগল। মনে হল, আমার আত্মার সেই অসহ্য উত্তাপে চরাচর সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই ব্যর্থ বাসনার দুর্বার বহ্নি তীক্ষ্ণ সূচীমুখে সমস্ত অরণ্যকে বিদ্ধ করছে আর আমার অন্তর থেকে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-জ্বালা নিষ্কাশিত হয়ে সমগ্র আকাশটাকে ভিতরে ভিতরে তাতিয়ে তুলেছে। যে অরণ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর যে অরণ্যে জেগে উঠলাম, এ দুই যেন ভিন্ন স্থান।

আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। কেবল দশটা। মনটা দমে গেল। এখনো অন্তত আট ঘণ্টা এই গুমটিতে চুপ করে বসে থাকতে হবে।

একটা সিগারেট ধরালাম। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই উঠে দাঁড়ালাম, আর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। আর দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। এটা কী হল ? আবার ভাল করে তাকালাম। সত্যিই তো, এ কী, এ কেমন হল ? সমুখের মাঠ ফাঁকা ছিল, এখন গাছপালায় একেবারে ভর্তি। ব্যাপার কী ? বাইরে টর্চের ছটা ফেললাম। না, সমস্ত ঠিক আছে, মাঠ ফাঁকা, আমার চোখেরই ভুল। কিন্তু যেমনি আলো নিভিয়েছি অমনি মুহূর্তে সমস্ত মাঠখানা ঠাসাঠাসি ভর্তি হয়ে গেল গাছপালায়। আবার আলো ফেললাম, না, মাঠ ফাঁকা। আলো নিভোতেই মাঠ উঠল ভরে। এ যেন আমার সঙ্গে আর

বনের অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা। লোকালয়ে বসে এ-কাহিনী পড়লে কি মনে হবে জানি না, কিন্তু সেই আদিম অরণ্যের কোলে আদিম অন্ধকারে একাকী বসে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সেই মাঘ মাসের শীতেও আমার কপালে ঘাম দিল।

ভাবলাম পড়ে মরুকগে, মাঠের মত মাঠ থাকুক, আমার চিন্তার কারণ কী, আমি তো আছি ঘরের মধ্যে। এমন সময়ে আর-এক কাণ্ড ঘটল। ঐ গাছপালাগুলোর মধ্যে ঝড় উঠল। ডালপালার এমন মাতামাতি, গাছপালার এমন লুটোপুটি আর কখনো দেখিনি, অথচ চরাচর নিঃশব্দ। চারিদিক এমন নিস্তব্ধ যে হাতঘড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভাবলাম, ঝড় এখনি ঘরটার উপরে এসে পড়বে। কিন্তু ঘরটার কাছেও এল না! আলোর ছটা ফেললাম। কোথায় বা ঝড়, কোথায় বা গাছপালা, ফাঁকা মাঠ নীরব, নিস্তব্ধ, অন্ধকার! আলো নিভতেই আবার ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বাললাম, তার শিখাটি এতটুকু কম্পিত হল না, অথচ দশ গজ দূরেই মহাপ্রলয় চলছে। এবারে আতঙ্ক শুরু হল। জীবনে কখনো না কখনো সকলেই ভয় পেয়েছে, কিন্তু এ-আতঙ্কের প্রকৃতি বোঝাতে পারব না। একবার মনে হল বুধন সিং "ওদিকে" যেতে নিষেধ করেছিল, আমি কি তবে পথ ভুলে তার নিষিদ্ধ "ওদিকে" এসে পড়েছি? অবশ্য কেন নিষেধ করেছিল তা বলেনি। আবার মনে পড়ল, এ-অঞ্চলের কোন কোন লোকের মুখে শুনেছি যে, বনের মধ্যে এক আধটা জায়গা আছে ভারী "খারাপ।" প্রথমে ভাবতাম জন্তু-জানোয়ারের ভয়ের জন্যই "খারাপ"। একবার এক বুড়োকে চেপে ধরায় সে বলেছিল যে, এই সব জায়গায় নানারকম "অদ্ভুত" কাণ্ড ঘটে। কী 'অদ্ভুত" সে বলতে পারল না। এখন মনে হল সে জানত, কেবল ইচ্ছে করেই বলেনি। ভাবলাম বাইরে যা খুশি ঘটুক, আমার ঘরটির উপরে যতক্ষণ না হামলা হচ্ছে, আমার ক্ষতি কি? তারপরে ভাবলাম বাইরের দিকে আর তাকাব না, তা হলেই ভয়ের কারণ কেটে যাবে। কিন্তু তাও কি কখন সম্ভব? কৌতূহল ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারতে লাগল, ভয় পাব জেনেও তাকাতে বাধ্য হলাম। সেই ঝড়, সেই মাতামাতি, কিন্তু আমার উপরে কোন প্রভাব নেই। যেন ছবির ঝড়, ছবির মাতামাতি। যেন ঐ ভূখণ্ড আর আমার কুটির ভিন্ন জগতের বস্তু। দুয়ের ভাষা ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে চলাচলের পথ বন্ধ—তাই ওর প্রভাব

এখানে এসে পৌছচ্ছে না। এ সব কথা ঠিক তখন মনে হয়েছিল, না পরে মনে হয়েছে, এখন বলতে পারব না, কারণ তখন যে-দৃশ্য দেখেছিলাম এক ঝাপসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে, এখন তা আরো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

এবারে মনে হল হঠাৎ উপত্যকাখানা নানা প্রাণীর চলাফেরায় সচল হয়ে উঠেছে। তবে কি বাঘ-ভালুক বের হল নাকি! ঐ সব শ্বাপদের সম্ভাবনায় সাধারণত মানুষের মন খুশী হয় না সত্য, আমি কেমন যেন হাল্কা বোধ করলাম। মনে হল, ওরা যতই ভয়ঙ্কর জীব হোক না, তবু ওরা আমার মতই রক্ত-মাংসের জীব, ওরা পার্থিব, ওরা যে আমার আপন জন! এই অপার্থিব, বিভীষিকার চেয়ে ওরা ঢের বেশী কাম্য। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম যে, আজ অদৃষ্ট এমনি অকরুণ যে, সে সান্ত্বনাটুকুও আমার ভাগ্যে নেই। ওরা তো বাঘ-ভালুক নয়! তার চেয়ে আকারে অনেক বৃহৎ। হাতি! না, হাতিও নয়, কারণ এদের আকৃতি কোন প্রাণীর সঙ্গে মেলে না। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় যে-সব জন্তুর ছবি বইয়ে দেখা যায়, এরা যেন সেই সব বিস্মৃত জগতের বিচিত্র জন্তু। কিন্তু ঐ ঝড়ের মত এরাও নীরব। ঐ নিঃশব্দ ঝড়ের লুটোপুটির মধ্যে এরা নিঃশব্দে ছুটোছুটি করতে লাগল। আলোর ছটা ফেলে যে পরীক্ষা করব, সে শক্তিও আর ছিল না। মনটা তখনো সম্পূর্ণ বিকল হয়নি। একবার মনে হল, সবটাই তো একটা দুঃস্বপ্ন নয়! তা কী করে হবে! এই তো জেগে আছি, চোখে পলক পড়েছে, হাতে সিগারেট! না, স্বপ্ন নয়।

মনে হল কোন রুদ্ধ কারাগারের লোহার দরজা খুলে গেছে, আর অতল নিতল থেকে উঠে আসছে দলে দলে সেই সব চিন্তা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষার অর্ধ সমাপ্ত অস্পষ্ট মূর্তি জাগ্রত চৈতন্য যাদের পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার সুযোগ পায়নি।

এমন সময় মনে হল, উপরের ঐ বিরাট কালো আকাশখানা কুমোরের প্রকাণ্ড চাকের মত হঠাৎ বোঁ ক'রে একবার ঘুরে উঠল, আর তারপরেই ঘুরতে ঘুরতে ভীম বেগে নীচে নামতে লাগল, দিগন্তের অস্পষ্ট পাহাড়গুলো তরঙ্গিত হতে লাগল, আর মাঝখানের ঐ উপত্যকায় অলৌকিক ঝড়ের জানোয়ারের মাতামাতি তো চলেইছে। আর সমস্ত কিছুকে চরম ভয়াবহতার শেষ সীমায় পৌছে দিয়েছে অপার্থিব একটা নিঃশব্দতা। মহামেরুর, মহাশূন্যের বা মৃত্যুর পরের নিঃশব্দতা হয়তো এই রকম।

এমন সময়ে একটা আর্ত কাতর বেদনার বহ্নিময় চীৎকার কোন্ অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার মনের মধ্যে আমূল নিহিত হল। জাগ্রত অবস্থায়ও

নানা স্বর আছে, সেই প্রচণ্ড সংঘাতে আমি যেন জাগরণের সৌধচূড়া থেকে একেবারে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলাম! এ কার চীৎকার? নারীকণ্ঠ? কোথায়? এখানে? কে? অনেকগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে ছুটে চলে গেল ঝড়ের মুখে বিপন্ন হাঁসের সারির মত। তাদের পক্ষ-বিধুনন ভাল করে না মিলোতেই সেই অপার্থিব ভূখণ্ডের কোন্ নেপথ্য থেকে ছুটে চলে এল ব্যাঘ্রভয়ভীতা বিপন্না হরিণীর মত ধাবমানা এক নারীমূর্তি। সেই নিঃশব্দের জগতে তার কাতর কণ্ঠ যেন শব্দের বিদ্যুৎ, সেই অপার্থিব কালোর মধ্যে বিস্রস্তবসন তার শুভ্র কমনীয় তনু ঝড়ের বেগে চালিত অসম্পূর্ণ একটি চন্দ্রকলা। আবার আর্তকণ্ঠস্বর। ওগো, এ কণ্ঠস্বর আমার জন্ম-জন্মান্তর জানে, এ-কণ্ঠস্বরে আমি সহস্র মৃত্যুর সমাধি থেকে জেগে উঠব, ঐ রমণীয়, কমণীয়, স্পৃহণীয় তনু লক্ষ জনতার মধ্যেও আমি চিনে নিতে ভুল করব না। এ যে সুতপা। ঐ আর্ত কণ্ঠের অগ্নিময় স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে পূর্ণ সম্বিতে ফিরে এলাম। সুতপা! সুতপা!

দরজার তক্তাগুলো খুলে ফেলবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখলাম অতিকায় এক মনুষ্যমূর্তি—দুর্ভাগ্যের মত তাড়া করে আসছে। তবে ওরই কাছ কাছ থেকে পালাচ্ছে সুতপা।

দরজার তক্তাগুলো সরানো হয়ে গিয়েছিল, ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। সুতপা! সুতপা!

ঐ যে দূরে ছুটে চলেছে সে জ্যোৎস্নালেখার মত, ঐ যে পিছনে ছুটে চলেছে অতিকায় মূর্তি রাহুটার মত। আর সবার পিছনে, অনেক পিছনে আমি।

প্রাণপণে ছুটছি, খানাখন্দ, উঁচুনিচু, পাথর, ঢিবি ডিঙিয়ে, তবু ধরতে পারি কই। ঐ অতিকায় দানবটাকে ধরতে পারলেই বা কী করতে পারতাম। কিন্তু সে কথা কি তখন ভেবেছিলাম। আর কিছু না পারি, নিজের দেহ দিয়ে ওর পথরোধ করে পড়ে থাকব, সুতপা সময় পাবে পালাবার। দৌড়, দৌড়, আরো জোরে, আরো, আরো। এক-একবার কাছে এসে পড়ি দানবটার, দেখতে পাই ওর উলঙ্গ, বীভৎস, রোমশ দেহ, আবার যায় এগিয়ে। লোকটা সচেতন হয়ে উঠেছে যে, আমি পিছনে তাড়া করেছি। হঠাৎ এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সে ধরে ফেলল সুতপার কোমর, আর অনায়াসে তাকে শূন্যে তুলে নিল। তারপরে আর এক লাফে অন্তর্হিত হল এক ঝোপের আড়ালে। আমিও প্রাণপণে গতি বাড়িয়ে দিয়ে যখন পৌঁছলাম সেখানে, দেখলাম স্খলিত-

বসনা, সমুদ্রফেনসুকুমারতনু সুতপা মূর্ছিত প্রায়, আর ঐ অতিকায় নর-দানবটা তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে লোকটা মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। সেই বাসনাপঙ্কিল অধরোষ্ঠ, কামনাকুটিল মুখমণ্ডল, সেই লুব্ধলোলুপ রসনা, আর সেই অতি ক্ষুধার্ত, কামার্ত, অন্তর্জ্বালা-দীপ্যমান দুই চক্ষু। আমি চমকে উঠলাম, এ যে আমার মুখ! আয়তনে আমার চেয়ে অনেক বড়, শক্তিতে আমার চেয়ে অনেক প্রবল, কিন্তু এ যে আমারই এক অবিকল প্রতিকৃতি তাতে আর সন্দেহ নেই। মাথা ঘুরে উঠল, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম, কিন্তু তার আগে দেখতে পেলাম ঐ বীভৎস মুখ নত হয়ে পড়ল, সুতপার অধরোষ্ঠের উপরে, আর সবলে ছিন্ন করে নিল অর্ধস্ফুট রক্ত-গোলাপের সেই স্পর্শভীরু কুঁড়িটি।

* * *

যখন জ্ঞান হয়, দেখি ভোরের আলোয় পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীবাস্তব, পাশে বুধন সিং।

পূর্বাপর হঠাৎ স্মরণে এল না; শুধালাম, "এখানে কেমন করে এলাম।"

শ্রীবাস্তব বললেন, "সে-সব পরে হবে, এখন চুপ করে থাকুন।"

শ্রীবাস্তবের আদেশে চাপরাশিরা একখানা স্টেচারের মত বানিয়ে ফেলল, আর আমাকে তার উপরে শুইয়ে দিয়ে সকলে মিলে সযত্নে বহন করে নিয়ে চলল—খলকোবাদ ডাক বাংলোয়।

আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল, আমার মূর্ছার সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগ আছে সুতপার। কিন্তু কী যোগ, কী বিবরণ কিছুই মনে পড়ল না, মনটা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এমন সময় কানে এল, বুধন সিং চাপা গলায় শ্রীবাস্তবকে বলছে, "সাহাব কো ইধার আনা হাম মানা কর দিয়ে থে।"

সেকেন্দর শা-র প্রত্যাবর্তন

দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দার শা পাঞ্জাব বিজয় করিয়া হঠাৎ কেন ভারত ত্যাগ করিলেন, ইতিহাসের এটি একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কোন সমাধান পাওয়া যায় নাই, নানা মুনির নানা মত। মগধরাজ্যের বিক্রমের সংবাদ, মাসিডন হইতে ভারতের দূরত্ব, নব-বিজিত রাজ্যসমূহে বিদ্রোহ, সৈন্য দলের অসন্তোষ প্রভৃতি নানাবিধ কারণ বা সবগুলি একত্রে ঐতিহাসিকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। সেকেন্দার শা-র প্রতিভা, প্রভাব ও বীরত্ব এমন বিরাট ছিল যে, পূর্বোক্ত কারণগুলি সত্য হইলেও তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। সম্প্রতি আফগানিস্থানের একটি গুহাচৈত্য হইতে যে প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে সেকেন্দার শা-র আকস্মিক ভারত ত্যাগের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। লেখক সেকেন্দার শা-র অনুগামী একজন গ্রীক সৈনিক, নাম পেস্কাডস্ এরিওফিস্, অর্থাৎ এরিওফিস্‌র পুত্র পেস্কাডস্। তিনি সেকেন্দার শা-র সহপাঠী ছিলেন, দু'জনেই বিখ্যাত এরিস্টটেলের ছাত্র। পেস্কাডস্ সেকেন্দার শা-র দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ লিখিয়াছিলেন তৎকালীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ এ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, কিছুকাল আগে পাণ্ডুলিপি আকারে তাহা পূর্বোক্ত চৈত্যগুহা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, পেস্কাডসের পাণ্ডুলিপি কিভাবে এই বৌদ্ধগুহায় আসিল। এই পর্যন্ত অনুমান করা চলে যে, সেকেন্দার শা-র সাম্রাজ্যের যে অংশে আফগানিস্থান পড়িয়াছিল, পেস্কাডস্ সেখানে কোন রাজ-কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন; কিংবা এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে, সেকেন্দার শা-র মৃত্যু হইলে আফগানিস্থানে যখন বিদ্রোহ হইল, তখন পেস্কাডস্ অন্যান্য গ্রীক রাজপুরুষগণের সহিত এক গুহায় আশ্রয় লইয়া থাকিবেন। বৌদ্ধগণ গ্রীকবিদ্বেষী ছিল না। খুবই সম্ভব যে, রাজভবন পরিত্যাগ করিবার সময়ে পেস্কাডস্ অতি প্রিয় ডায়ারীখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যাহা হোক, পেস্কাডসের পরিণাম বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ডায়ারীর যাবতীয় বিষয় আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে অংশে সেকেন্দার শা-র ভারত ত্যাগের কৌতূহলজনক কারণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পেস্কাডসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে।*

* পাণ্ডুলিপির ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে আমরা প্রয়োজনীয় অংশের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। স্থানাভাববশতঃ সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব না হইলেও কোথাও মূল লেখকের অনভীষ্ট ভাব আমদানি করি নাই।

২

পেস্কাডস্ লিখিতেছেন—

পাঞ্জাব বিজয় সম্পন্ন হইলে, সম্রাট পূর্বভারত জয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, পাঞ্জাব ও মগধের মধ্যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নাই। তিনি জানিতেন যে, পরীক্ষা হইবে মগধে পৌঁছিয়া; কারণ মগধরাজ যেমন বীর, মগধরাজ্য তেমনি শক্তিশালী। কিন্তু যিনি পারস্য সাম্রাজ্য অবহেলাক্রমে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, মগধরাজ্য যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। নূতন খ্যাতির আশায় নূতন লুণ্ঠনের লোভে সৈন্য ও সেনাপতিগণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। সম্রাট ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামীকল্য প্রাতে অজেয় গ্রীক বাহিনী পূবদিকে যাত্রা করিবে। এমন সময়ে, সেদিন অপরাহ্ণে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে গ্রীক বাহিনীর নূতন বিজয়াভিযান তো বন্ধ হইলই, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে অধ্যায় পরিবর্তনের যে সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহাও অকালে অপ্রত্যাশিত উপসংহারে পৌঁছিল।

সেদিন অপরাহ্ণে সম্রাট যখন সেনাপতিগণসহ শিবিরে বসিয়া আগামী দিনের কর্মসূচী আলোচনা করিতেছিলেন, তখন একজন সেনানী শিবিরে ঢুকিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

সম্রাট শুধাইলেন—কি খবর?

দূত বলিল—সম্রাট একজন বিদেশী ধরা পড়েছে।

বিদেশী? কোন্ দেশী? ভারতীয়?

চেহারায়ও পোষাকে তো মনে হয় না, ভারতীয় তো অনেক দেখেছি।

লোকটা বলে কি?

বুঝ্‌তে পারি না।

ভাষা অজ্ঞাত?

আজ্ঞে না, ভাষা দুর্বোধ্য নয়, ভাবটাই কেমন গোলমেলে!

কি করছিল সে?

গ্রীক বাহিনীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এখন কোথায়?

তাঁবুর বাইরে পাহারাধীন। আদেশ হয়তো নিয়ে আসি।

ক্ষতি কি। নিয়ে এসো।

সেনানী প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে কথিত বিদেশীকে লইয়া সম্রাটের কাছে ফিরিয়া আসিল।

সম্রাট ও সেনাপতিগণ দেখিল যে, বিদেশী যতদূর সম্ভব কৃশ, নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ। পরনে মূল্যবান রঙিন পট্টবাস; সম্মুখে অকারণ একটা কুঞ্চিত অংশ মাটি পর্যন্ত দোদুল্যমান; গায়ে চিত্র-বিচিত্র রঙিন আঙরাখা, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা; কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণহার, কানে কুণ্ডল, অনাবৃত মস্তকে কেশদাম তরঙ্গিত, কোটরগত চক্ষুতে এক সঙ্গে ভীতি, চাতুরী ও কৌতুহল; নাসাগ্র আত্মম্ভরিতায় উদ্ধত; সূক্ষ্ম চিবুকে চারিত্রিক দৃঢ়তার ও মানসিক স্থিরতার অভাব; অসমান দন্তপঙ্‌ক্তি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; জীর্ণ তম্বুরার মতো দীর্ঘ ও মলিন কণ্ঠে অনেকগুলি শিরা-উপশিরা দৃশ্যমান; আর দেহটি বাতাহত গুবাকতরুর মতো সর্বদা যেন কম্পিত, একদণ্ড স্থির হইয়া থাকে না।

সম্রাট অনেক ভারতীয় দেখিয়াছেন, তাহাদের দেহ ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা সম্রাটের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কখনো এরূপ জীব দেখেন নাই। তিনি যুগপৎ কৌতুহল ও কৌতুক অনুভব করিলেন, ভাবিলেন এ লোকটাও যদি ভারতীয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে ভারত সম্বন্ধে এখনো কিছুই জানা হয় নাই, কি আশ্চর্য এ দেশ! তারপরে তিনি শুধাইলেন—

তোমার নাম কি?

বিদেশী বলিল—গৌড়দাস।

নিবাস?

ভারতের পূর্বাঞ্চলে।

মগধে?

মগধেরও পূর্বে।

আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

এবার বিদেশী বলিল—

'মগধের পূর্বদিকে জাহ্নবীর তীর
গৌড়বাসীরা সেথা রচে সুখনীড়।'

ওকি আবার পদ্য কেন?

আমাদের দেশে গদ্য নাই, আমাদের ধারাপাত, শুভঙ্করী হিসাব-কিতাব সবই পদ্যে। শুনবেন?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।

তাহার পদ্য শুনিয়া হোমার সোফোক্লিসের কাব্যে অভ্যস্ত গ্রীকগণ হাসিয়া উঠিল। জাতীয় পদ্যের অসম্মানে গুবাকতরু আরও ঘন ঘন দুলিতে লাগিল:

সম্রাট বলিলেন, তোমার পদ্য শুনলাম, উত্তম, কিন্তু এবারে সত্য করে বলো তো যুবক এখানে কেন এসেছিলে?

যুবক বলিল—মাইরি আমার, রসিকতা করবার আর জায়গা পাওনি, সত্যি কথা বলি, আর ধরে ঝুলিয়ে দাও।

সত্য কথা না বল্‌লেও ধরে ঝুলিয়ে দিতে পারি।

দিলেই হল। আমার ওজন কত জানো? ঝুলেই থাকব, মাটিতে পড়বার মতো ভারটুকুও নেই শরীরে। মিছে দাড়র অপব্যয় হবে।

তাহার অভদ্রোচিত উত্তরে বিরক্ত হইয়া সেলুকাস বলিয়া উঠিল, যুবক সাবধানে কথা বলো, সম্মুখে সেকেন্দার শা।

এবারে যুবক বদ্ধমুষ্টি নাকের কাছে তুলিল, বলিল, জয় হোক সম্রাটের।

সেলুকাস শুধাইল, ঘুষি তুল্‌লে কেন?

বিস্মিত যুবক বলিল—ঘুষি কোথায়? ওটা অভিবাদনের গৌড়ীয় রীতি।

তারপরে সে বলিল—এতক্ষণ জানতাম না আপনার পরিচয়, তাই কিছু উদ্ধত ব্যবহার করেছি। আমরা আবার শক্তের ভক্ত, নরমের যম কিনা। তোমার মানে! তোমাদের দেশের সকলেই তোমার মত? আজ্ঞে, বেবাক সব।

ভাবিয়ে তুল্‌লে যুবক!

আজ্ঞে, সে কথা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আমরা স্বয়ং বিধাতার শিরঃপীড়া।

এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যুবকের উচ্চারণে কিছু বৈশিষ্ট্য

ছিল, তাহার মুখে যাবতীয় শ, ষ, স-এর উচ্চার 'S' বর্ণটির ধ্বনির মতো।

তোমাদের দেশের নাম কি?

গৌড়, সমতট, পোণ্ড্রবর্ধন, আরও কত কি আছে।

এত নাম, তার মানে অনেক দেশ।

না সম্রাট, দেশ একটাই, নাম ভিন্ন ভিন্ন।

আশ্চর্য! এমন কেন হল?

এমন না হওয়াই অস্বাভাবিক। জাতিবৈর আমাদের প্রধান লক্ষণ। এক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কোন কারণে কলহ বেঁধে উঠলে যারা পরাজিত হয়, তারা দেশের অন্য এক অংশে এসে বসতি স্থাপন করে, আর নূতন নামকরণ করে। এমনি করে নিত্য-নূতন নামের সৃষ্টি হচ্ছে।

কলহ মীমাংসার জন্য দেশে অবশ্য রাজা আছেন।

অবশ্যই আছেন কিন্তু তার ফলে কলহ আরো বেড়ে চলে।

কেন?

কেউ কাউকে রাজগী ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একবার তো মন্ত্রী হবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেন?

ঐ পদের দাবী নিয়ে অর্ধেক লোক মাথা ফাটাফাটি ক'রে মরেছে, বাকি বাকি অর্ধেক ভয়ে পালিয়েছে।

আশ্চর্য তোমাদের দেশ।

যা বলেছেন মাইরি। চলুন না একবার দেখে আসবেন।

যাবো বলেই তো প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন ভাবনা শুরু হয়ে গেল।

কেন?

সে কথা যথাসময়ে হবে। যুবক, তুমি গ্রীক শিবিরে বন্দী রইলে, দুইজন প্রতিহারী থাকবে তোমার গৃহে।

দুইজন প্রতিহারীর বদলে একজন প্রতিহারিণী হয় না? শুনেছি গ্রীক রমণীরা বড় সুন্দরী।

যুবক বিদায় লইলে সেকেন্দার শা আদেশ প্রচার করিলেন যে, পুনরাজ্ঞা পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রহিল। তারপরে তিনি চিন্তান্বিতভাবে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

৩

গ্রীক বাহিনীর মগধযাত্রা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে

সেকেন্দার শা নিজ শিবিরে বসিয়া আছেন, পাশে তাঁহার সুরাসঙ্গিনী এক গ্রীক রমণী। রমণী সুন্দরী। সেকেন্দার শা তাহাকে আদর করিয়া ডাকেন 'হেলেন।' হেলেন পাণ্ডুলিপি পড়িতেছে, সেকেন্দার শা গম্ভীরভাবে শুনিতেছেন। হেলেন পড়িতেছে—"আমাদের পূর্বপুরুষ মহাভেটক বহু যুগ আগে বন্যাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গৌড়-সমতটে আসিয়া আশ্রয় পান। সেই হইতে তিনি সেখানে বসবাস সুরু করেন। কালক্রমে সমস্ত দেশ তাঁহার বংশধরগণে ছাইয়া যায়। আমরা সকলেই সেই মহাভেটকের উত্তর পুরুষ। বিবর্তনের নিয়মানুসারে আমাদের গায়ের ভেড়ার চামড়া ক্রমে মানুষের চামড়ায় পরিণত হইলেও ভেড়ার চামড়ার সহিষ্ণুতা ও স্থূলতা প্রভৃতি গুণ আমাদের চরিত্রগত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এক সময় আমরা মহাভেটকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়া থাকিতাম, এখন আর তাহা করা হয় না সত্য, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এখনো ভেটকাশ্রিত। জম্বু দ্বীপের অন্যান্য জাতি সামান্য মনুষ্য হইতে উদ্ভূত, আমাদের উদ্ভব সেই পৌরাণিক ভেড়া হইতে, তাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব! জম্বু-দ্বীপবাসিগণ আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলেও আমরা নিজেরাই নিজ মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের কিরীট অর্পণ করিয়াছি।"

এই পর্যন্ত পড়িয়া হেলেন হাসিয়া উঠিল, সুরাপাত্রের সঙ্গে সুরাপাত্রের আঘাত লাগিলে যেমন মদির চিক্কণ ধ্বনি ওঠে, তেমনি শব্দ তাহার হাসির।

সেকেন্দার শা মুখ তুলিয়া বলিলেন, হেলেন তোমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছে।

কেন সম্রাট?

ভয়ে!

পৃথিবীজয়ী সেকেন্দার শা'র মুখে এ কথা নতুন বটে।

সত্যই নতুন, তাই বলে মিথ্যা নয়।

কেন?

কেন কি। ওদেশ মগধের পাশেই, মগধ জয় করলে ক্রমে ওদের সংস্পর্শে আসতে হতো, আর ওদের সংস্পর্শে কি দশা হতো বুঝতে পারছ কি?

কার দশা ?

গ্রীক বাহিনীর, গ্রীক সভ্যতার, গ্রীক সংস্কৃতির।

কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

ঐ একটি লোক এ ক'দিনে এখানকার গ্রীক শিবিরে একটা বিপর্যয় বাধিয়ে দিয়েছে। একটা লোকে যদি এমন করতে পারে তবে এক দেশ লোকের প্রভাবে গ্রীক সৈন্যরা কি বর্বর হয়ে উঠত না? কোথায় থাকতো তাদের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতা। তারা আবার গ্রীসে ফিরে গেলে সমস্ত গ্রীসের অবস্থা কী হতো একবার ভেবে দেখো।

হেলেন শুধাইল, সম্রাট কি ইতিমধ্যে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ?

করিনি! প্রতিদিন একবার করে সাক্ষাৎ করেছি। যত তাকে দেখি, যত তার কথা শুনি তত বিস্ময় ও ভীতি বেড়ে চলে।

লোকটি বলে কি ?

যা বলে তা একমাত্র মহাভেটকের উত্তর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

লোকটা আছে কোথায় ?

তাকে পণ্ডিত ও মনস্তত্ত্ববিদগণের নজরবন্দীতে রেখেছি। তার কার্যকলাপ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সমস্ত টুকে নেবার নির্দেশ দিয়েছি, প্রতিদিন সেই পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পেশ করবার নিয়ম। ঐ যে এতক্ষণ মহাভেটক পুরাণ পড়লে সেই পাণ্ডুলিপিরই অংশ।

এমন সময়ে দ্রুতপদে এন্টিগোনাস শিবিরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিল।

কি সংবাদ এন্টিগোনাস ?

ঐ গৌড়দাস নামে লোকটিকে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গিয়েছে।

আবার নূতন কি ঘটলো? সেদিন তো বলেছিলে যে, গ্রীক সৈন্যদের ইক্ষুচর্বণ করতে শেখাচ্ছে।

সেটা ইক্ষুচর্বণ নয় সম্রাট, যদিচ প্রথমে তাই মনে হয়েছিল।

তবে সেটা কি ?

ঐ প্রথাকে নাকি গৌড়ে 'দন্তধাবন' বলে।

গাছ দিয়ে দাঁত ঘষা? ওদের দাঁত খুব শক্ত বুঝতে হবে।

হেলেন বলিল, না হবার কারণ কি! ওরা যে মহাভেটকের বংশ।

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। হেলেন কথায় কথায় হাসে, তাহার হাসি

সম্রাটের বড় প্রিয়। কিন্তু আজ তার হাসি সেকেন্দার শা'কে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

যাক্ এখন সে কি করছে বলো?

আমাদের সৈন্যদের গৌড়ীয় পরিচ্ছদ পরতে শেখাচ্ছে।

অসম্ভব।

গৌড়ে সকলই সম্ভব, সম্রাট।

এতো গ্রীকের মতো কথা নয়।

নয়ই তো। ওটা আমি তার কথারই প্রতিধ্বনি করলাম।

আর কি বলে সে।

বলে যে অনুকরণ-বিদ্যার বলেই গৌড় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, বলে যে সব বিদ্যার সেরা অনুকরণ বিদ্যা, বলে যে গ্রীক সৈন্যগণ গৌড়ের অনুকরণ চর্চা করুক, তবে ভবিষ্যতে একদিন মহাভেটকের মন্ত্রশিষ্য বলে গৌরব লাভ করতে পারবে।

কী সর্বনাশ! গ্রীক সৈন্যগণের মনোভাব কি রকম?

তাদের মন টলমল করছে, বাধা না পেলে ঐদিকে গড়িয়ে পড়বে।

সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন, পিতা জিউস্, রক্ষা করো।

সম্রাটের অনুমতি যদি হয় তবে লোকটাকে নিকেশ করে দি।

তার চেয়ে লোকটাকে একবার নিয়ে এসো।

এন্টিগোনাস বিদায় হইবে এমন সময়ে অদূরস্থিত গ্রীক শিবির হইতে বিপুল সঙ্গীত ধ্বনি উঠিল।

সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

সেকেন্দার শা বলিলেন, এতো হোমারের মহাকাব্য নয়।

এন্টিগোনাস বলিল,—এতো পিণ্ডারের স্তব নয়।

হেলেন বলিল,—এতো সাফোর কাব্য নয়।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তবে কি?

তখনই সকল সন্দেহভঞ্জন করিয়া গানের বাক্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সমস্ত গ্রীক বাহিনী ঐক্যতানে গাহিতেছে।

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।'

হা পিতা জিউস্ বলিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা বসিয়া পড়িলেন। অন্যদের বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

তখন সেকেন্দার শা আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অরাতিনিধন অসি হস্তে লইয়া বলিলেন, চলো দেখি এন্টিগোনাস, একবার দেখি কোথায় সেই নরাধম।

হেলেন মনে মনে বলিল—ভেটকাধম।

সম্রাটকে অনুসরণ করিয়া এন্টিগোনাস সৈন্য শিবিরের দিকে চলিল।

৪

সম্রাটকে দেখিতে পাইয়া সৈন্যগণ গান থামাইল আর এমন ভাব ধারণ করিল যে, গৌড়দাসকে তাহারা কখনো চোখেও দেখে নাই। কিন্তু স্বয়ং গৌড়দাস তো গ্রীক নয়, সে নির্ভীক, সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সানকি থালা বাজাইয়া চলিল—

'কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ
বিশ গণ্ডা হয় কাঠায় প্রমাণ
গণ্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর
ষোল দিয়া পূরে তারে সারা গণ্ডা ধর।'

তাহার অভদ্রতা দর্শনে সেকেন্দার শা গর্জন করিয়া বলিলেন, বর্বর, তোমার মৃত্যুতে ভয় নাই?

গৌড়দাস বলিল,—

'ওহে মৃত্যু মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

কেন বর্বর?

সম্রাট বীর আর নপুংসককে বধ করেন না!

কি করে জানলে?

আগে খবর নিয়েছি মাইরি! গৌড়বাসীর বীরত্ব, মহত্ব, বদান্যতা সমস্তর মূলে সূক্ষ্ম হিসেব থাকে।

তুমি আমার সৈন্যদের কুশিক্ষা দিচ্ছ কোন্ সাহসে?

কুশিক্ষা? প্রাণ জল করে দিলে মাইরি। গৌড়ের ভাষা শিখবে, গৌড়ের গান করবে সেটা হল কিনা কুশিক্ষা? গৌড়বাসী যে পৃথিবীর সব জাতির সেরা।

গ্রীকদের চেয়েও ?

নিশ্চয়।

কি প্রমাণ ?

তোমরা গরু খাও, শূকর খাও।

আর তোমরা কি খাও ?

ব্যাঙের ছাতা।

খাদ্য কি মনুষ্যত্ব নিরূপণের মাপকাঠি ?

নয় কেন ? খাদ্যসারই তো ক্রমে রক্ত মাংসে বুদ্ধিতে পরিণত হয়।

অদ্ভুত তোমার যুক্তি।

অদ্ভুত কিন্তু সত্য। দেখুন না কেন জম্বুদ্বীপের সব জাতির মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ। কেন ? ওরা সব ছাতু খায়, অড়হরকি ডাল খায়, ইয়া মোটা মোটা গেহুম কি চাপাটি খায়, কাঁচা শুপারী খায়, পানের সঙ্গে শুণ্ডী খায়, দহিবড়া খায়, রসন্ খায়, দোসা খায়, শ্রীখণ্ডি খায়, ইমলি খায়! তাই তারা সব হীন, ছোট, বোকা। আর আমরা গৌডবাসীরা শ্রেষ্ঠ—কেন না আমরা খাই বিশুদ্ধ ব্যাঙের ছাতা আর--

আর কি ?

পত্নীর পদাঘাত।

সম্রাট শুধাইলেন, কোনটা বেশি ভাল লাগে ?

গৌডদাস বলিল, এখানে আমার সেই সহধর্মিণী নেই তাই সত্য কথাই বলবো, ব্যাঙের ছাতাই কিছু বেশি মিষ্ট।

(মনে রাখিতে হইবে যুবকের মুখে শ, ষ, স=S)

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর কোন প্রমাণ আছে ?

কত চাই ? অনুকরণপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকলহ, জাতিবৈর, পরজাতিবিদ্বেষ সমস্তই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

তোমরা যখন অন্য দেশে যাও সে দেশের লোকে তোমাদের মারে না!

মারে বই কি। সেটাও আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা প্রমাণ।

কেমন ?

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষাপরায়ণ বলেই তারা মারে ?

তোমরা কি করো ?

সভা করে প্রতিবাদ জানাই।

গ্রীক সৈন্যগণ তোমাদের দেশে গেলে তোমরা কি করবে।

পরাজয় স্বীকার করবো।

লড়াই করবে না?

আরে রামো, লড়াই করে তো অসভ্য বর্বররা। আমাদের পূর্ব পুরুষগণও কখনো লড়েনি, উত্তরপুরুষগণও কখনো লড়বে না।

উত্তরপুরুষের কথা জানলে কি প্রকারে?

মহাভেটক পুরাণের ভবিষ্যৎ খণ্ডে লেখা আছে কি না!

কি লেখা আছে?

ভবিষ্যৎকালে আমাদের দেশে, শ্বেত জাতি, পীত জাতি, রক্ত জাতি প্রভৃতি আসবে, বিনা রণে তারা দেশ অধিকার করবে।

আমরা তোমাদের দেশ অধিকার করলে তোমরা আমাদের সহ্য করবে?

অবস্থা এমন ক'রে তুলবো যে তোমরা আমাদের সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকবে।

তা কিরূপে সম্ভব বুঝিয়ে বলো।

গৌড়দাস সুরু করিল—বেশি বোঝাতে হবে না, দু'চার কথা শুনলেই মাথায় ঘিলু চচ্চড় করতে থাকবে। তোমরা আমাদের দেশ জয় করবে, আমরা লড়াই করিনে কাজেই সহজেই তা পারবে, কিন্তু তারপর?

তারপর ওখানে স্থাপন করবো এক গ্রীক উপনিবেশ, তারা রাখবে তোমাদের চির পদানত ক'রে। তোমরা কি করতে পারো?

কি করতে পারি শুনুন সম্রাট। যে গ্রীক সমাজ ওখানে থাকবে প্রথমে তারা ভুলবে তাদের ভাষা, ভুলবে তাদের কাব্য, ভুলবে তাদের ভাস্কর্য, ভুলবে স্থাপত্য, সঙ্গীত অন্যান্য সব শিল্পকলা। তারপরে তারা ভুলবে সভ্য আচরণ, সভ্য শিক্ষাদীক্ষা, সভ্য ব্যবহার। ক্রমে তারা নিজেদের মধ্যে এ ওকে মারবে কনুইয়ের গুঁতা, এ ওর পা দেবে মাড়িয়ে। এই কিছুক্ষণ আগে যে 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' শুনে সম্রাটের মগজে আগুন জ্বলতে থাকতে থাকবে। আর চূড়ান্ত হবে তখনি ব্যাঙের ছাতা ছাড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। এইভাবে বিজিত গৌড় হবে বিজয়ী।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া গ্রীকগণ বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ!

কেবল হেলেন বলিল, তোমাদের আর একটা প্রিয় খাদ্যের কথা তো বললে না!

কি খাদ্য প্রাণাধিক ?

স্ত্রীর পদাঘাত !

তার চেয়েও আর একটা প্রিয় খাদ্য আছে।

কি ?

পরস্ত্রীর পদাঘাত।

কি যে বলো !

কি বিশ্বাস হল না? চলো মাইরি, ঐ ঝোপটার আড়ালে বসে একটু গল্পগাছা করি।

মরি কি শখ !

এতেই মরি, মরি। তবু তো দেখছি এ দেশে পাটের চাষ নেই।

পাট কি ?

সে এক রকম ফসল। সেই পাট ক্ষেতের আড়ালে আমাদের দেশে যে-নারীর সঙ্গে গল্পগাছা হয় তাকে আমাদের দেশে কি বলে জানো ?

কি বলে ?

পাটরাণী।

ক্ষণিক বিস্ময়'অন্তে সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন, বর্বর, ভদ্রতার সীমা অনেকক্ষণ লঙ্ঘন করেছিস। আজ রাত তুই বন্দী থাকবি, কাল তোর প্রাণদণ্ড হবে।

যুবক বলিয়া উঠিল, সম্রাট, আমাকে বধ করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে ? গৌড়ীয় স্বভাব কি ধ্বংস করতে পারবেন ?

সেকেন্দার শা আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌড়দাস হেলেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—আয় না মাইরি একবার।

হেলেন প্রস্থানে উদ্যত হইলে গৌড়দাস হাত নাড়িয়া বলিল—

টা—টা
দেবো সোনার বাটা,
উঠছে না ওর পাটা
মিছামিছি চাঁটা

সৈন্যগণ তাহার ছড়া শেষ হইতে দিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। সে যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল হেলেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে, অমনি পরমোৎসাহে সে আঙুল কয়টা নাড়িয়া আবার বলিয়া উঠিল—টা-টা।

সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া শেষ রাত্রে সেকেন্দার শা-র একটু ঘুম আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, পরাজিত পারস্য সম্রাট দারিয়ুষ সসৈন্যে আড়াই লক্ষ ইঁদুরে পরিণত হইয়া সেকেন্দার শা-র মগজে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, মাথার খুলি খুঁড়িবার শব্দ উঠিতেছে কুড়, কুড়। ভীত সেকেন্দার শা লাফাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন দুর্ঘটনা সত্য নয়, স্বপ্ন মাত্র! কিন্তু একি তবু কুড় কুড় শব্দ থামে না কেন? প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার আশায় শিবিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—আর বুঝিলেন উহা ইঁদুরের শব্দ নয়, গৌড়দাস কর্তৃক শিক্ষিত সেই মহা গণসঙ্গীত—'কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।'

প্রভাতী কুক্কুট রবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঐ সঙ্গীত তালে তালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—আর বিজয়ী গ্রীক সৈন্যগণ সেই সঙ্গীতের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া সবেগে দন্তধাবন করিতে করিতে দলে দলে পুণ্যতোয়া শতদ্রু নদীতীরে চলিয়াছে।

এই সঙ্গীত শুনিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার শা কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—পিতা জিউস, আমাকে রক্ষা করো, গ্রীক সভ্যতাকে রক্ষা করো।

তখন রাত্রের আর একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িল। অর্ধ জাগরণ ও তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটা অতিকায় ব্যাঙের ছাতা প্রসারিত হইয়া সমগ্র গ্রীস দেশকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহার মনে হইল, এ ব্যাঙের ছাতা আর কিছুই নয় গৌড়ীয় প্রভাব। তিনি ভাবিলেন এ কি সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, গৌড় জয় করিলে শেষ পর্যন্ত গৌড়েরই বিজয় হইবে, গ্রীক সভ্যতা ব্যাঙের ছাতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। গ্রীক সভ্যতা প্রসারের মানসে তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিমিকে গিলিতে পারে এমন তিমিঙ্গিল সম্ভব। না, এ হইতেই পারে না, এভাবে গ্রীক সভ্যতা বিসর্জন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এরিস্টটলের শিষ্য, প্লেটোর প্রশিষ্য, সক্রেটিসের অতিপ্রশিষ্য এ ছাড়া আর কি ভাবিবেন! তিনি স্থির করিলেন যে, দিগ্বিজয় মাথায় থাকুক, এখন ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিতে পারলে বাঁচা যায়।

এমন সময় একজন প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া অভিবাদনান্তে এক-খানি পত্র

তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্র খুলিয়া দেখিলেন হেলেনের হস্তাক্ষর। পত্র পড়িয়া ভয়ে বিস্ময়ে পরিতাপে স্তম্ভিত হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেলুকাস প্রবেশ করিল। সম্রাটকে তদবস্থায় দেখিয়া সে বলিল, সম্রাটকে বিমর্ষ দেখছি কেন?

সেকেন্দার শা বলিলেন—পত্রখানা পড়ে দেখো।

সেলুকাস পত্র পড়িল,

হেলেন লিখিতেছে—

সম্রাট্,

কৌশলে বন্দীকে উদ্ধার করে নিয়ে পাটরাণী হবার আশায় দু'জনে প্রস্থান করলাম। আমার সন্ধান করবেন না, করলেও পাবেন না, পেলেও আমি ফিরবো না, কারণ বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

সম্রাট্, অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম, অনেক দয়া, অনেক অর্থ পেয়েছি। বিদায়কালে আপনার মঙ্গল কামনায় একটি মিনতি জানিয়ে যাই, সুরাপানের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। ঐটি আপনার প্রধান দোষ। আমার মাথা খান অনুরোধটি রাখবেন।

ইতি

গৌড়াভিমুখিনী

হেলেন।

পুঃ—সম্ভব হলে কিছু উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় ব্যাঙের ছাতা আপনার ভোগের উদ্দেশ্য পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

সেলুকাসের পত্র পাঠ শেষ হইলে সেকেন্দার শা শুধাইলেন, কি বোঝো সেলুকাস।

সেলুকাস বলিল, হেলেনের মতো গ্রীক সভ্যতার ক্ষীরপুত্তলির যেখানে এরূপ মতিগতি—অন্যে পরে কা কথা। সম্রাট আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

সম্রাট বলিলেন—আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।

কি কর্তব্য সম্রাট?

এসো তাঁবুর বাইরে এসো।

দুজনে বাহিরে আসিলে সম্রাট বাদকগণকে ঘোষণাধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন। মুহূর্তে শত শত তুরী, ভেরী গগনভেদী বৃংহতি করিয়া উঠিল। দেখিতে

দেখিতে পদাতিক, অশ্বারোহী উচ্চনীচ যাবতীয় গ্রীক-সৈন্য সম্রাট সমীপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

বাজোদ্যম শান্ত হইলে সেকেন্দার শা কম্বুকণ্ঠে আদেশ করিলেন—জাল গুটাও অর্থাৎ শিবির তোলো। এখনি যাত্রা করতে হবে।

এন্টিগোনাস প্রত্যাশাভরে শুধাইল, পূর্ব দিকে?

না, পশ্চিম দিকে জন্মভূমি গ্রীসের দিকে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। যে যে ভাবে আছ, এখনি যাত্রা করো।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল হেলাস, হেলাস অর্থাৎ গ্রীস্ গ্রীস্।

সম্রাটের হঠাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ কেহ বুঝিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ অলঙ্ঘ্য, কাজেই গ্রীকবাহিনী তখনই পশ্চিম মুখে গ্রীসের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিল।

ইহাই পেস্বাডস্ লিখিত সেকেন্দর শা-র অকস্মাৎ ভারত ত্যাগের প্রকৃত বিবরণ।

সে সন্ন্যাসীটির কি হইল

১

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কোন্ অভিজ্ঞতার পরিণামে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত বালকেও জানে! রাজকীয় সুখ ও ঐশ্বর্যে লালিত-পালিত যুবক রাজপুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া পর পর চারদিন চারটি দৃশ্য দেখিলেন, মৃতদেহ, রুগ্‌ণ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও একজন সন্ন্যাসী। প্রথম তিনটি দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, মানুষ যতই আরামে বিলাসে মগ্ন থাকুক না কেন, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ইহাদের আক্রমণ এড়াইবার কোন উপায় কোন দেহীর নাই। চতুর্থ দিনে তিনি দেখিলেন চীরাজিনধারী এক প্রফুল্ল সন্ন্যাসী। তখন তাঁহার মনে হইল সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করিলে হয়তো জরা ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, মৃত্যুর কবল অবশ্য অনপনেয়, কিন্তু যাহার বাসনার মূল ছিন্ন হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার আবার ভয় কি? তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, আর বিলম্ব নয়, সেই রাত্রেই সংসার পরিত্যাগ করিবেন ও দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিবেন। এ পর্যন্ত সকলেরই পরিজ্ঞাত, পরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কিভাবে তথাগত বুদ্ধরূপে জগতের অন্যতম ধর্মগুরুতে পরিণত হইলেন, তাহাও কাহারো অবিদিত নহে।

আমি আজ অন্য বিষয় বলিতে বসিয়াছি, আর খুব সম্ভব সে বিষয়টি তত সুপরিজ্ঞাত নহে। সেই সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে যে ভাব বিপর্যয় ঘটিল তাহা সকলেই জানে বটে, কিন্তু রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসীটির মনে কি ভাবোদয় ঘটিয়াছিল, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে? যতদূর জানি বিষয়টি লইয়া কেহ চিন্তা করে নাই, এমন কি ইহাতে চিন্তনীয় যে কি থাকিতে পারে, তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সন্দর্শনে সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা বিপর্যয় ও তাহার পরবর্তী জীবনকাহিনীই আজ আমার আলোচ্য।

২

সেই সন্ন্যাসীটি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া কপিলাবস্তু নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেদিন প্রাতঃকালে ভিক্ষার্থ রাজপথে বাহির হইলেন। আগের তিন চারদিন তাঁহাকে বনপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, খাদ্য কিছু মেলে নাই,

কাজেই ক্ষুধায় তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও মন বিরক্ত হইয়াছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা সন্ন্যাসীর দেহ মন যে বিকল করে, গৃহীরা এ সত্য স্বীকার না করিলেও প্রকৃত সন্ন্যাসিগণ তাহা কখনো গোপন করে না। ভিক্ষায় বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সম্মুখে একটি আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা। নাগরিকগণ সেই শোভাযাত্রা দেখিতে ব্যস্ত, কেহ সন্ন্যাসীকে বড় লক্ষ্য করিল না, লক্ষ্য না করিলে আর ভিক্ষা মিলিবে কি প্রকারে ?

সন্ন্যাসী ভাবিলেন ভালই হইল, ঐ শোভাযাত্রার দিকেই যাওয়া যাক, দু'চার মুষ্টি তণ্ডুল বা দু'চারিটি কার্ষাপন পাওয়া অসম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে তুরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া, রথ অশ্ব হস্তী পদাতিক সমভিব্যবহারে শোভাযাত্রা কাছে আসিয়া পড়িল, তাঁহাকে আর বেশি অগ্রসর হইতে হইল না। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, সেই শোভাযাত্রার কেন্দ্রে একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথের উপরে সুখাসনে এক নধরকান্তি সুপুরুষ যুবক উপবিষ্ট। যুবতী কিঙ্করীগণ কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ ময়ুরপাখার ব্যজন করিতেছে, কেহ তাম্বুল পানীয় অগ্রসর করিয়া দিতেছে ; আর কয়েকজন সুবেশা সুন্দরী সেই রথের উপরেই তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। শোভাযাত্রার একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ন্যাসী জানিলেন যে, তিনি নগরের যুবরাজ। সন্ন্যাসী তখন রথের দিকে অগ্রসর হইলেন, সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী রথের কাছে পৌঁছিয়া বলিলেন, যুবরাজ আপনার কল্যাণ হোক। সন্ন্যাসীকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দান করুন।

এখন ইতিপূর্বে যুবরাজ কখনো ভিক্ষা শব্দটি শোনেন নাই, কাজেই ব্যাপারটা কি জানিতেন না। তিনি সারথিকে শুধাইলেন, লোকটি কি বলে ? ভিক্ষার অর্থ কি ?

এদিকে সারথির উপরে রাজার কড়া হুকুম ছিল যে, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন আদিব্যাধি যে আছে, পথের বাহির হইয়া যুবরাজ তাহা যেন না জানিতে পারেন।

তাই সারথি বলিল, যুবরাজ ভিক্ষা মানে দান। ঐ ব্যক্তি আপনাকে দান করিতে চায়।

যুবরাজ শুধাইলেন, তবে ভাষাটা ও রূপ কেন ?

সারথি বলিল, সন্ন্যাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র।

ইত্যবসরে রাজপুরুষগণের ইঙ্গিতে শান্ত্রী মন্ত্রিগণ সন্ন্যাসীকে ঠেলিয়া দূরে

সরাইয়া দিল। জনতার কেহ কেহ বলিল, যাও, যাও ঠাকুর আজকের আমোদটা মাটি করো না। কেহ বলিল, সকাল বেলাতেই তোমার মুখ দেখলাম, না জানি দিনটা কেমন যাবে!

সন্ন্যাসী পথের ধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন আর শোভাযাত্রা তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া নগর পরিক্রমায় অগ্রসর হইল। এই ঘটনায় সন্ন্যাসী ভিক্ষা পাইলেন না বটে, তবু প্রচুর শিক্ষা পাইলেন।

উৎসবমত্ত নগরী সেদিন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেল। অভুক্ত সন্ন্যাসী সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন দেহে নগরপ্রান্তের এক বৃক্ষতলে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন—হা ভগবান্ আমি কি মূর্খ! আজ বারো বছর, স্ত্রী পুত্র সংসার ও রাজত্ব ছাড়িয়া কোথায় ভগবান, ধর্ম কি, পরকাল কি, আত্মা আছে কিনা প্রভৃতি অবাস্তর বিষয় চিন্তা করিয়া মাঠে ঘাটে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া মরিতেছি। কোনদিন ভিক্ষামুষ্টি জোটে, কোনদিন বা জোটে না; কোনদিন আশ্রয়, মানুষের গোয়াল, কোনদিন বা বৃক্ষতল; রৌদ্র বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, মশক মক্ষিকা, শ্বাপদ দ্বিপদ, পরিশ্রম চিন্তা, ধ্যান ধারণা সমস্ত মিলিয়া স্বাস্থ্য ও যৌবন নাশ করিল, জীবনও শেষ হইবার মতো। অথচ কি ফলশ্রুতি? কিছুই না! ভগবান্ থাকিলে অবশ্যই এতদিনে দেখা মিলিত, যাহা নাই তাহার দেখা মিলিবে কিরূপে? হায়, হায়, আমি কি মূর্খ।

তারপরে সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন, আর ঐ রাজপুত্রটি কি আরামে আছে, দধি দুগ্ধ নবনী প্রভৃতির সম্মিলিত সহযোগিতায় উহার দেহটি কি ললিত কোমল। মুখ হইতে কথা বাহির হইবার আগেই মানুষের যা কিছু কাম্য মিলিতেছে। দেখো দেখি মশামাছি নাই তবু ব্যজন চলিতেছে, চর্বণরত মুখ বিশ্রাম পাইবার আগেই নূতন তাম্বুল জুটিতেছে, আর রথের উপরে যাহার এতগুলি সুন্দরী তরুণী গৃহে না জানি আরো কত! আহা, এই তো জীবন।

তারপর তিনি ভাবিলেন, হায় আমারও তো সব ছিল, সুন্দরী পত্নী রম্ভা, বালকপুত্র মাধব, কিঙ্কর, কিঙ্করী, রথ, অশ্ব, মন্ত্রী, শাস্ত্রী কিনা ছিল। আর আজ কিনা এই অবস্থা। শাস্ত্র মুনি, ঋষি ও আধুনিক অকালপক্বদের ধাপ্পায় পড়িয়া আজ হা ঘরে, হা ভাতে, হা পত্নীক, হা পুত্রক হইয়া হায় হায় করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি।

তারপর ভাবিলেন, ভাগ্যে ঐ রাজপুত্রকে দেখিলাম, জানিলাম, জীবন কি, বুঝিলাম কত বড় ভুল করিয়াছি, কিন্তু আর নয়।

তখন তিনি স্থির করিলেন যে, গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখনো জীবনপাত্রে কিছু রস থাকা অসম্ভব নয়, তলানি-টুকুই অনেক সময়ে মধুরতর হয় শেষ চুমুকে তাহা পান করিয়া লইতে হইবে। পরদিন প্রাতঃকালেই চীরাজিন ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহীবেশ ধারণ করিবেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন। এই সুখকর চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র তাঁহার চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিল। তিনি চীর ও অজিন পাশে খুলিয়া রাখিয়া অনেকদিন পরে আরামে ঘুমাইলেন। সংসারের চিন্তাতেই এত সুখ! আহা সংসার কি মধুময়!

গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল তাহার দেহে রাজবেশ! সম্মুখে অভাবিতভাবে চীর ও অজিন দেখিতে পাইয়া লোকটি সাগ্রহে তাহা তুলিয়া লইল। তারপরে রাজবেশ খুলিয়া সেখানে রাখিয়া নিজ দেহে চীরাজিন ধারণ করিল। লোকটি মনে মনে ভাবিল, অদৃষ্ট অবশ্যই সন্ন্যাসের ইঙ্গিত করিতেছে নতুবা এমনভাবে সন্ন্যাসীর যোগ্য বসন জুটিয়া যাইবে কেন? লোকটি তখন ধীর পদে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত হইলেন এ কি চীরাজিন গেল কোথায়? তাহার স্থানে রাজবেশ আসিল কিরূপে? তখন তিনি বুঝিলেন ইহাই অদৃষ্টের ইঙ্গিত। বারো বৎসরব্যাপী সন্ন্যাসের অভিজ্ঞতায় সহজেই তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে প্রত্যাবর্তনই তাঁহার কর্তব্য, তাই সর্বজ্ঞ অদৃষ্ট মন্ত্রবলে চীরাজিন অপসারিত করিয়া তৎস্থলে রাজবেশ সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক সঙ্কল্পের সহিত অদৃষ্টের এইরূপ সহযোগিতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন, আর সানন্দে রাজবেশ ধারণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের দিকে দ্রুতপদে যাত্রা করিলেন।

৩

পূর্বোক্ত ঘটনার পর আরও বারো বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

৪

সেই সন্ন্যাসীটি পূর্বনাম অভিজ্ঞানবর্ধন নামে এতদিন রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে একদা গভীর রাত্রে পুনরায় চীরাজিন অবলম্বন করিয়া তিনি গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতেই তিনি অনেক যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। পরদিন এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি পুষ্পিত শালবৃক্ষের তলে দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গের প্রত্যাশায় রাজা অভিজ্ঞানবর্ধন, যাঁহাকে এখন পুনরায় সেই সন্ন্যাসী

বলা চলিতে পারে তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কয়েকদণ্ড পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন সেই সন্ন্যাসী বর্তমান সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভু আমাকে দীক্ষা দিন।

তখন বর্তমান সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠিন, ওপথ সকলের জন্য নয়, কাজেই তুমি গৃহে ফিরে যাও।

ইহা শুনিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রভু, আপনার কথা সত্য। এক সময়ে আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, কিন্তু পথটা যে পুষ্পাস্তীর্ণ নয় বুঝতে পেরে পুনরায় সংসারে ফিরে গেলাম। তখন বুঝলাম যে, সংসারের পথটাও দুর্গম।

তোমার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু দু'য়ে তুলনা করলে বুঝবে সংসারটাই সহজসাধ্য।

দুয়ের তুলনা আমার চেয়ে বেশি কেউ করেনি, কাজেই আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন সংসারের পথ ক্ষুরধারের মত দুর্গম।

বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক তোমার অভিজ্ঞতা শুনি, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হতে পারে।

'সেই কথাই ভালো' বলিয়া সেই সন্ন্যাসী পূর্বনাম অভিজ্ঞানবর্ধন আরম্ভ করিলেন—

সন্ন্যাসী হয়ে বেশ সুখেই ছিলাম, মাঝে মাঝে অভুক্ত বা অনিদ্র থাকতে হতো সত্য, কিন্তু এখন বুঝছি সংসারধর্ম পালনের চেয়ে তা অনেক ভালো। তারপর এক দিনের এক আকস্মিক অভিজ্ঞতায় আমার সর্বনাশ হ'ল। চীরাজিন ত্যাগ করে আমার রাজধানীতে ফিরে গেলাম।

তুমি কি রাজা ছিলে?

হা, প্রভু, পূভু, পূর্বজন্মে অনেক দুষ্কৃতি না থাকলে কেউ রাজা হয় না।

তাঁহার কথা শুনিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন আচ্ছা বলো।

সেই সন্ন্যাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন—আমি ভেবেছিলাম, আমি ফিরে যাওয়ামাত্র পত্নী, পুত্র, রাজপুরুষগণ ও প্রজাবৃন্দ সানন্দে আমাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু কার্যত ঠিক তার বিপরীত ঘটল। বারো বছর আগে রাজধানী ছেড়ে ছিলাম। তার অল্প কয়েকদিন পরেই আমার সাধ্বী স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে ফেলেছিলেন। অবশ্য সে স্বামী মৃত হওয়ায় সমস্যা অনেকটা সরল হয়েছিল। যদিচ আমার বিশ্বাস লোকটা মরেনি, সাধ্বী স্ত্রীর বিড়ম্বনায় সন্ন্যাসী বেশে দেশান্তরী হয়েছে। সে যাই হোক, দুই স্বামীর সাধ্বী স্ত্রী তৃতীয়বার পতিগ্রহণের

উদ্যোগ যখন করছেন তখন আমার অপ্রত্যাশিত অশুভ আবির্ভাব। প্রভু আপনি সন্ন্যাসী হলেও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কোন সাধ্বী পত্নীরই ভালো লাগতে পারে না। তিনি সরাসরি আমাকে অস্বীকার করে বসলেন, বললেন, ও আমার স্বামী নয়, কোন প্রবঞ্চক হবে। বুঝুন ব্যাপার একবার! এতদিন সন্ন্যাসী অবস্থাতেও এই স্ত্রীর জন্যই আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

তার পরে?

ওদিকে আমার মন্ত্রী মশায় তার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেছে। সে জানে আর দুই বছর পরেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যুবরাজ মাধব হবে রাজা, আর নিজে হবে রাজশ্বশুর, ক্ষেত্রবিশেষে রাজশ্বশুর মানেই রাজা। কাজেই মন্ত্রী আমাকে দেখে বলল, হাঁ, কতকটা মহারাজার মতো দেখতে বটে, তবে লোকটা আমাদের মহারাজা নয়। ওদিকে আমার পুত্র মাধব, যাকে পাঁচ বছরের রেখে সংসার ত্যাগ করেছিলাম, এখন সে সতোরো বছরের উঠতি যুবক, সেই মাধব মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছে মন্ত্রী সহায় না থাকলে সিংহাসনে বসা কঠিন হবে, কারণ স্নেহময়ী জননীর কাছে তৃতীয় পতি-উমেদার যাতায়াত শুরু করছে। মাধব স্থির ক'রে ফেলেছে সিংহাসনে বসবামাত্র মন্ত্রী-কন্যাকে অর্থাৎ রাণীকে গুম্ খুন ক'রে পাঠশালার এক ভূতপূর্ব সহপাঠিনীকে বিবাহ করবে। এমন সময়ে আমার প্রত্যাবর্তন। সে বুঝলো তার যাবতীয় পরিকল্পনা অকালে শুকিয়ে গেল।

আর তোমার প্রজাবৃন্দের অসন্তোষের কি কারণ?

আমার স্ত্রী মন্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রজাদের স্বপক্ষে রাখবার আশায় যাবতীয় রাজকর মকুব ঘোষণা ক'রে বসে আছেন, হেনকালে প্রকৃত মালিকের প্রত্যাগমন প্রজাদের পক্ষে কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। তারা বিদ্রোহ করে আর কি!

সত্যই তোমার কঠিন পরীক্ষা গিয়েছে। এ অবস্থায় সিংহাসনে বস্‌লে কি ক'রে?

সে এক আশ্চর্য ঘটনা প্রভু। রাজপুরীর কেলি সরোবরে আমার পোষা আর বড় প্রিয় একটি সারস পাখী ছিল। সেটা কি রকম ক'রে আমার আগমন জানতে পেরেছে, সেটা তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বস্‌লো। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে ঠোঁটে ক'রে রাজমুকুট এনে আমার মাথায় পরিয়ে দিল।

বর্তমান সন্ন্যাসী বলিলেন, ঐ সারসটা পূর্বজন্মে তোমার পিতামহ ছিল।

সে কি প্রভু এটা যে সারসী।

তা হোক, জন্মান্তরে লিঙ্গান্তর ঘটা অসম্ভব নয়। আচ্ছা তারপরে কি হল বলো।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সৈন্যদল হর্ষধ্বনি করে উঠ্‌ল, বলে উঠ্‌ল জয় মহারাজের জয়।

তাহলে বলো তোমার প্রতি সৈন্যদলের অনুরক্তি অটুট ছিল।

তা নয়, প্রভু, এতকাল রাজ্যে যুদ্ধ বা যুদ্ধ-সম্ভাবনা ছিল না, তাই সৈন্যদল ছিল অবহেলিত আর অপ্রাপ্তবেতন। এখন আমার অতর্কিতআগমনে, আমাতে মন্ত্রীতে রাণীতে যুবরাজে একটা যুদ্ধ-অশান্তি ঘটবার সম্ভাবনায় সৈন্যদল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা জানে যুদ্ধ আসন্ন হলে তবে বেতন পাওয়া যায়।

তারপর?

তারপর আর কি? তিমিঙ্গিল উপস্থিত হলে বিবদমান তিমিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ঘটে। তখন রাণী, মন্ত্রী, যুবরাজ পরস্পর প্রতিযোগিতা ছেড়ে চৌর-মৈত্রীতে বদ্ধ হল, আর আমাকে নাশ করবার ষড়যন্ত্র করলো।

যখন তারা দেখলো যে, সৈন্যদল আমার পক্ষে, তখন তারা এসে বল্‌ল, সবাই যে ঠিক এক কথা বল্‌ল, তা নয়, তবে ভাবটা অভিন্ন।

রাণী বল্‌ল, প্রাণাধিক, এতদিন অধীনীকে ভুলে কোথা ছিলে?

আর অধিক সে বল্‌তে পারলো না, মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

পুত্র বল্‌ল, পিতা আজ আবার আমি জীবন পেলাম।

মন্ত্রী বলল, মহারাজ, আপনি ফিরে এসেছেন, এবারে আমি স্বস্তিতে মরতে পারবো।

তারা সকলে একযোগে বল্‌ল, মহারাজ, আগামীকল্য নগর চত্বরে আপনার সম্বর্ধনা হবে, তাতে সবাই জানতে পারবে যে, আপনার শুভাগমন হয়েছে আর প্রজারাও চায় যে, একটা উৎসব হোক।

আমি বল্‌লাম ক্ষতি কি!

পরদিন সকলের সঙ্গে নগরচত্বরে উপস্থিত হয়ে দেখি, সুসজ্জিত সভাস্থল, মাঝখানে আমার জন্য স্বর্ণরৌপ্য খচিত আসন, চারিদিকে লোকারণ্য।

আমি আসনে বসতে যাবো, এমন সময়ে কোথা থেকে সেই সারসটি, আপনার কথা সত্য হলে আমার পূর্বজন্মের পিতামহ আমার প্রাণ রক্ষা করলো।

কি ভাবে?

সারস ঠোঁট দিয়ে একটানে আসনখানা সরিয়ে দিতেই প্রকাশ পেলো অতলস্পর্শ গহ্বর।

হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিল—ওরে নরাধম, এই অভিসন্ধি ছিল।

না, না প্রভু আপনাকে নয়, এই কথাগুলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম।

তারপরে কি করেছিলে?

তখন রাণী, যুবরাজ ও মন্ত্রীকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে সমাধিস্থ করলাম। অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখে সমবেত জনগণ গর্জন করে উঠল জয় মহরাজের জয়।

তারপরে?

তারপরে বারো বছর রাজত্ব করলাম।

তবে এখন রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা কেন?

এতদিনে সেই সারসটি মারা গিয়াছে, আর অরক্ষিতভাবে সংসারে থাকবার সাহস বা ভরসা নেই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী করযোড়ে সানুনয়ে বলিল, প্রভু সমস্ত অকপটে বললাম, এবার আপনি আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করুন।

তার আগে আমার সন্ন্যাসের পরীক্ষা শ্রবণ করো, পরে মনঃ স্থির করো।

অতঃপর বর্তমান সন্ন্যাসী সন্ন্যাসজীবনের যাবতীয় দুঃখ বিবৃত করিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতামাতা পরিত্যাগের দুঃখ, দেশে দেশে গুরুর অনুসন্ধান, ভণ্ড গুরুর সাক্ষাৎ, তপস্যার কঠোরতা প্রভৃতির কথা বলিলেন। তপস্যাকালে বিভীষিকা দর্শন, মার বা মদনের ছলাকলা প্রদর্শন, দেবগণের বরদানের জন্য আগমন, পিতামাতার ছদ্মবেশে কান্নাকাটি, এ সমস্তই তপস্যা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। কত না বিপত্তি প্রলোভন তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ক্রমে তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইল তাহাও কম দুঃখের কথা নয়। অবশেষে একদিন তাঁহার বোধি জন্মিল, তিনি বুঝিলেন যে, তপস্যার কঠোরতা কিছু নয়, আবার বিলাসময় জীবনও কিছু নয়, এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথটাই জীবন সার্থকতার পথ। তখন তিনি এক পল্লী-বালিকা প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিয়া বোধিমার্গে অগ্রসর হইলেন।

এই কাহিনী বলিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী মন্তব্য করিলেন, বৎস, সংসারের

অবিচারে তুমি সংসার ত্যাগে উৎসুক, কিন্তু দেখো সন্ন্যাসের পথও বড় সুগম নয়।

তা নয় জানি কিন্তু একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কি।

একবার তো পরীক্ষা করেছিলে, তবে আবার সংসারে ফিরলে কেন?

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সন্ন্যাসীজীবনে এক রাজপুত্রের আরাম আয়াস দেখে হঠাৎ মতি পরিবর্তন ঘটল, সংসারাশ্রমে ফিরে গেলাম। আপনি হাসলেন কেন?

আমার জীবনেও অনুরূপ এক অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এক সন্ন্যাসীর দিব্য প্রশান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে আমি সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করি।

সন্ন্যাসী দর্শনে? কোথায় বলুন তো।

কপিলাবস্তু নগরে।

কপিলাবস্তু নগরে। তবে আমিই সেই সন্ন্যাসী।

আর আমিই রাজপুত্র।

তুমিই সেই রাজপুত্র। হা ভগবান! বলিয়া সেই সন্ন্যাসী কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাগত শুধাইলেন, বৎস, তোমার কি হল!

কি হল? কি হতে আর বাকি? নিতান্ত কাষায়ধারী না হলে গলা টিপে তোমাকে এতক্ষণ নিকেশ করে দিতাম।

তোমার অপ্রীতিকর কি এমন করেছি?

কি করতে বাকি রেখেছ। সেদিন কেন তুমি আমার চোখে পড়তে গেলে? তোমাকে না দেখলে আমি তো সংসারে ফিরতাম না। মনে মনে জানতাম স্ত্রী-পুত্র আমার অনুগত, আমার রাজধানী ও প্রজাবৃন্দ রাজভক্ত। এসব মিথ্যা মোহ, কিন্তু সত্য বাস্তবের অভাবে মিথ্যা মোহ নিয়েই তো আমার দিব্য চলে যাচ্ছিল।

মোহ যতই মনোরম হোক, তার ভঙ্গ কি বাঞ্ছনীয় নয়? কারণ মোহ সর্বদাই মোহ।

ওসব তোমার মতো সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য, আমার মতো সংসারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী আবার খেদ করিতে লাগিলেন—হায়, ভগবান এ কি করলে! আমার সন্ন্যাসও নিলে, আবার সংসারও নিলে। এখন আমি দাঁড়াই কোথায়?

হঠাৎ তিনি বুদ্ধদেবের পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, প্রভু, আমাকে দেখেই আপনি সংসার ত্যাগ করেছেন, বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন ; আমার কাছে আপনি ঋণী ; সেই ঋণশোধ করুন, আমাকে শান্তির পথ বলে' দিন।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, শান্ত হও, আমার যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করবো না। তুমি যাতে এক খণ্ড জমি পাও তার ব্যবস্থা করে দেবো, তাতে তুমি শাক-শব্জী, তরি-তরকারি উৎপন্ন করো। সে সব বিক্রী ক'রে যা পাও, তা দিয়ে জীবনযাপন করো, অবশ্যই মনে শান্তি পাবে।

বুদ্ধের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, রাজার ছেলে হয়ে সন্ন্যাস-কামী হয়ে শেষে কিনা কৃষিকার্য করবো ?

ক্ষতি কি ? কোন্ রাজা, কোন্ সন্ন্যাসী এর বেশি করতে সমর্থ ? এ যে সৃষ্টিকার্য।

বেশ, প্রভু, মনে যদি শান্তি পাই, তাই হবে।

তখন বুদ্ধদেব উক্ত সন্ন্যাসীকে লইয়া শ্রাবস্তীনগরে আসিলেন আর এক শ্রেষ্ঠীকে অনুরোধ করিয়া সন্ন্যাসী যাহাতে খানিকটা জমি পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রাবস্তী ত্যাগের সময়ে বুদ্ধ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, এখানে তুমি কৃষিচর্চা করতে থাকো, আমি আবার যথাকালে ফিরবো। সন্ন্যাসী প্রণাম করিল, বুদ্ধ আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

৫

আবার বারো বৎসর অতিবাহিত হইল। নানা দেশে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তীপুরে ফিরিলেন। নগর প্রবেশের মুখে নগরোপকণ্ঠে সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে সুরম্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এক শিষ্যকে শুধাইলেন—এ কোন্ শ্রেষ্ঠীর।

শিষ্য বলিল, বারো বৎসর আগে যে সন্ন্যাসীকে আপনি এখানে একখণ্ড চাষের জমি দিয়েছিলেন এসব তারই।

বলো কি। বুদ্ধ বিস্মিত হইলেন।

এমন সময়ে সেই ভূতপূর্ব সন্ন্যাসী, প্রভূতপূর্ব রাজা, বর্তমানে ভূস্বামী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও তথাগতকে প্রণাম করিল।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, একি করেছ ?

সেই সন্ন্যাসী বর্ত্তমানে ভূস্বামী বলিল, প্রভু, এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন? স্বভাবের নিয়মে দুই চার হয়েছে, চার চৌষট্টি হয়েছে— আপনার আশীর্বাদে প্রাপ্ত পাঁচ বিঘা জমি পঁচাত্তর হাজার বিঘায় পরিণত হয়েছে, এখনো বেড়েই চলেছে।

আশা করি আর বিবাহ করনি।

আজ্ঞে না, সেরূপ ভুল আর করবো না, তবে একেবারে উ.....পত্নীও নেই, দ্বাদশটি উপপত্নী রেখেছি।

ঐ শিশুগুলি কার?

উপপত্নীদের দরুণ আমার।

কিন্তু মনে কি শান্তি পেয়েছ?

যে এত পেয়েছে তার আবার শান্তিতে কি প্রয়োজন?

কিন্তু মন কি বোঝে?

মন যাতে অবুঝ না হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি?

কি সেই ব্যবস্থা?

নিত্য নব উৎসব উত্তেজনা, নব নব সুখচর্চার দ্বারা বেচারা মনকে সর্বদা এমনি উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছি যে তার এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই, উন্মনা হবে কি করে। চিন্তাতেই অসুখের সূচনা, অবসরে চিন্তার সূচনা, আমার তিলমাত্র অবসর নেই। প্রভু এখন বেশ সুখেই আছি, অন্ততঃ অসুখী নই।

পুনরায় সংসারী যদি হবে তবে রাজ্য পরিত্যাগ করলে কেন।

তখন অবসর ছিল, তাই ভগবান, পরকাল, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি দুর্মোচ্য চিন্তাজাল ছিল। এখন তিলার্ধ চিন্তার অবসর না থাকায় ও সব ভূত কাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রভু, অবসরকে হত্যা করবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

কিন্তু যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হবে।

সেদিন সংসারের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে নৃত্যে গীতে, খাদ্যে মদিরায়, বিদূষণায় বারাঙ্গনায় প্রলয়োল্লাস চলবে আমাকে ঘিরে প্রাসাদে—আর সেই মদিরাপিচ্ছিল পথ দিয়ে কখন্ ছুট ক'রে চলে যাবো ওপারে জানতেও পারবে না।

তারপরে।

তারপরে আপনিও যতটুকু জানেন আমিও ততটুকু জানি। প্রভু, দুঃখ

মুক্তির আশায় আপনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন—আর আমি করেছি ঐ উদ্দেশ্যে কর্মচক্র প্রবর্তন। আপনার ও আমার দুই সুখতত্ত্বই জগতে চলতে থাকবে। আপনার শিষ্যসংখ্যা কোটি কোটি হবে, কিন্তু আমার অচিহ্নিত শিষ্যসংখ্যাও নিতান্ত অল্প হবে না।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, তোমাকে উপদেশ দেওয়ার আর কিছু নাই. আমি এবারে বিদায় হই।

বুদ্ধ রওনা হইবেন এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসীর, বর্তমানে ভূস্বামীর দ্বাদশটি উপপত্নী আসিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমরা আপনার শরণ নিলাম, আমাদের আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধ ভূস্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার সুখের উপকরণ যে চলল, এখন কি হবে?

উপপত্নী রাখবার ঐ তো সুবিধা, ও বস্তুর কখনো অপ্রতুলতা ঘটে না। বিশেষ ওদের বয়স হয়ে পড়ায় ওগুলোকে আমিই বিদায় করবো ভাবছিলাম।

বুদ্ধ ভূস্বামীর উপপত্নীসমূহ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ভূস্বামী অর্থাৎ ভূতপূর্ব সেই সন্ন্যাসী একজন অনুচরকে অবিলম্বে একমাত্র উৎকৃষ্ট মাধ্বী আনিতে আদেশ করিয়া সেই দিবস মধ্যেই দ্বাদশটি শূন্যস্থান যাহাতে পূর্ণ হয় সেইরূপ আদেশ করিলেন।

ইহাই হইল সেই সন্ন্যাসীটির প্রকৃত বৃত্তান্ত।

ভৌতিক চক্ষু

১

ইংলণ্ডের বার্কশায়ারের জন ফষ্টারের বালিকা কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে ভয়াবহ চাঞ্চল্য ইংলণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা চরমে পৌঁছিবার পূর্বেই সহসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই ফষ্টার কন্যার ইতিহাস তখন আর কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সামগ্রিক মনোযোগের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসের রক্তিম প্রবাহ শোচনীয় পরিণতি পর্যন্ত নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া যায়। যাহারা এই কাহিনীর আদ্যন্ত জানে তাহাদের বিস্ময় ও ভীতির অন্ত ছিল না। আর তখন যদি বিশ্বযুদ্ধ না বাধিয়া যাইত তাহা হইলে ঘটনাটি ইউরোপীয় সমাজে ভয়াবহতার এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিত সন্দেহ নাই। বিশেষ সদ্য সদ্য এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাতে, সংশ্লিষ্ট পাত্র পাত্রী সকলের নামধাম প্রচার করাতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ ঘটিতে পারিত। কিন্তু এখন সে সব বাধা অপসারিত, ঘটনা পুরাতন, প্রধান পাত্র পাত্রীগণ মৃত, কাজেই এতদিন পরে বিষয়টি অসঙ্কোচে বিবৃত হইতে পারে। পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর পাঠক বুঝিতে পারিবেন ইহার রহস্য ও নিদারুণত্ব এতটুকু হ্রাস পায় নাই।

মিঃ জন ফষ্টার একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বাল্যকালে প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি এক ইংরেজ সদাগরী অফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করেন। তাঁহার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল, অধ্যবসায় ছিল। এমন সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন তিনি পাটের চালান দিয়া ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন। যুদ্ধান্তে তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে জন ফষ্টার এণ্ড কোং নামে নিজ ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। এই সময় তিনি একটি পার্শী মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটির নাম রাখা হয় সোফিয়া। সোফিয়ার বয়স যখন দুই তিন, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পত্নীর মৃত্যুতে ফষ্টারের মনে বৈরাগ্য জন্মায়, সে সমস্ত ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দিয়া কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং বার্কশায়ারের অন্তর্গত মিলথর্প নামে ছোট একটি গ্রামে বাড়ী ও জোতজমি কিনিয়া স্থায়ী হইয়া বসে। কন্যাটিকে যত্নে লালন পালন করা, উত্তম শিক্ষাদান

করা—ইহাই ফষ্টারের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। কন্যাটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সুন্দরী, তেমনী সুশীলা, বিশেষ শিক্ষালাভ করায় তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিবার মতো ছিল। তাহাকে গ্রামের সকলেই ভালোবাসিত, এবং অনেকটা তাহারই আকর্ষণে (ফষ্টারের নিজেরও আকর্ষণ ছিল) গ্রামের লোকে ফষ্টারের বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইত। মোটকথা পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা ছিল।

এমন সময়ে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। ফষ্টারের বাড়ীর চার পাশে সবজি ক্ষেত ছিল। সেই সবজি ক্ষেত হইতে পাখী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ফষ্টার ছররা গুলি ছুঁড়িতেছিলেন। একটি ছররাগুলি লাগিয়া সোফিয়ার বাম চক্ষুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহার সেখানে আসিবার কথা নয়, সে কখন কোথা হইতে আসিল যখন সকলে পরস্পরকে শুনাইতেছে তার অনেক আগেই তাহার চক্ষুটি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

এই দুর্ঘটনায় ফষ্টার একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এত বড় আঘাত জীবনে তিনি পান নাই, স্ত্রীর মৃত্যুতেও নয়। এমন সময়ে তাঁহার এক ডাক্তার বন্ধু দেখাকরিতে আসিলেন, ভারতবর্ষে থাকিতে তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, ফষ্টার এই ক্ষতি অপূরণীয় নয়, আগেকার দিন হইলে অবশ্য অপূরণীয় হইত, কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ সব রোগ চিকিৎসাসাধ্য হইয়াছে। তিনি জানাইলেন যে "ব্লাড ব্যাঙ্কে" যে প্রক্রিয়ায় রক্ত অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়, সেই প্রক্রিয়ায় সদ্যমৃত ব্যক্তিদের অক্ষিগোলক অবিকৃত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে ফষ্টার অর্থব্যয় করিতে রাজি থাকিলে তিনি ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

ফষ্টার বলিলেন, মহাশয়, অর্থব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত নই।

তখন ডাক্তারটি বলিলেন যে আমি লণ্ডনে যাইতেছি। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে কন্যাসহ গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই ফষ্টার সোফিয়াকে লইয়া, লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত ডাক্তার, নাম বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ডাঃ রিচার্ডস তাহাদের লইয়া সহরের একজন প্রধান চক্ষু চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হইলেন। ডাঃ মেরিগোল্ড অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক, আবার সেই সঙ্গে "চক্ষু ব্যাঙ্কের" একজন ডিরেক্টারও বটেন। তিনি সোফিয়ার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচারের দ্বারা নষ্ট চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া "চক্ষু ব্যাঙ্ক" হইতে একটি নূতন অক্ষিগোলক পাইবার

ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই চার দিনের মধ্যেই সোফিয়ার বাম চক্ষুটি উৎপাটিত হইল এবং সে স্থলে সদ্যমৃত একব্যক্তির অক্ষিগোলক আরোপিত হইল। ডাক্তারেরা বলিল—মিঃ ফষ্টার, আর ভয়ের কারণ নাই, আপনি কন্যাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। কয়েকদিন মধ্যেই পুরাতন চক্ষুতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে সোফিয়া পূর্ববৎ দেখিতে পাইবে, প্রথম কয়েকদিন কিছু কিছু অসুবিধা হয়, তবে তাহাতে চিন্তিত হইবেন না। ফষ্টার ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সোফিয়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

২

পাঁচ সাত দিন পরে সত্য সত্যই সোফিয়া বাম চক্ষুতে নূতন দৃষ্টি লাভ করিল। সেদিন সোফিয়ার কি আনন্দ! তিনি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের লোকদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নাচ গান ও অগ্র্যুৎসবের আয়োজন করিলেন। গ্রামের সকলেই সোফিয়াকে ভালবাসিত, তাহারাও আনন্দিত হইল। কিন্তু এ হর্ষের কারণ বেশি দিন থাকিল না। নূতন চক্ষু দৃষ্টিলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার আচরণে, দৃষ্টিতে এবং কথাবার্তায় পরিবর্তন দেখা দিতে সুরু হইল। তাহার মুখের সে লাবণ্যও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।

এখন তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, মুখের হাব ভাব যেন বয়স্ক ব্যক্তির, শুধু তাই নয়, সে ব্যক্তিও আবার যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির তাহার নূতন চক্ষুটি পুরাতন অপেক্ষা আকারে বড়, কেমন যেন জটিলতায় পূর্ণ, আর সর্বদা রক্তাভ! হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়! মনে হয় বালিকার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন এক এক-চক্ষু শয়তান বাসা বাঁধিয়া একটি ঘুলঘুলি পথে সব যেন দেখিতেছে, সকলের গতিবিধি যেন পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অথচ অপর চক্ষুটি করুণাময়ী বালিকার, তাহাতে আসল সোফিয়ার প্রকৃত পরিচয়।

ক্রমে সোফিয়া সম্বন্ধে আরও নানারূপ অবাঞ্ছিত তথ্য লক্ষ্যগোচর হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন সর্বদা কাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কিম্বা মনে হইত ঐ নূতন চক্ষুটি যেন তাহার চালক হইয়াছে আর অসহায় বালিকা তাহারই নির্দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কাহার সন্ধানে! কি ভয়াবহ ঐ চক্ষুর দৃষ্টি—আর তাহারই ফলে কি নিষ্ঠুর, কি প্রতিজ্ঞা-কঠোর তাহার মুখের ভাব! তাহাকে একাকী অবস্থায় হঠাৎ দেখিলে চমকিয়া ওঠা অসম্ভব নয়।

ক্রমে আরও সব তথ্য প্রকাশ পাইল! ফষ্টারের বহু সংখ্যক গৃহপালিত হাঁস-মুরগী ও খরগোস ছিল—আর সেগুলি ছিল বালিকা সোফিয়ার খুব প্রিয়। একদিন সকাল বেলা ফষ্টার আবিষ্কার করিলেন যে গোটা কয়েক হাঁস-মুরগী এবং একটি খরগোস ছিন্ন কণ্ঠ হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথম তিনি ভাবিলেন এ কোন ধূর্ত শিয়ালের কীর্তি কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল—শিয়ালেরা মৃতদেহ ফেলিয়া যাইবে কেন? তবে কে করিল!

প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া ফষ্টার পশুপক্ষীর নূতন নূতন মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন একি অনৈসর্গিক উৎপাত। কিন্তু শেষে একদিন রহস্য উদ্ঘাটিত হইল, না হইলেই বোধ করি ভালো ছিল। তিনি সেদিন রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়া বসিয়া ছিলেন, খোলা জানালার কাছে, সম্মুখেই উঠানের মধ্যে গৃহপালিত পশু পক্ষীর জালে ঘেরা সুবৃহৎ খাঁচা। হাঁসের পাখার ধড়ফড় শব্দে সচকিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে সোফিয়া খাঁচার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং মুহূর্ত পরেই আরও দেখিলেন যে একটি হাঁস ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িল। ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। একি তাঁহার করুণাময়ী কন্যার কাণ্ড! সে কি মানবী হইতে শয়তানী হইয়া গিয়াছে? কেন? কাহার অভিশাপে?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না. তিনি ছুটিয়া খাঁচার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ পিতাকে দেখিয়া সোফিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ঘরের দিকে ছুটিল কিন্তু তৎপূর্বে ফষ্টারের দিকে এমন একটা হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে কন্যাবৎসল পিতার মনেও আর সন্দেহ রহিল না যে কোন ক্রূরকর্মা পৈশাচিক আত্মা ঐ অসহায় বালিকার মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছে। তিনি পরদিনই ডাঃ রিচার্ডসকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া অবিলম্বে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া তারবার্তা প্রেরণ করিলেন।

৩

পরদিন ডাঃ রিচার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন ফষ্টারের বাড়ীতে প্রবেশ করেন তখন ফষ্টার ও তাঁহার কন্যা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ছিলেন। ফষ্টার তাঁহাকে দেখিবার আগেই রিচার্ডস সোফিয়ার নজরে পড়েন আর নজরে পড়িবামাত্র সোফিয়া মহা আক্রোশে তাহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার মনের অবস্থা যত ভয়ানকই

হৌক না কেন সে বালিকা বই তো নয়? ফষ্টার ও রিচার্ড উভয়ে মিলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

সোফিয়া অন্য গৃহে গেলে কন্যার দুর্ব্যবহারের জন্য ফষ্টার বন্ধুর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু রিচার্ডস বলিলেন—এজন্য আপনি বিচলিত হইবেন না। এই ব্যবহারের জন্য আপনি বা আপনার কন্যা কেহই দায়ী নন। কোথাও কিছু একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে! হয়তো ঐ অস্ত্রোপচারের সঙ্গেই ইহার যোগ রহিয়াছে। যাহা হৌক আমি এখনই ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইতেছি।

ফষ্টার শুধাইল—আপনার সঙ্গে কি ডাঃ মেরিগোল্ডের এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল?

রিচার্ডস—আপনার তার পাইয়া আমি ডাঃ মেরিগোল্ডের কাছে গিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করি। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তায় নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আপনি যান। আর কোন বাড়াবাড়ি দেখিলে আমাকে সত্বর জানাইবেন।

তারপরে রিচার্ডস বলিলেন, এখনই যাহা দেখিলাম তার চেয়ে ভয়ানক আর কি হইতে পারে? ঐ হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীবটির ঘাড়ে যেন খুন চাপিয়াছে। এমন যে কি করিয়া হইল কে বলিবে।

—আর তাহার চোখটি দেখিলেন কি?

—মুহূর্ত মধ্যে যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি ও তাহার স্বাভাবিক চোখ নয়। সমস্তই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছে যাহা হৌক, আমি ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইয়া এখনই তার করিয়া দিতেছি।

রিচার্ডস একটু শান্ত হইলে ফষ্টার তাহাকে সোফিয়ার আচরণ, হিংস্র ব্যবহার সম্বন্ধে আনুপূর্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। রিচার্ডস বলিলেন, ডাঃ মেরিগোল্ডের পরামর্শ না জানা পর্যন্ত এ সমস্ত সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। তবে যতটা সম্ভব সোফিয়াকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে। আর আশা করিতেছি আগামী কল্যই ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকট হইতে চিঠি বা তার পাইব।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল যে চিঠি বা তারের বদলে স্বয়ং ডাঃ মেরিগোল্ড আসিয়া উপস্থিত। তখন রিচার্ডস ও ফষ্টার বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে মেরিগোল্ডকে ঢুকিতে দেখিয়া দুইজনে বিস্মিত আনন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মেরিগোল্ড যথাবিধি প্রত্যুত্তর দিয়া সোফিয়ার বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

এমন সময় এরূপ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিল যাহা পূর্বদিনের ঘটনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বালিকা সোফিয়া উনুন খোঁচাইবার লৌহদণ্ড বা পোকার হাতে লইয়া "ঐ আমার হত্যাকারী" বলিয়া মেরিগোল্ডের দিকে ধাবিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে রিচার্ডস ও ফষ্টার তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লৌহদণ্ড কাড়িয়া না লইলে মেরিগোল্ডের অবস্থা কি হইত তাহা ভাবিতেও ভয় করে।

ফষ্টার বলিল—আর উহাকে ছাড়া রাখা উচিত নয়—

এই বলিয়া কন্যাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ঘরটি অর্গল বন্ধ করিয়া দিল—

তারপরে ফিরিয়া আসিয়া ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকটে যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কিন্তু ডাঃ মেরিগোল্ড রিচার্ডস ও ফষ্টার উভয়কে বিস্মিত করিয়া দিয়া বলিলেন যে—মহাশয় আমারই উচিত আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

—কেন?

—তবে সব কথা বলি শুনুন! যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমাকে ঠিক দোষী বলা চলে না—কিন্তু আমার আরও ভাবিয়া কাজ করা উচিত ছিল।

এই বলিয়া তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন তাহা যেমন ভীতিজনক, তেমনি বিস্ময়কর।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিলেন—এই চক্ষুটি স্মিথ নামে একজন হত্যাকারীর, তাহার ফাঁসির হুকুম হয়—এবং প্রধানতঃ তাহা আমার সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়াই হয়। ফাঁসির দু'দিন আগে কি তাহার মনে হইল—সে নির্দেশ দিয়া যায় যে মৃত্যুর পরে তাহার বাম চক্ষুটি যেন 'চক্ষুব্যাঙ্কে' দান করা হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে তাহার চোখটি ব্যাঙ্কে আসে এবং রক্ষিত হয়। সোফিয়ার জন্য যখন চোখ সন্ধান করিতে আপনারা যান, তখন ঐ চোখটিই ছিল সব চেয়ে সদ্য আনিত। তাই আমি ঐ চোখটি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিতেছেন—তার ২/৩ দিন পরেই কোন সূত্রে স্মিথের একটি ডায়ারী আমার হস্তগত হয়। ডায়ারীখানি আমার বিরুদ্ধে হিংসাময় উক্তিতে পূর্ণ। আমার সাক্ষ্যে তাহার ফাঁসী হয় বলিয়া আমার উপরে সে জাতক্রোধ হয়—তেমন ক্রোধ একমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর দ্বারাই সম্ভব। সে লিখিয়াছে যে আমাকে হত্যা করিতে না পারিয়া সে নিস্ফল আক্রোশ লইয়া

মরিতেছে। তাহার ব্যর্থকামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সে চোখটি দিয়া যাইবে—যে ব্যক্তি পরে উহা গ্রহণ করিবে সে যেন তাহার অভিলাষ পূর্ণ করে—এই আকাঙ্খা লইয়া সে মরিয়াছে!

ডাঃ মেরিগোল্ড আরও বলিলেন—এখন দেখিতেছি তাহার আকাঙ্খা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রথমে সোফিয়া যে রিচার্ডস-কে হত্যা করিতে গিয়াছিল—তাহা আর কিছুই নহে, রিচার্ডসকে আমি বলিয়া ভুল করিয়াছিল। তারপরে আমার উপরে যে আক্রমণ হয়—তাহা তো আপনারা জানেন; ভাগ্যে সোফিয়া বালিকা তাই তাহাকে সহজে নিরস্ত করা গেল। কিন্তু এমন যে সম্ভব—অর্থাৎ এক মৃত ব্যক্তির চক্ষু তাহার অপূর্ণ আকাঙ্খার জের যে বহন করিতে সক্ষম, বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করে না। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে মোটেই অসম্ভব নয়—তাহা তো চোখেই দেখিলাম।

ব্যাকুলভাবে ফষ্টার শুধাইলেন—এখন ঐ শয়তানের হাত হইতে আমার কন্যাকে উদ্ধার করিবার কি উপায়?

—তাহাই তো ভাবিতেছি।

এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে সোফিয়ার আর্তনাদ উঠিল। দরজা খুলিয়া সকলে সবেগে প্রবেশ করিয়াই বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইল। এবং মুহূর্ত পরেই ফষ্টার কন্যার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকলে দেখিল সোফিয়ার বাম চক্ষুতে একটি Poker আমূল বিদ্ধ—সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—আর, বাবা আমাকে বাঁচাও! বাবা, বিষম কষ্ট বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

নূতন চক্ষু লাগাইবার পরে সোফিয়া এই প্রথম 'বাবা' সম্বোধন করিল—এতদিনের মধ্যে একবারও 'বাবা' বলিয়া ফষ্টারকে ডাকে নাই।

এত দিন পরে হতাশ হইয়া শয়তান বোধ করি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল—এবং যাইবার সময়ে সোফিয়ার অকৃতকার্যতার দণ্ডস্বরূপ চক্ষুটি হরণ করিয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোফিয়ার প্রাণহীন দেহ পিতার কোলে শান্তভাবে শায়িত হইল। ইহাই সেই অদ্ভুত 'ভৌতিক চক্ষুর' সাকুল্য বিবরণ—এখন প্রথম প্রচারিত হইল।

খেলনা

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন ভূতের গল্প গল্পের রাজা! কথাটা মিথ্যে নয়। ভূত আছে কি না জানি না, তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গির উপরে। হাঁ, বিনয়বাবু গল্প বলিতে পারেন বটে। আমরা পাঁচ সাতটি বয়স্ক জীব 'পত্তি পত্রে' অবস্থায় জড়ো সড়ো হইয়া বসিয়া আছি।

বাহিরে অবিশ্রাম ধারা পতন শব্দ, তার সঙ্গে মিশিয়াছে একটানা ঝিঁঝির ডাক, ঘনান্ধকার শ্রাবণ রাত্রির যেন মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন গ্রস্তের গর্জনের মতো চাপা মেঘের গর গর ধ্বনি, ঘরের জানালা দুটো খোলা রহিয়া রহিয়া ভিজা হাওয়ার দমকা ঘরে ঢুকিয়া মোমবাতির শিখাটাকে নাচাইয়া দিতেছে, ঘরময় আলোছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! এ হেন আমরা পাঁচ সাতজনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছি—স্বতন্ত্র একখানি চেয়ারে বসিয়া বিনয়বাবু গল্প বলিতেছেন।

প্রথমে কিভাবে ভূতের গল্পের সূত্রপাত হইল মনে নাই, খুব সম্ভব স্থানকালের মাহাত্ম্যে গল্পের স্রোত আপনি ভূতের গল্পের মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িল, বিনয়বাবু সেই মহাসমুদ্রে কর্ণধার হইয়া বসিলেন। হাঁ, তিনি গল্প বলিতে জানেন বটে, এতদিন তাঁহাকে নিপুণ হোমিওপাথি ডাক্তার মাত্র বলিয়াই জানিতাম।

"হাঁ ব্রহ্মদৈত্যের কথা যদি উঠল' তবে শুনুন একটা ঘটনা দেখেছিলাম বটে—"

বিনয়বাবুর গল্পের ধারার আর শেষ নাই, এতও জানেন, আর সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

অনাদিবাবু বলিলেন, বিনয়বাবু—একটু দয়ামায়া রেখে বলবেন, এই অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে হবে।

আহা থামুন না, বলুন বিনয়বাবু—কথাগুলি বলিলেন বৈদ্যনাথবাবু! তাঁহারই বাড়ী, কাজেই তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সমস্যা নাই।

প্রমথবাবু বলিলেন, না হয় এখানেই কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলে হবে, বলুন বিনয়বাবু।

"ময়নাডাঙা বলে সাঁওতাল পরগণায় একটা গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা রুগী

দেখতে। কতদিন আগে, বোধ করি বছর দশকেই হবে, ফিরবার পথে, মাঠের মধ্যে নেমে এলো এমনি অন্ধকার আর এমনি দুর্যোগ—"

সন্ধ্যা হইতে গল্প চলিতেছে, আমরা সকলেই সাধ্যমত দুটি একটি গল্প বলিয়াছি যদিচ বিনয়বাবুর গল্পের তুলনায় সে সব কিছুই নয়, কিন্তু গদাধরবাবু একেবারে নীরব। তিনি প্রথম হইতে এ পর্যন্ত একটি শব্দও করেন নাই, গল্প বলিবার অনুরোধ অজ্ঞতার অজুহাতে এড়াইয়া গিয়াছেন! সেই হইতে গালে হাত দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। আমরা সকলেই পরস্পরকে দীর্ঘকাল জানি, কেবল গদাধরবাবুই নবাগন্তুক; ছোট একটি বাসা ভাড়া লইয়াছেন; সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী; দুজনেরই বয়স হইয়াছে, সন্তানাদি নাই, তাঁহারা কাহারো সঙ্গে বড় মেশেন না; মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় তিনি বৈদ্যনাথবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন, আজও আসিয়াছিলেন এবং ভূতের গল্পের ফাঁদে ধরা পড়িয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখা যায় না বলিলেই হয়।

বিনয়বাবুর ব্রহ্মদৈত্যের অভিজ্ঞতা শেষ হইলে সকলে আরও জমাট বাঁধিয়া বসিল, এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল ভূত দেখিবার আগ্রহ কাহারো নাই, এমন কি এমন সাহসী বিনয়বাবু অবধি বলিয়া ফেলিলেন, যা দেখে'ছ, নূতন করে দেখবার আর শখ নেই, ওতে নার্ভ-এর উপরে বড় পীড়ন হয়ে থাকে।

আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

সকলে গদাধরবাবুর কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া শুধাইল, কেন বলুন তো।

পরলোকগত আত্মাকে দেখবার আগ্রহ যে কি অসীম তার একটি ঘটনা জানি।

বলুন, বলুন।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন কেন?

গদাধরবাবু আরম্ভ করিলেন, আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, গল্পের সূত্রে নিঃসঙ্গ নিভৃতচারী এই পরিবারটির অন্তরঙ্গ রহস্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইব আশাতে।

এক সহরে এক নববিবাহিত দম্পতি ছিল, নবীন তাদের বয়স, গভীর তাদের প্রেম, টাকাকড়ি তাদের বেশী ছিল না, কিন্তু তারা পরস্পরকে নিয়ে

এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব তাদের চোখেই পড়ত না। বিবাহের কয়েক বছর পরে তাদের চূড়ান্ত সৌভাগ্যকে উজ্জ্বল করে একটি কন্যা জন্মালো। পাহাড়ের চূড়ায় পড়ল বালার্ক কিরণ। মেয়েটি হল তাদের ধ্যান জ্ঞান জীবন, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের বাহ্যপ্রতীক। দীঘির জল যতই বাড়ে পদ্মের নাল ততই লম্বা হয়, জলতল পদ্মকে আর স্পর্শ করতে পারে না। বাপ মায়ের ভালবাসা প্রতিদিন ফেঁপে উঠছে কিন্তু তবু যেন মেয়েকে আচ্ছন্ন করতে পারতো না, একটুখানি ফাঁক আর পূর্ণ হতে চায় না। ঐ যে একটুখানি অপূর্ণতা হয়তো ওতেই প্রেমের মাধুর্য।

ওরা যে বাড়ীতে থাকতো সেটা বড় নয়, গোটা তিনেক মাত্র ঘর যে ঘরটা মেয়েকে নিয়ে ওরা শুতো, তার পাশের ঘরটা ছিল মেয়ের খেলবার ঘর। এখন তার বয়স তিন। ছোট্ট ঘরটি বাপ মায় মিলে নানারকম পুতুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। বাপ যেতো অফিসে, মা যেত রান্নাঘরে, মেয়েটি খেলাঘরে এসে আপনমনে খেলনাগুলো নিয়ে খেলা করতো। সন্ধ্যাবেলায় বাপ মা এসে যোগ দিতো তার খেলায়। কত রকম খেলা। বাপ সাজতো খদ্দের, মা সাজতো ফুলওয়ালী, মেয়েটি সাজতো দোকানী—এই রকম কত কি। আবার পুতুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলতো, বাপ মাকে তা শুনতে হত, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অপটুতা ও শক্তিহীনতার অজুহাত একেবারেই চলতো না, আর পুতুলের বিয়ের ঘটকালি! সে তো বাপের অবশ্য কর্তব্যের প্রধানত অঙ্গ, ঘটক বিদায়ের ভার যেমন মায়ের উপরে। এমনি চলতো ঘুমে তার চোখ ভরে আসা অবধি। বাপে মায়ে ভাবতো সন্ধ্যা সারাদিনব্যাপী হয় না কেন?

তাদের ভাবনাই শেষে সত্য হ'ল, সন্ধ্যার অন্ধকার দিনের আলো মুছে দিয়ে জীবনব্যাপী হ'ল, মাত্র তিন দিনের অসুখে অসমাপ্ত পুতুলখেলা ফেলে রেখে মেয়েটি চলে গেল।

বাপ মায়ের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে আমি পারবো না, অতএব সে চেষ্টা থাক। শুনেছি শোকে লোক পাগল হয়ে যায়, তারা তো সুখী, আপন দুঃখ বুঝতে পারে না। লোকে কান্নাকাটি করে, তারাও সুখী বুকের ভার গ'লে নেমে যায়। ওরা না হল পাগল, না করলো কান্নাকাটি, কেবল পরস্পরের চোখের দিকে কখনো তারা তাকাত না, পাছে প্রকৃতিস্থতার ছলনাটুকু এক নিমিষে ভেসে যায়। বাইরে থেকে সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো

তবে খেলাঘরটি মেয়ের জীবনকালে যেমন ছিল তেমনি রইলো, খেলনাগুলি গুছিয়ে একদিকে রেখে দিল পারৎপক্ষে সেখানে তারা কখনো ঢুকতো না।

এক দিন অনেক রাত্রে বাপ ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলো পাশের ঘরে শব্দ, ঠিক কে যেন খেলনাগুলো নাড়ছে। সে ধীরে ধীরে পত্নীকে ডাকলো; সে জেগেই ছিল, বলল আমি অনেকক্ষণ থেকে শুনছি।

ও ঘরে যাবে কি?

পত্নী কি ভেবে বলল, না, না। এমনি কিছুক্ষণ চললো, তার পরে শব্দ থেমে গেল; ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠেই ওরা খেলাঘরে প্রবেশ করলো, এ কি! বাক্সবন্দী খেলনাগুলি কে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে, ঠিক যেমন করে ওদের মেয়ে পরী সযত্নে সাজিয়ে রাখতো। এই প্রথম ওদের চোখে জল এলো, ওরা জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইলো, কেবল দুজনের চোখে কয়েকটি জলধারা গড়াতে লাগলো। লুব্ধ প্রত্যাশায় ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রেখে চলে এলো।

সেদিন অনেক রাত্রে আবার ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনতে পেলো। কে যেন খেলনাগুলো বার করে সাজিয়ে রাখছে। বাপ বলে উঠল—আমি যাবই, মা হাত ধরে নিষেধ করলো, না, না, ও ভয় পাবে।

তবে কি দেখবো না?

না, শুনেই সন্তুষ্ট থাকো, দেখা দেবার হলে আপনি দেখা দেবে।

কিছুক্ষণ পরে, বোধ করি খেলনাগুলো সাজান হয়ে গেলে শব্দ থেমে গেল। ওরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন খেলাঘরে ঢুকে ওরা দেখলো আগের দিনের মত খেলনাগুলো সাজানো।

ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখলো।

সেদিন রাত্রে ওরা আর ঘুমোল না, জেগেই রইলো। অনেক রাত্রে খেলাঘরে কার ছোট্ট দুটি পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। খেলনাগুলো বার করবার শব্দ' সেই সঙ্গে—অভিমানী কণ্ঠস্বরের মৃদু কুণ্ঠিত—"রোজ রোজ সাজিয়ে রাখি, রোজ রোজ কে নষ্ট করে দেয়।"

এ স্বর কি চিনতে ভুল হতে পারে? এ যেন তাদের হৃদয়ে বেদনার বজ্রাঙ্কুশে খোদিত, দুজনে একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল—আর দুজনে একত্রে

খেলাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো। ঘর শূন্য। খেলনাগুলো মেঝের উপর ছড়ানো, সাজাবার সময় হয়নি।

দুজনে এদিক ওদিক দেখলো, বাইরে দেখলো, সর্বব্যাপী অন্ধকার ছাড়া কিছু কোথাও নেই। তখন তারা খেলনাগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপর পড়ে সারারাত্রি কাঁদলো—ওরে বাছা, ওরে পরী, তোর হাতের শব্দ শুনবার আশাতেই আমরা খেলনাগুলো বাক্সে বন্ধ করে রাখতাম! অভিমান করিসনে! দেখা দে।

কিন্তু সেই শেষ, আর না পেয়েছে তার শব্দ, না শুনেছে সে কণ্ঠস্বর। কত দীর্ঘ রাত তারা বিনিদ্র কাটিয়েছে, কতবার খেলা ঘরে চুপি চুপি উঁকি মেরেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সেই অভিমানসিক্ত কণ্ঠস্বর, অশ্বত্থপত্রশীর্ষে দোদুল্যমান অশ্রুবিন্দুর মতো তাদের হৃদয়ের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে, এখনো আছে ঘটনার আজ কুড়ি বৎসর পরেও।

কিছুক্ষণের জন্য গদাধরবাবু থামলেন, তারপরে বললেন, পরলোকগত আত্মা দেখবার কি আগ্রহ জানে তারা, সেই হতভাগা পিতামাতা।

গল্প শেষ হ'ল।

এই আবছায়া আলোতেও দেখতে পাওয়া গেল গদাধরবাবুর চোখে কুড়ি বৎসরের পুরাতন সেই অশ্রুবিন্দু তেমনি দুলছে। বুঝতে পারা গেল কারা সেই হতভাগ্য পিতামাতা।

আসর ভঙ্গ হ'ল, বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ধরেছিল, সেই সুযোগ নিয়ে সবাই নীরবে চলে গেল। আমি একা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

দেখলাম শ্রাবণের রাত্রি তেমনি ঘনান্ধকার দুর্যোগময়ী। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের পালপালা মেলায় যে আলোকটুকু হচ্ছিল, যে-দৃশ্যটুকু ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে করে সে রাত্রিকে নিরবিচ্ছিন্ন ভয়ঙ্কর বলে আর মনে হল না, মনে হল এর মধ্যেও কোথায় যেন একটুখানি মাধুর্য, কোথায় যেন একটুখানি সৌন্দর্য আছে, সদ্যমৃতের ওষ্ঠাধরে সহজ প্রসন্ন হাসির রেখাটির মতো।

ফাঁসি-গাছ

আমাদের গ্রাম থেকে রেল ষ্টেশনে পৌঁছবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটা বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারিদিকে বৃক্ষরাজির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি, পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসি-গাছ। লোকে বলতো—নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হ'ত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে জল্লাদে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একেবারে পরিষ্কার, গা মসৃন তার উপরে ডাল বেরিয়েছে; এক-একটা ডাল কি লম্বা একেবারে গ্রামান্তরে গিয়ে যেন পেঁছয়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে; যতই উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ কম; সব শুদ্ধ মিলে গাছটি উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বল্‌তো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি-লটকানো। গোপালের বয়স তখন ছিল বিরানব্বই। গোপালের কথা সত্য হলে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষে পড়ে বটে; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে, গোপালের নিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়সের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাই হোক, শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক, গাছটা যে ফাঁসি-গাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হ'বার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ ক'রে রেখেছিল।

কেউ পারৎপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেতো না, একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল ষ্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে দব্‌কে মূর্চ্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো —কি দেখলাম? তা কি এখন মনে আছে? তবে মনে হ'ল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে!

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্ত্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না, ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্‌ করে তার পায়ের কাছে পড়ল; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে, সেটা ছিল জ্যোৎস্নার রাত্রি, তার ভুল দেখবার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা ছিল' না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হতে পারে না, কেন না, ফাঁসি হ'ত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ পথে আজ মূর্তি ধ'রে দেখা দেয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা, যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ-অপ্রমাণ করবার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এখন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল, আর তা-ই ছিল যথেষ্ট ফলে ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতি মিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপর বয়স বাড়লে কলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি গাছটির বিবরণ শুনিয়েছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না ক'রে বললেন, এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে, সেখানে পরবর্তী কালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন এমন হয়, তিনি বললেন, তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময়ে মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল, সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হ'য়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হ'ল না, কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করিনি।

তার পরে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকুরি উপলক্ষ্যে নিজের গ্রাম থেকে এক প্রকার নির্বাসিত হ'লাম। বহুকাল, জীবনের দুটি দশক কাটালো দেশ এবং দেশান্তরে। এই সময়ে মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হ'য়ে ওঠেনি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এলো। রেল স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে সব দৃশ্য, বাড়িঘর, গাছপালা, এমনকি মানুষের যে মুখগুলো যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসি গাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম স্টেশনে, একখানা টম্‌টম্ গাড়ি ভাড়া করলাম, বারো মাইল পথ, পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথ চল্‌তে চলতে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো একে একে মনে আসতে লাগলো, মনে হ'ল যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীত কালের মধ্যে প্রবেশ করছি; রাত তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি এমন সময়ে সেই ফাঁসি গাছটার কথা মনে পড়ল। ভয় হ'ল না, সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে, কৌতূহল হল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ ক'রে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধ করি ফাঁসি গাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা! কি বিরাট! অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যে আরও বিরাট দেখাচ্ছে, সহস্র শাখা-প্রশাখায় অন্ধকারের আলখাল্লা প'রে যেন এক দৈবী অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আর আশ্চর্য কি। আমারই সর্বাঙ্গ শির শির ক'রে উঠল। নির্বিপাকে গাছতলা অতিক্রম করে গেলাম। কিছুদূর এসে গাড়োয়ান বল্‌ল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল?

—কেন?

—ফাঁসি-গাছটার ভয়ে।

কান খাড়া ক'রে সজাগ হ'য়ে উঠলাম, শুধোলাম—এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটায় ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি।

—গাছটাই যে গিয়েছে।

—কোথায় যাবে ?

আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি ! তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো !

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজ যে অতবড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার ক'রে দিতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তার পর ?

—তারপরে সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড় ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন ?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন।

যেমন দেখলাম।

নিজের মনে মনে বল্‌লাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখছি ! অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন ? এ মিথ্যা ব'লে তার লাভ কি ? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলাম। কি দেখলাম ? কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কি ভাবে ? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে ?

তবে—কি দেখলাম ? ছায়া না মায়া না কি ! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরভিনয়ই বা কেন অসম্ভব ? তা-ই কি ? আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে ? কিন্তু নিজে অবিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?

লোকটার কথা মনে পড়লো—'যেমন দেখলেন।' যেমন দেখলাম। কি দেখলাম মনের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িখানা অন্ধকার পল্লীপথ দিয়ে এগিয়ে চলল—গ্রামের দিকে।

বিনা টিকিটের যাত্রী

ঠিক স্টেশনে ঢুকিবার মুখেই গাড়িখানা ছাড়িয়া গেল। এতক্ষণ ছুটিতে-ছিলাম এবার থামিলাম। চাকরের মাথায় বিছানা, সে তখনো ছুটিতেছে, বলিলাম, ওরে এবার থাম, আর ছুটে কি লাভ? এমন অদ্ভুত আদেশ সে শোনে নাই, সর্বদাই শুনিতেছে, 'ওরে আর একটু তাড়াতাড়ি' 'কেবলি ব'সে থাকে' ইত্যাদি। তার অভ্যাস অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে, সে থামিল না, ছুটিতেই লাগিল। ভাবিলাম, ছুটুক, অভ্যাস খারাপ করিয়া কাজ নেই।

মফঃস্বলের ছোট স্টেশনে রাত্রিবেলা গাড়ি ফেল করিলে কি দুর্দশা হয় অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা যাইবে না। তাহাতে আবার শীতের রাত্রি। গ্রীষ্মকাল হইলেও বা বাহিরে পায়চারি করিয়া কতকটা সময় কাটাইতে পারিতাম। চাকরটা একাস্তে বিছানা রাখিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, গাড়ি ফেল হ'য়েছে, আমাকে আজ রাত্রে স্টেশনে থাকতে হবে।

সে অবাক হইল। তাহার সর্বশক্তিমান মনিবের জন্য গাড়ি একটু অপেক্ষা করিল না—এ কেমন কথা!

তাহাকে বলিলাম—তুই কি এই রাত্রেই বাড়ি ফিরে যাবি?

সে বলিল—আপনিও চলুন।

সর্বনাশ! অন্ধকারে আবার ৫।৬ মাইল পথ হাঁটিতে পারিব না, তার উপরে কাল ভোরের গাড়ি যে পুনরায় ফেল করিব না তাহার নিশ্চয়তা কি?

তাহাকে কিছু পয়সা দিলাম। বুঝিলাম, পয়সা ও সে এক সঙ্গে বাড়ি পৌঁছিবে না; মাঝ পথে এক জায়গায় চোরাই মদের ভাঁটি আছে একটা সেখানে থাকিয়া যাইবে, দুইটাও থাকিয়া যাইতে পারে চাকরটা বাড়ির উদ্দেশ্যে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

এবারে রাত্রি যাপনের উপায় আবিষ্কার করিতে উদ্যম হইলাম এর মধ্যে আবার উপায়? স্টেশন বলিতে একখানা টিনের ঘর, তাহারি একটি দিক ঘিরিয়া লইয়া স্টেশনের কামরা। বাকি অংশটা সম্পূর্ণ খোলা, দেয়াল বলিতে কিছু নাই, অবশ্য কয়েকটা লোহার খুঁটি আছে, বেশ হাওয়া বাতাস খেলে, অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের দিক হইতে স্বাস্থ্যকর হাওয়া আসিতেছিল—কিন্তু উপভোগ করিবার লোকের অভাব। স্টেশন ঘরে অবশ্য বাবুরা আছেন, কিন্তু

তাহারা উত্তরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, বুঝিলাম শীতের হাওয়ার তাঁহারা ভক্ত নহেন। আমারও প্রায় সেইরূপ মনোভাব—কিন্তু আজ নিরুপায়।

ডান দিকে কোণে ছোট একটি ঘর আছে বটে, সেখানে দরজার উপরে এক টুকরো কালো কাঠ আঁটাও রহিয়াছে, খুব সম্ভব তাহার গায়ে "Waiting Room" কথাটিও লিখিত আছে। কিন্তু হইলে কি হয়—আজ ওখানে কয়েক মাস যাবৎ মালবাবু সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার সরকারী টিনের ঘর ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ওদিকটায় ঘেঁষিয়া লাভ নাই। অগত্যা বামদিকেই অর্থাৎ স্টেশনের কামরার মধ্যে ঢুকিলাম। স্টেশনের ঘড়িটার কাঁটা কুড়িটার কাছে। মাঝখানে একখানা বড় টেবিল, বেশ প্রশস্ত, তার উপরে এক রাশ খাতাপত্তর, দোয়াত কলম, টেলিফোনের ষ্ট্যাণ্ড, গোটা দুই চায়ের পেয়ালা—খুব সম্ভব শেষোক্ত জিনিষগুলি সরকারী সম্পত্তি নয়। টেবিলের উপর একজন বাবু (গায়ে সরকারী কোর্তা দেখিয়া বুঝিলাম স্টেশনের কর্মচারী) জড়ো সড়ো হইয়া শায়িত। এতক্ষণে বোঝা গেল, প্রশস্ত টেবিলের উপকারিতা কোথায়। আর একজন বাবু সরকারী কোর্তা গায়ে দিয়া হাত লণ্ঠনের আলোতে কতকগুলি টিকিট মিলাইয়া লইতেছেন, যে ট্রেনখানা আর একটু আগে আসিলেই পাইতাম, লুচির সঙ্গে আলুর দম খাইতে গিয়েই এই বিপদ, তাহারই যাত্রীদের টিকিট!

বাবুটির মনোযোগ আকর্ষণের আশায় কাশিলাম, মেজেতে জুতোর শব্দ করিলাম, কয়টা বাজিয়াছে স্পষ্ট দেখিয়াও ক'টা বাজে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু স্টেশনে বাবুদের অসীম মুমুক্ষা, তাঁহারা জানেন সকলের সব কথার উত্তর দিতে গেলে সংসার চলে না। এবারে দু'টি বিড়ি বাহির করিয়া একটি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলাম। তাঁহার সাধনায় ফাঁক ছিল। টুক করিয়া বিড়িটা লইয়া যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনি করিয়া চলিলেন। না, মাঝখানে একবার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বিড়ি ধরাইয়াছিলেন। দেশলাই আমার পকেটেও ছিল, কিন্তু, আমার যে তাঁহার দেশলাই উপলক্ষ্যে তাঁহার মনোযোগটি চাই, বলিলাম, দেশলাইটা—এসব বাক্য শেষ করিবার প্রয়োজন হয় না; এক্ষেত্রে তিনি শেষ করিবার সুযোগও দিলেন না, ইঙ্গিতে লণ্ঠনটা দেখাইয়া দিলেন। সরকারী লণ্ঠনটা খুলিবার কৌশল না জানায় নিজের দেশলাই দিয়াই বিড়ি ধরাইলাম।

ঠনক, ঠনক!

আপ, ডাউন দুটা কালো বাক্স স্টেশনে থাকে, কি নাম জানি না! একটা ঠনক ঠনক করিয়া বাজিয়া উঠিল।

এবারে বাবু মুখ তুলিয়া কালো বাক্সটার নিকটে গিয়া টেলিফোন কানে তুলিলেন।

—কে, সুরেন, নাকি ?…হাঁ, আমি প্রবোধ! বেশ! বেশ! কাল দুপুর নাগাদ যাবো! আরে বল কি ? তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন—আর যাবো না। নিশ্চয় যাবো, দুপুরের একটা মাল গাড়িতে যাবো! না, না, চিন্তা ক'রো না।

এগুলো বোধ করি সরকারী সংবাদ নয়। নাই হোক, সরকারী কলে বে-সরকারী কথা বলিতে বাধা নাই।

বুঝিতে পারিলাম, আপ ডাউন কোন দিকের স্টেশনে এক বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। আনন্দের সংবাদ।

বাবুকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, উনি বুঝি আপনার আত্মীয় ?

বাবুর ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল, বুঝিলাম কিছু বলিলেন। শুনিতে পাই আর না পাই তাতে কি ? আমার উদ্দেশ্যে কথিত তো। একি আমার কম আনন্দ !

—আর একটা বিড়ি ইচ্ছা করুন।

—দিন।

এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি।

—বসুন না।

আহা, এতক্ষণে একটা গতি হইল। স্টেশনের মানুষ হইলেও অমানুষ নন, আমিই এতক্ষণ ভুল বুঝিতেছিলাম।

একখানা চেয়ারের ওপর এক গাদা খাতা ছিল, নামাইবার উদ্যম করিতেই বলিলেন, নামাবেন না, ছারপোকা আছে।

—কিন্তু খাতাগুলো কি নষ্ট হবে না ?

—নষ্ট হবে কেন ? ওগুলো তো এজন্যেই আছে।

তা বটে, আমরা বাহিরের লোকে কেমন করিয়া জানিব কার কি প্রকৃত ব্যবহার।

বাবুটি বলিলেন—কোথায় যাবেন ?

—আজ্ঞে, কলকাতা।

—এত আগে কেন ? কাল সেই ভোরে গাড়ি ?

বলিতে পারিতাম যে, এত পরে কেন ? কিন্তু কিছু না বলিয়া বোকা সাজিয়া রহিলাম, হয়তো তাহাতেই দয়ার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা।

—রাতে থাকবেন কোথায় ?

—এখানেই কোথাও।

—আর কোথায়। ওখানেই আজ আপনাকে রাত কাটাতে হবে। ভালো ক'রে বসুন।

বিড়ির অসীম শক্তি। নামটাও মোহিনী বিড়ি কিনা ?

কিছু কথা বলা দরকার, চুপ করিয়া থাকা চলে না, নতুবা চেয়ারে বসিবার অধিকার হারাইতে কতক্ষণ !

—এগুলো টিকিট বুঝি ? লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু দেখি ঐ প্রশ্নের সূত্রে যদি কথার সূত্রপাত হয় !

—আর বল কেন ?

টিকিটগুলা সূতা দিয়া জড়াইতে আরম্ভ করিলেন—আজ একটা বেটা ট্রেন থেকে নেমে টিকিট না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিচ্ছিল।

গা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে অন্ধকারই প্রশস্ত, এতে বিস্মিত হইল চলিবে কেন ?

—তার পরে ?

—আমার কাছে চালাকি নয়। দেখি যে লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, অমনি দৌড়িলাম, লোকটাও দৌড়ল—(আশ্চর্য) !

—গিয়ে ধরলাম—ঐ বাদামতলায়, সেখানে যেমন অন্ধকার, তেমনি জঙ্গল ! …হাঁ, আদায় করে নিলাম !

ঐ আদায়টুকু সরকারী তহবিলে গেল না বে-সরকারী পকেটে ঢুকিল এসব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইলেও তুলিতে নাই। বলিলাম, আপনার কাছে পারবে কেন, আপনি যে রকম স্মার্ট !

—আপনি বুঝছেন দেখছি ! আর বুঝবেন নাই বা কেন, হাজার হোক—হাজার হোক কি তা আমিই জানিনা, উনিই বা জানিবেন কিরূপে ?

—আর একটা বিড়ি আছে নাকি ?

বিড়ি হস্তান্তরিত হইল।

—নিন, আরাম করে টানুন। সারাটা রাত কাটাতে হবে।

—বেশ বিড়ি !

মোহিনী বিড়ি। 'কি মোহিনী জানো বন্ধু কি মোহিনী জানো।'

—ঠনক, ঠনক !

—নাঃ বিরক্ত ক'রে মারলে।

বাবুটি উঠিলেন। এবারে আর সামাজিক নিমন্ত্রণ নয়, মাল গাড়ীর আগমন সংবাদ।

রামশরণ। এই রামশরণ!

টেবিলের তলের একটা পুঁটুলি নড়িয়া উঠিল।

বাবু পা দিয়া ঠেলা দিলেন। সর্বাঙ্গে কম্বল জড়াইয়া যে লোকটা টেবিলের তলা হইতে বাহির হইল—তাহারই নাম তবে রামশরণ।

বাবুটি রাষ্ট্র ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—মালগাড়ী আসছে, ডাউন দে গিয়ে।

নিদ্রাজড়িত চোখে রামশরণ বাহির হইয়া গেল। আজ মালগাড়ীর একটা ফাঁড়া আছে বুঝিতে পারিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারকে মথিত করিয়া একটা শব্দের ঝড় বহিয়া গেল।

উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইলাম, বাহিরে অন্ধকার, নিরেট ঘন কালো, আকাশের তারাটিও দৃশ্যমান নয়, যেন সুগভীর কয়টা খাদের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছি। জানালার কাঁচ ভেদ করিয়া কনকনে ঠাণ্ডা আকাশের তলে না জানি আরও কত। আজ খোলা চালার মধ্যে থাকিলে শিক্ষাই হইত বটে! পাছে চেয়ারখানা হারাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাপিয়া বসিলাম।

—এই ওঠ্, ওঠ্, মাষ্টারবাবু আসছেন।

—ঘুমাতে দিল না দেখছি, বলিয়া গভীর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া টেবিলে শায়িত লোকটি উঠিয়া বসিলেন।

—কি হ'য়েছে?

—মাস্টারবাবু আসছেন।

এমন সময়ে ভারি জুতার শব্দ তুলিয়া, হাতে একটা লণ্ঠন দোলাইতে দোলাইতে, মাথায় মুখে আপাগোড়া আলোয়ান জড়াইয়া মাস্টারবাবু ঢুকিলেন। মাস্টারবাবুর প্রকাশ্য অংশ নাকের দুটি ফুটো এবং চোখের দুটি ফুটো।

—আঃ কি শীত পড়েছে, তবু তো সবে কার্তিক মাস!

হাতের লণ্ঠন মেজেতে রাখিয়া মুখের আলোয়ান সরাইলেন, একজোড়া কাঁচা পাকা মলোটজি গোঁফ বাহির হইয়া পড়িল।

এবার বুঝি আমাকে চেয়ারখানি ছাড়িতে হয়। না, তিনি অন্য একখানি চেয়ারে বসিলেন। একটা মোহিনী বিড়ি দেব নাকি? তাঁহার মর্জির ব্যতিক্রম হইলে শীতের রাত্রি বাহিরে কাটাইবার আশঙ্কা।

প্রবোধবাবু, সেই যিনি মোহিনী বিড়ির গুণে মুগ্ধ, আমার কাছে একটি বিড়ি চাহিয়া লইয়া মাস্টারবাবুর দিকে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন, স্যার আজ একটা প্যাসেঞ্জার ভারি মুস্কিলে ফেলেছিল।

—শুনেছি, শুনেছি, ওহে ছোকরা কাজটা ভালো করনি।

মাস্টারবাবু বিড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রবোধ অবাক. ভাবিয়াছিল কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রশংসা পাইবে।

—আজকাল W. T. ধরবার জন্য প্রেশার দিচ্ছে।

—কিন্তু ঐ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে কে ঠেকাবে শুনি?

সন্ত নিদ্রোত্থিত বলিলেন—হ্যাঁ, যাত্রীরা আজকাল অনেক সময়ে মারপিঠ করে।

—তবেই বুঝেছ।

—আর কি বিপদ হ'তে পারে?

—ঐ জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল তো?

—সাপখোপ হবে।

—শীতকালে সাপখোপ কোথায়?

—তোমরা কেবল সাপ আর উপরি-অলা দেখছ। কিন্তু মনে রেখো যে উপরি-অলারও বাবা আছে। যেটুকু রয়সয় করো, রাত-বিরেতে প্যাসেঞ্জারের পিছনে পিছনে তোমার অন্ধকারে যাবার দরকার কি শুনি? প্রোমোশন হবে? প্রাণটা গেলে প্রোমোশন পাবে কে ভেবে দেখেছ?

একটু থামিয়া—

—আরে বাপু প্লাটফর্ম অবধি তোমার জুরিসডিক্শন। তার মধ্যে ধরতে পারলে ভালো—আবার বাইরে যাওয়া কেন? বয়স অল্প কিনা। তায় আবার নূতন চাকরি, উৎসাহ বেশী। দাও—

বিড়ি না দেশলাই?

দেশলাইটাই বটে! বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। মাস্টারবাবুর বাঁ গালে মস্ত একটা আঁচিল—এতক্ষণ অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই, দেশলাই কাঠির আলোতো চোখে পড়িল।

নাঃ, মোহিনী বিড়ির গুণ আছে। মাস্টারবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কতকটা মানবিক ভাব দেখা দিয়াছে।

—আপনি বুঝি ট্রেন ফেল করেছেন?

কৃতার্থ হইয়া বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

—আজ তবে ওখানে ব'সেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

যদি না বাহির করিয়া দেন।

—শুনুন মশাই, শুনুন। আপনার বয়স হ'য়েছে বুঝতে পারবেন—এরা সব ছেলেছোকরা, আমাদের মতো বুড়োর কথা বিশ্বাস করে না।

ভাবিলাম, আমাদের বলিতে আমিও নাকি? বুঝিলাম রাত্রি জাগরণের আশঙ্কায় নিশ্চয় মুখটা অনেকখানি শুকাইয়া গিয়াছে, নতুবা বুড়োর দলে পড়িবার গৌরব এখনও তো অর্জন করিতে পারি নাই।

—তখন কেবল সার্ভিসে ঢুকেছি 'রিলিভিং হ্যাণ্ড,' আজ এ স্টেশনে, কাল ও স্টেশনে এমনি ছুটে বেড়াতে হয়। সেদিন গিয়েছি, না, স্টেশনের নামটা নাই বললাম, কে আবার কি ভাববে? এমনি শীতকাল না, শীত আরও একটু বেশী হবে, তারিখটা কিনা ছিল পয়লা ডিসেম্বর—

মাস্টারবাবু শুনিতে পান এমন অস্ফুট স্বরে প্রবোধ অপর জনের উদ্দেশ্যে বলিল—মেমরি!

মাস্টারবাবু প্রশংসাটুকু গ্রহণ করিলেন কিন্তু মূল্য দিলেন না, শুনিতে পান নাই এমনভাবে আমার উদ্দেশে বলিলেন, নিন ভালো ক'রে বসুন, আপনার তো তাড়া নেই গল্পটাও ছোট নয়।

আমি আলোয়ানখানা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইয়া বসিলাম, মাস্টারবাবু আরম্ভ করিলেন—

সেদিন সকলেই পৌঁছেছি সেই নূতন স্টেশনে, পৌঁছেই বর্ধমান লোকালের দুই W. T.-কে ধ'রে ফেলেছি, পিছন দিক দিয়ে গুড় গুড় ক'রে পালাবার চেষ্টায় ছিল। আমি গিয়ে খপ্ ক'রে দু'জনের হাত ধ'রে ফেলেছি, তারা দু'জন আমি একা। কিন্তু পারবে কেন? তখন আমি ইয়ংম্যান, যেমনি স্মার্ট তেমনি গায়ে শক্তি রাখি। একা তাদের টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে এলাম। মাস্টারবাবু বললেন—হাঁ বাহাদুর ছোকরা বটে! W. T.-র আমি ছিলাম যম! ওর আগে ছিলাম রিষড়েয়—ছ' মাসে প্রায় আড়াই শ W. T. ধরেছিলাম। মাস্টারবাবু প্রোমোশনের জন্য আমাকে Recommend করেছিলেন। তিনি বলিতেন, নাঃ এ ছেলেকে কেউ আটকাতে পারবে না, D. T. S. হয়ে তবে ছাড়বে।

এবারে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, বলিলেন, ভাবছেন তবে আজ আমার এ দশা কেন? সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিভন্ত বিড়িটায় কষিয়া কয়েক টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন। ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখি দুটো কাঁটা চব্বিশটার কাছে গিয়া মিলিয়াছে। বাহিরে অন্ধকারে শীতের মধ্যে ঝিঁঝির একটানা আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—পৃথিবীতে আর যেন কোন শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় আমরা চারিটি প্রাণী চারিটি ছায়া লইয়া নীরবে বসিয়া আছি। মাস্টারবাবু বলিতেছেন—

—সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো যার ফলে W. T. ধরা ছেড়ে দিলাম, সেই সঙ্গে আমার প্রোমোশনের আশাও চিরকালের মতো গেল—এখন দেখুন বুড়ো বয়সে·········কোথায় D. T. S আর কোথায় এই সি ক্লাস স্টেশনের স্টেশন মাস্টার।

প্রবোধ সহানুভূতিসূচক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

—তখন বোধ করি রাত আটটা হবে, তার বেশি তো নয়ই। কিন্তু শীতের রাত নিঝুম হ'য়ে এসেছে, তার উপরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। ছোট স্টেশন ইতিমধ্যেই ছম্ ছম্ করছে। বাসায় গিয়েছিলাম এক কাপ চা খেতে। ফিরে এসে দেখি যে আপ বর্ধমান লোকাল এসে থেমেছে। কয়েকজন যাত্রী নামলো, টিকিট দিয়ে বেরিয়ে গেলো। স্টেশন ঘরে ফিরবো এমন সময় দেখি কিনা যে একজন যাত্রী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্লাটফর্মের আপে চলেছে। ও মশাই টিকিট দিয়ে যান, টিকিট দিয়ে যান। নাঃ কথা কানেই তোলে না। এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আমি পিছন পিছন ছুট্‌লাম, থামুন, থামুন, টিকিট কোথায়? কে কার কথা শোনে? সে সোজা হেঁটে হন হন ক'রে চলেছে। বুঝলাম W. T. না হ'য়ে যায় না। এমন বেয়াড়া যাত্রীও দেখিনি। আমাদের মধ্যে বোধকরি দশ গজের তফাৎ। লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে গিয়ে মাটিতে নামলো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালাবে মৎলব। বলতে ভুলে গেছি, লোকটার হাতে ছিল একটা পুঁটুলি। আমিও প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে মাটিতে নামলাম। ভাবলাম গা ঢাকা দেবার জায়গা বটে, এক অন্ধকার তাতে এক বুক আগাছা, মাঝখানে ঘুরঘুট্টি পাকিয়ে মস্ত এক কাঁটাল গাছ!

—লোকটা পালালো নাকি? এদিকে ওদিকে খুঁজছি, কোথাও নেই, ডাকাডাকি করছি, এমন সময়ে দেখি সেই পুঁটুলি, ঠিক কাঁঠাল গাছটার নীচেই। তবে পালায়নি, কাছেই কোথাও আছে! কিন্তু গেল কোথায়? এমন সময়ে মাথা তুলে দেখি কাঁঠাল গাছের ডালের উপরে বসে, অন্ধকারেও ভুল করিনি,

সেই লোকটা ; আমাকে দেখেই হি হি করে হেসে উঠল ! সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ! নেমে আসুন, এখনি নামুন ! আপনাকে চালান না দিয়ে ছাড়ছিনে !

আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই হি হি হাসি। ভাবছি গাছে উঠবো না কি ? এমন সময়ে শুনতে পেলাম, আমাদের পয়েন্টসম্যান কিষণলাল চীৎকার করছে—বাবু ঘুমকে আইয়ে, উধার মৎ যাইয়ে। বুঝলাম বেটাকে দু'চার আনা দিয়ে বশ করেছে।

এবার মাস্টারবাবুর আওয়াজ পেলাম—ওহে ছোকরা ফেরো, ফেরো। তাকিয়ে দেখছি লণ্ঠন নিয়ে মাস্টারবাবু আর কিষণলাল হন্ হন্ করে আসছেন।

—ওদিকে গাছের ওপরে সেই হি হি ! এখন গা শিউরে উঠ্‌ছে তখন গা জ্বলে যাচ্ছিল। ভাবলাম ওরা আসবার আগেই লোকটাকে ধরতে হবে, কিন্তু তাকিয়ে দেখি লোকটাও নেই হাসিও থেমেছে। আবার পালিয়েছে।

—ইতিমধ্যে কিষণলাল এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, বাবু জিউ নিকাল জায়েগা।

—প্রাণে মরবে নাকি ছোকরা !

কিষণলাল হিড় হিড় করে আমাকে টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে ফিরলো সঙ্গে মাস্টারবাবুও ফিরলেন।

—মাস্টারবাবু বললেন, ছোকরা, আর একটু হ'লে প্রাণে মরতে যে।

—কেন, একথা বললেন কেন ? ঐ সব পাজি W. T.-কে শাসন না করলে—মাস্টারবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, বসো বসো সব বলছি। যা কিষণলাল বাবুর জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়।

—তারপর গলা খাটো করে বললেন, কাকে ধরতে গিয়েছিলে ? ও কি মানুষ ?

—মানুষ নয় ! তবে কি ?

—ঐ যা হয়, রাতের বেলায় নামটা আর নাই করলাম।

—কি বললেন আপনি ?

—মাস্টারবাবু বললেন, আজ যে ১লা ডিসেম্বর তা মনে ছিল না. নইলে তুমি newhand তোমাকে মনে করিয়ে দিতাম। প্রত্যেক বছর ১লা ডিসেম্বর ঐরকম দেখা যায়।

—কেন ১লা ডিসেম্বর কেন ?

—শোনা যায় যে, লোকটা ছিল কোন সদাগরী আপিসের কেরাণী। এখান

থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতো। এক বছর ১লা ডিসেম্বর আপিসের সাহেব তাকে বরখাস্ত করে—সে পুঁটুলি হাতে করে ট্রেন থেকে নেমে ওখানে পুঁটুলি রেখে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

—তবে কি ও মানুষ নয় ?

—এতক্ষণে বুঝলে নাকি ?

—এতক্ষণেই বুঝলাম, কারণ এবারে এইমাত্র গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল, আরও একটু পরে বুঝলাম গলার কলার ভিজে উঠেছে। কিষাণলাল চা নিয়ে এলো।

এবারে চটকা ভাঙিয়া উঠিয়া মাস্টারবাবু আমাকে বলিলেন, এবারে বুঝতে পারছেন কেন ১লা ডিসেম্বর তারিখটা মনে আছে। সেই থেকে মশাই W T. ধরবার অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। রাত্রি তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও আর চেষ্টা করিনে। টিকিট দিলে ভালো না দিলে কি করবো। প্রমোশনের জন্য প্রাণটা কে দেবে মশাই।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপরে তিনি প্রবোধবাবুর উদ্দেশ্যে বলিলেন—তাই বলছি, যতটা বয়সয় করবে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়। আজ অন্ধকারে পিছন পিছন বাদামতলা পর্যন্ত গিয়ে ভালো করনি।

আড়চোখে দেখিলাম প্রবোধবাবু ও তাহার বন্ধুর মুখে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের ছায়া মিলিতভাবে পড়িয়াছে।

চারজনেই নীরব। কতক্ষণ এইভাবে কাটিত জানি না—এমন সময়ে ঠনক ঠনক করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রবোধবাবু টেলিফোনে কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রামশরণ—টুয়েলভ আপ সিগন্যাল দে।

এতক্ষণ পরে আমরা পুনরায় বাস্তবজগতে ফিরিয়া আসিলাম।

আয়নাতে

বহুদিন পরে অরুণের চিঠি পাইলাম। এম-এ পাশ করিবার পরে রংপুর জেলায় তাহার বাড়ীতে সে চলিয়া যায়—তারপর হইতে আর দেখা হয় নাই, লোকমুখে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ পাইতাম বটে—চিঠি পাইলাম এই প্রথম। এম-এ পাশ করিবার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। অরুণের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছি, সে কেবল সহপাঠী মাত্র ছিল না, কলেজে পড়ার সময়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। তারপরে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তাহার সাংসারিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না; জানিতাম যে সে জমিদারপুত্র, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আমি এখন ইস্কুল মাষ্টারি করি।

কিন্তু পাঠ্যজীবনের বন্ধুত্ব প্রায়ই কর্মজীবনের প্রবাহে ছিন্ন হইয়া যায়—তাই অরুণের নীরবতাকে সংসারের অনিবার্য নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার পত্র আসিল।

অরুণ পুরানোদিনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া আসন্ন বড়দিনের ছুটিতে আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, কলিকাতার জীবনে তুমি অভ্যস্ত এখানে পাড়াগাঁয়ে আসিলে তোমার নিশ্চয় খুব ভালো লাগিবে।

কথাটা মিথ্যা নয়, পাড়াগাঁয়ের প্রতি নিষিদ্ধ ফলের ন্যায় একটা আকর্ষণ আমার আছে।

সে আরও লিখিয়াছে যে, তোমাকে পাড়াগাঁয়েই কাটাইতে হইবে না, ভ্রমণের প্রচুর অবকাশও পাইবে। সে জানাইয়াছে যে, জলপাইগুড়ি জেলায় সে একটি চা-বাগান কিনিয়াছে, আমি পৌঁছিলে আমাকে লইয়া সেখানে বেড়াইতে যাইবে। অরুণের চিঠিতে আছে—"ভাবিওনা যে চা-বাগানের কাঠের ঘরে তোমাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে—এখানে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ীও ছিল, সেটাও কিনিয়াছি। কাজেই তুমি আরামেই কাটাইতে পারিবে। বাঘ-ভালুকের ভয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না।

সে-অঞ্চলের দৃশ্যের মনোরমতা উল্লেখ করিয়া নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে এমন সুন্দর দৃশ্য অন্যত্র দেখিতে পাইবে না।

নাঃ যাইতেই হইল দেখিতেছি। এতখানি লোভ সংবরণ করিবার কোন হেতু নাই। পাকাবাড়ীর ছাদে নিরাপদে বসিয়া পাহাড়, বন-জঙ্গল দেখিবার লোভ সংবরণ করা সত্যই কঠিন। বিশেষ অরুণের প্রতি চিরকালই আমার একটা আকর্ষণের মতো ছিল—সেটাও অন্যতম কারণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়েও গভীরতর আকর্ষণ। অতএব বড়দিনের ছুটিতে যাওয়াই স্থির করিলাম এবং পত্র-যোগে সে কথা অরুণকে জানাইয়া দিলাম।

যথা সময়ে রংপুর জেলায় উপস্থিত হইলাম, অরুণ গাড়ী লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। অরুণ বলিল—এসো সোজা গাড়ীতে চড়া যাক—৫।৬ মাইল পথ যেতে হবে।

কাঁচাপথে টমটম গাড়ী ছুটিতে লাগিল, এবারে দু'জনে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ পাইলাম।

অরুণ বলিল—তুমি আসাতে কত যে খুশী হয়েছি বলতে পারিনে।

খুশী অবশ্যই সে হইয়াছে নতুবা কাঁচাপথে শেষরাত্রে স্টেশনে আসিত না।

সে বলিল—তোমার কি শরীর খারাপ? এত রোগা হয়ে গিয়েছ কেন?

বলিলাম, অনেকভাবে এর উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু সবচেয়ে প্রাঞ্জল উত্তর এই যে, ইস্কুলমাষ্টারি করি।

সে হাসিল, বোধকরি মনের ব্যথাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই, বলিল, এযাত্রা কদিন থেকে যাও, তারপর মাঝে মাঝে এসো, শরীর সারবে।

অরুণের চেহারায় বড় পরিবর্তন ঘটে নাই, শুধু স্বাস্থ্যের রং লাগিয়াছে, বুঝিলাম, স্বাস্থ্যের মূলে আছে সচ্ছলতা।

তারপর চলিতে চলিতে অনেক কথা হইল, প্রথমেই সে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার নাম সংগ্রহ করিয়া লইল। সে এখনো বিবাহ করে নাই, আমি অনেক-দিন করিয়াছি, ইস্কুলমাস্টার বিবাহের চেয়ে গুরুতর আর কীই বা করিতে পারে।

দু'দিকে ধান-কাটা, শিশির-পড়া সবুজ মাঠ। অরুণের লিখিত পাহাড় দেখিবার আশায় এদিক-ওদিক চাহিলাম—।

অরুণ আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঐ দিকটায় গারো পাহাড়।

অন্য দিকের সহিত সেদিকের প্রভেদ বুঝিলাম না, তবু বলিলাম—ও: অর্থাৎ দেখিতে পাই আর না পাই—অতবড় সত্যটাকে অস্বীকার করি কি প্রকারে?

ধরলা নদীর তীরে কচুয়া গ্রামে অরুণদের বাড়ী। ঘণ্টা দেড়-দুই সময়ের

মধ্যে সেখানে পৌছিলাম। আদর আপ্যায়ণের অভাব হইল না যেহেতু অরুণ নিজে উপস্থিত, আবার বাড়াবাড়িও হইল না যেহেতু মা-মাসির দলের অভাব। অরুণ সংসারে একাকী, একদিকে এখনো বিবাহ করে নাই, অন্তদিকে পিতা-মাতা অনেকদিন গত হইয়াছে।

তাহার বাড়ীঘর ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে আগে যেমন কল্পনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভালো, ইস্কুলমাস্টারের কল্পনা তো, ভরসা করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিকাল বেলা অরুণ বলিল—সুবোধ তোমাকে এখানে রাখবার জন্তে আনিনি, কাল আমাদের রওনা হ'তে হবে।

অবশ্যই হইবে, তবু অত নির্বিকার হইলে চলে না, শুধাইলাম, কোথায়?

—সেই যে চা-বাগানের কথা লিখেছিলাম।

—ও:

—সেখানে পাহাড়, বন-জঙ্গল সমস্তই পাবে।

আরো কিছু পাবো তো?—অর্থাৎ বাসস্থান, আহার্য ইত্যাদি। অরুণ যখন সঙ্গে থাকিবে ওসব চিন্তা ও অবশ্য করিয়াছে।

অরুণ বলিল,—এস্টেটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী আছে, সাধারণতঃ চা-বাগানে যেমন বাড়ী হয়—মোটেই তেমন নয়।

কি বলা উচিত ভাবিতেছি।

অরুণ বলিল—ও বাগান আর বাড়ী দুই-ই ছিল এক সাহেবের। সে হঠাৎ, না, বিলেতে চলে গেল, আমরা সস্তায় সব কিনে নিয়েছি।

অরুণের সস্তা আর ইস্কুলমাস্টারের সস্তা খুবসম্ভব কাছাকাছি নয়, তাই অঙ্কটার পরিমাণ আর জানিতে চাহিলাম না।

অরুণ বলিল—এখন ওখানে চমৎকার স্বাস্থ্য। আর নানা রকম বুনো পাখী পাওয়া যায়, কত খাবে? এর পরের বার তোমার ছেলেমেয়েদের এনো।

এক একজন লোকের স্বভাব পরের ভালো করিতে পারিলে আনন্দ পায়—অরুণ সেই জাতের।

—তবে কালই যাত্রা করা ঠিক? কি বলো?

আমি বলিলাম, আমি তো কল্‌কাতা থেকেই যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি—আমার আবার কিসের আপত্তি?

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে অরুণ প্রস্থান করিল।

অরুণ মিথ্যা বলে নাই, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের কেমন লাগিবে জানি না, কিন্তু বাংলা দেশের সমতল দৃশ্য-দেখা চোখের তৃষ্ণা আর মিটিতে চাহে না। অদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সারি উঁচুনীচু হইয়া ধূসর দিগন্তের শেষসীমা পর্যন্ত প্রসারিত, আর ঐ পাহাড়ের পাদদেশ হইতে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি উঁচু-নীচু শ্যামল মাঠ, নিকটেই একটা ছোট্ট পাহাড়ে নদী, এত ছোট যে, নামকরণের কষ্টস্বীকার কেহ করে নাই। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা অরুণের চা-বাগান। এক সময়ে বাগান ছিল বটে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জঙ্গলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। মাঝখানে একটি পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রাসাদ বলিলেও হয়, কেল্লা বলিলেও ক্ষতি নাই। এত বড় বাড়ী এখানে কে তৈয়ারী করিল, কেন তৈয়ারী করিল—অদ্ভুত!

বাড়ী যে-ই তৈয়ারী করুক তাহার সখ ও রুচি দুই-ই ছিল। সভ্যতার এই প্রান্তে নির্মিত বাড়ীটিতে আরামের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। ছিল না বলাই উচিত, কারণ এখন অনেকদিন অব্যবহৃত পড়িয়া থাকায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অরুণ বলিয়াছিল যে, কোন এক সাহেব চা-কর বাগানের মধ্যে বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়াছিল—তার পরে সস্তায় বিক্রয় করিয়া দিয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।

অরুণ বলিল,—সুবোধ, আজ সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, তার উপরে আবার দুজনেই পথের কষ্টে ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম করা যাক,—কাল তোমাকে নিয়ে বের হবো, ঐ পাহাড়টার কাছে যাবো—ওখানে একটা চমৎকার ঝরণা আছে।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল।

অরুণ বলিল—চলো, তোমাকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

তেতলার একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ—সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাদের বাকি অংশ খোলা, একদিকে একটি গম্বুজ—তার মধ্যে নীচতলা হইতে বরাবর একটা সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে; অবশ্য বাড়ীর ভিতরের দিকেও আর একপ্রস্থ সিঁড়ি আছে।

তেতলার ঘরটি বেশ প্রশস্ত. ঘরের মধ্যে মূল্যবান মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আর টেবিলের উপরে মস্ত একখানি আয়না। টেবিলের উপরে

দুইদিকে মোমবাতিদান। এ সমস্তই পুরানো আমলের অর্থাৎ বাড়ী যে তৈয়ারী করিয়াছিল—এগুলিও তাহারি আমদানী।

শীতের আটটা রাত্রিই অনেক, তারপরে পথশ্রমের ক্লান্তি; কাজেই অরুণ বিদায় হইবামাত্র মোমবাতি দু'টা নিভাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া লেপ টানিয়া লইলাম; নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমেই লক্ষ্য হইল ঘরটা আলোকিত, ভাবিলাম আমি তো মোমবাতি নিভাইয়া শুইয়াছিলাম, আলো জ্বালিল কে? মনে হইল হয় তো কোন কারণে অরুণ ঘরে ঢুকিয়াছিল—সেই জ্বালিয়া থাকিবে।

মাথা ফিরাইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ না খোলা। বন্ধ বলিয়া মনে হইল। এবারে টেবিলের দিকে তাকাতেই—ওকি! আয়নার কার ছায়া? একি চোখের ভ্রান্তি না সবটাই স্বপ্ন? চোখের ভ্রান্তি হইতে পারে—কিন্তু স্বপ্ন নিশ্চয় নয়, আমি যে জাগ্রত তাহাতে সংশয় নাই।

ছায়ার পিছনে কায়া না থাকাও যে সম্ভব একথা তখন আমার মনে হয় নাই, মনে হইবার কারণও ছিল না, কাজেই ভাবিলাম এতরাত্রে এই অপরিচিত লোকটা আমাকে বিরক্ত করতে ঘরে ঢুকিল কেন? কে এই লোকটা? পোষাক ও গায়ের রং দেখিয়া সাহেব বলিয়াই মনে হইল, সুতরাং ইংরাজী শুধাইলাম—তুমি কে?

ছায়া কোন উত্তর দিল না, এমনকি আমার প্রশ্ন শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না, এমনি এক দূরাবস্থিত নির্লিপ্তভাব তাহার মুখে-চোখে। তাহার অবজ্ঞায় আমার বিষম রাগ হইল—তখন আমি উঠিয়া বসিয়া কায়াকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে ঘাড় ফিরাইলাম। কিন্তু কায়া কোথায়? লোকটা মুহূর্তে পলাইল নাকি? ঘুরিয়া দেখিলাম আয়নার ছায়াটি অবিচলভাবে বিদ্যমান! একি, কায়া নাই, ছায়া!

আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া আসিল, আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শুইয়া পড়িলাম। কায়ার চেয়ে ছায়াকে যে মানুষের বেশী ভয়—এই প্রথম বুঝিলাম।

আমি যে ঘর ছাড়িয়া পালাইব, কিম্বা অরুণকে ডাকিব—সে শক্তিও হারাইয়া ফেলিলাম। সেই শীতের রাত্রে শীতল ঘামে আমার শরীর ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল ছায়ার দিকে তাকাইব না—কিন্তু সাধ্য কি ? ঐ ছায়ার দিকেই তাকাইতে বাধ্য হইতেছি—এরূপ ক্ষেত্রে ছায়াকে উপেক্ষা করিয়া অন্যদিকে তাকানো মোটেই সম্ভবপর নয়।

একবার চোখ ফিরাই, আবার তখনই আয়নার দিকে তাকাই, এক একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখি ছায়া আছে না মিলাইয়াছে।

আশ্চর্য ! ছায়া একবারও আমার দিকে চাহিতেছে না, তাহার পক্ষে আমি যেন নাই। কেন জানি না, একটু একটু করিয়া সাহস ফিরিতেছিল, বোধকরি ভয়ের চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিলে স্বভাবের নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বলিয়াই হইবে ; বোধকরি অভ্যস্ত ভয় আর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয় না বলিয়াই হইবে ; কিম্বা ছায়ার মুখে-চোখে এমন কিছু ছিল যাহাতে আমার বুদ্ধির অতীত সত্তা বুঝিয়াছিল যে, ভয়ের কারণ নাই।

সেই ছায়ার মুখে যে নৈরাশ্য ও বেদনার ছাপ—তেমন কোন জীবন্ত মানুষের মুখে কখনো দেখি নাই। ছায়াটি যেন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া কত কি চিন্তায় মগ্ন !

এবারে দেখিলাম পকেট হইতে একখানা ক্ষুর বাহির করিল, এবং আমি বাধা দিবার পূর্বেই (ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, বাধা দেবার শক্তি আমার নাই) নিজের গলায় ক্ষুরখানা আমূলবিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ হইয়া গেল, শাদা সার্টের বক্ষদেশ রক্তে ভাসিয়া গেল এবং ছায়াদেহ মৃতদেহের মতো মাটিতে পড়িল।

এতক্ষণ আমি মুগ্ধবৎ সব দেখিতেছিলাম—হঠাৎ এবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া, দরজা খুলিয়া একদৌড়ে বাহিরে ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো পূর্বদিকে উষার পূর্বাভাস জাগে নাই, কেবল ভোরের প্রথম ফিঙাটি কুণ্ঠিত ডাক সুরু করিয়াছে। আমি সোজা অরুণের দোতলার শয়নকক্ষের বন্ধ দরজায় আসিয়া ধাক্কা মারিলাম—ওঠো, ওঠো।

চা-পানের পর অরুণকে বলিলাম—কি, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি !

অরুণ বলিল—যা নিজেও দেখেছি তা বিশ্বাস না করবার হেতু নাই।

—তুমি দেখেছ ?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে ?

—তুমি যেমন ক'রে দেখলে, ঐ ঘরে শুয়েছিলাম।

—তবে জেনে শুনে আমাকে ওঘরে শুতে দিলে কেন ?

—আমি ভেবেছিলাম যা দেখেছি তা আমার মনের ছলনা মাত্র অর্থাৎ গল্পে যা শুনেছিলাম রাত্রে তাই দেখলাম, ভাবলাম সবটাই সাব্জেকটিভ—

—ও: তাই আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করে নিলে ?

—সত্য ভাবলে তোমাকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতাম না। ভেবেছিলাম সবটাই গল্প।

—কার কাছে শুনলে গল্প ?

—সাহেবের চাপরাশির কাছে, সব ব্যাপার সে নিজ চোখে দেখেছিল।

—কোন্ সাহেবের চাপরাশি ?

—যার এই বাড়ী ছিল।

—সবটা গুছিয়ে বলো শুনি।

অরুণ আরম্ভ করিল—বাড়ীটা ক'রেছিল মিঃ টমাস। চা-বাগানও ছিল তার। দূরে দূরে আরও অনেক চা-বাগানের মালিক ছিল সে। স্ত্রী ছাড়া আর তার কেউ ছিল না। একদিন কলকাতা থেকে সাহেবের এক বন্ধু এসে হাজির হ'ল, মিঃ টমাস স্ত্রীর উপর তার আতিথ্যের ভার দিয়ে হঠাৎ দার্জিলিঙে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। যেমন হঠাৎ যাওয়া তেমনি ফেরাও হঠাৎ। এসে দেখল, আতিথ্যটা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চলেছে। টমাসের রুদ্রমূর্তি দেখে বন্ধুতো তখনি পলাতক—স্ত্রী আর কোথায় পালাবে।

—তার পরে ?

—তার পরে সেই রাত্রেই টমাস তেতলার ঐ গম্বুজের মধ্যে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

—হত্যা ?

—হ্যাঁ, গুলী ক'রে মারে, তারপরে নিজেদের শয়নঘরে এসে, ওটাই শোবার ঘর ছিল, গলায় ক্ষুর বাধিয়ে আত্মহত্যা করে।

—এ সব দেখলো কে ?

—ঐ যে বললাম সাহেবের চাপরাশি। সে সব প্রত্যক্ষ দেখেছিল।

—এ কতদিনের আগের কথা ?

—প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—বাড়ী তো কিনেছ মাত্র বছর খানেক।

—হ্যাঁ, ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়ীটা পড়েই ছিল, চা-বাগান করবার শখ হওয়ায় কিনেছি।

—সে চাপরাশিকে পেলে কোথায় ?

—সাহেব তাকে কিছু জমি কিনে দিয়েছিল—৪/৫ মাইল দূরে একটি গ্রামে সে থাকতো।

—তার মানে এখন নেই ?

—না, অল্প কয়েক মাস আগে লোকটা মরেছে।

—তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি ক'রে ?

—আমি বাড়ী কিনেছি শুনে দেখা করতে এসেছিল, তার কাছেই গল্পটা শুনেছিলাম।

—একে এখনও গল্প বলছ কেন ?

—হ্যাঁ, দু'জনের চোখে যখন যাচাই হ'য়ে গেল, তখন আর গল্প বলা উচিত নয়।

—তুমি কি দেখেছিলে ?

—তুমি যা কাল দেখেছ। তবে আগে গল্পটা শুনেছিলাম বলে বিশ্বাস করিনি। আর পাছে তুমি গল্প শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হও তাই আগে তোমাকে বলিনি।

দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম। অরুণ বলিল, শোবার ঘরে ঘটনার যেটুকু দেখলে তার পূর্বার্ধ—

—অর্থাৎ স্ত্রীকে হত্যা ?

অরুণ বলিল,—হ্যাঁ, ঘটেছিল গম্বুজের মধ্যে; শুনেছি সেই নিদারুণ অংশটুকুরও ছায়াভিনয় চলে প্রতি রাত্রে ঐ গম্বুজের অন্ধকারে।

—কি ক'রে জানলে ?

—আমাদের সরকার মশাই কি যেন দেখেছিলেন।

—কি ?

—তা ঠিক তিনি বলতে পারলেন না, ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—যাবে আজ রাত্রে ? চেষ্টা করবে দেখতে ?

আমি বললাম—চলো।

স্থির হইল দু'জনে আজ তেতলার ঘরে শয়ন করিব—এবং রাত্রি গভীর হইবামাত্র একটা টর্চবাতি সঙ্গে করিয়া গম্বুজে প্রবেশ করিব—দেখা যাক্—আর কি ছায়ারহস্য প্রকাশ পায়।

দু'জনে সারাদিন শঙ্কাময় রহস্যের আবহাওয়ায় দণ্ডপল গুণিতে লাগিলাম—কখন সন্ধ্যা হয়, কখন রাত্রি হয়।

কিন্তু আমাদের আশঙ্কাময় আশা পূর্ণ হইল না। হঠাৎ বিকেল বেলায় কলিকাতা হইতে জরুরী তার পাইয়া আমাকে তখনি রওনা হইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইল।

অরুণ বলিল—চলো, আমিও যাই, এ বাড়ীতে আর একা নয়।

—এখন বুঝি বুঝেছো যে, ওটা চোখের ছলনামাত্র নয়?

—ঠিক তাই।

সন্ধ্যার সময়ে দু'জনে স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। রাস্তা মোড় ফিরিবার আগে একবার বাড়ীটার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম ছায়ারহস্তময় বাড়ীটা নিরেট এক ছায়ার মত নীরবে দণ্ডায়মান। মানব জীবনের নিদারুণ একটা ট্রাজেডির সাক্ষী ঐ নীরব অট্টালিকা। প্রতি রাত্রে ওরই একান্তে সেই ট্রাজেডির ছায়াভিনয় চলিতে থাকে। কেন, কি উদ্দেশ্য, কে বলিবে?

তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, যে, সময় বিশেষে ছায়া কায়ার চেয়েও সত্যতর হইয়া উঠিতে পারে।

চিলা রায়ের গড়

আরে সেই কথাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

—আমরাও বুঝতে চেষ্টা করছি।

—তবে গোল বাধছে কোথায় ?

—তুমি বলছ ঐ আওয়াজ বাংলা দেশের কেবল দক্ষিণ অঞ্চলেই শুনতে পাওয়া যায়।

—তা বলছি বটে, তবে ঐ সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে রাজি আছি, বাংলা দেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে যে-শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তা কাছাকাছি অন্য প্রদেশের সমুদ্রতীরেও শুনতে পাওয়া যেতে পারে। কাল্পনিক উদাহরণেই বা প্রয়োজন কি ? উড়িষ্যার কোন কোন স্থান থেকেও শুনতে পাওয়া যায় বলে রিপোর্ট পেয়েছি।

—কিসের রিপোর্ট পেলে হে ? এখানে এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যে এসেও রিপোর্টের হাত থেকে রক্ষা নাই।

অরবিন্দ প্রবেশ করিয়া কথাগুলি বলিল।

আমরা দুইজনেই বলিয়া উঠিলাম, এসো অরবিন্দ। এতক্ষণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, চলো বেড়াতে বেরুবার সময় হয়ে গিয়েছে।

—তা তো হয়েছে, কিন্তু কিসের রিপোর্ট না শুনে বেড়াতে যাচ্ছি না।

—তা না হয় বেড়াতে বেড়াতেই হবে, কি বলো ?

—সে মন্দ নয়, চলো।

তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রিপোর্ট-রহস্যে নামিবার আগে আমাদের তিনজনের যে পরিচয়টুকু গল্পের পক্ষে অপরিহার্য, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

আমি সরকারী জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের অফিসার। কিছুদিন ঘোরতর খাটুনি গিয়াছে। এখন বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি, আমার বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের আশ্রয়ে। অরবিন্দ প্রবোধের বন্ধু ও প্রতিবেশী। দুজনেরই অনেকগুলি করিয়া চায়ের বাগান আছে, কাঠের ব্যবসাও আছে, তাছাড়া প্রচুর চাষের জমির তারা মালিক, এসব অঞ্চলে জমির দুর্ভিক্ষ নাই।

প্রবোধের আশ্রয়ে আগেও একাধিকবার আসিয়াছি, কাজকর্মের চাপে পীড়িত হইয়া এই নির্জনপ্রায় স্থানে আসিয়া কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকি।

এবারেও ফাল্গুনের প্রথমে আসিয়াছি—ইচ্ছা আছে ভালোভাবে গরম না পড়িলে ফিরিব না।

এখানে আমার প্রধান কাজ পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানো; বিকাল বেলায় প্রবোধ ও অরবিন্দর সঙ্গে নদীর ধার বরাবর বেড়ানো; তাহাদের অবকাশের দিনে কাছে-ভিতে যেসব পাহাড় ও জঙ্গল আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা; আর প্রচুর খাদ্য গ্রহণ ও প্রচুরতর গল্প-গুজব করিয়া আড্ডা জমানো।

স্থানটি কুচবিহার ও আসামের সীমান্তে, পল্লীর চেয়ে বড়, শহরের চেয়ে ছোট। ভূভারতে এতস্থান থাকিতে এই জায়গাটিতে যে বারংবার আসি তার কারণ, একবার দেখিলে পাঠক তুমিও ঘুরিয়া আসিতে। এমন নদী, পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুসজ্জিত, অথচ লোকালয়ের সুখসুবিধা সম্পন্ন নির্জন স্থান আমি তো আর দেখি নাই।

কাল—ফাল্গুনের প্রথম, শীত বেশ প্রবল।

—কি হে, কিসের রিপোর্ট। বেশ নির্জন জায়গা, মন খুলে বলো কেউ শুনে ফেলবে সে ভয় করো না।

—তবে শোন।

এই বলিয়া আরম্ভ করিলাম।

—জিওলজিকাল সার্ভেতে মানুষে যেন না ঢোকে। জগতে যেখানে যত বনবাদাড়, পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র আছে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হবে। একবারের কথা মনে আছে। অনেকদিন আগের ঘটনা, গিয়েছিলাম আসামে মিশমি পাহাড় জরিপ করতে, বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, সাত দিনের মধ্যে নিজের দলের কটি লোকের মুখ ছাড়া মানুষের মুখ দেখিনি, এমন কি একটা আদিবাসীর মুখ পর্যন্ত না। এমন চাকরি মানুষে করে? ছিঃ ছিঃ।

—এই কি তোমার রিপোর্ট নাকি?

—তুমি দেখছি রিপোর্ট না শুনে নিতান্তই ছাড়বে না, বলছি, বলছি। এবারে কিছুদিন আগে যে বড়সাহেব বিলাত থেকে এসেছেন তাঁর আবার বিজ্ঞানের বাতিক আছে। তিনি ওদেশে থাকতেই, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে তোপধ্বনির মতো যে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় সাধারণে যাকে 'বরিশাল গান' বলে থাকে, তার সংবাদ শুনেছিলেন। আফিসে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, রায়, তুমি বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক, তাতে সিনিয়ার

অফিসার, ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে চেষ্টা করো না কেন! সাহেব বললেন, তোমাকে যথেচ্ছ সুবিধা দেবো—কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক বিস্ময়ের একটা কিনারা হওয়া আবশ্যক।

—বোঝা একবার ঠেলা! আমি একে বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক তাতে সিনিয়র অফিসার, একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যুক্ত, কাজেই আমার স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি গেল! সাহেব বলেছেন—অন্য যে কোন দেশে হলে এজন্য কত টাকা খরচ হ'ত লোকের মনে কত উৎসাহ হ'ত! এমন ক্ষেত্রে আমার আগ্রহে শৈথিল্য নিতান্তই অমার্জনীয়। তাতে বড় সাহেব সত্যসত্যই সাহেব অর্থাৎ বিদেশী। হ'ত দেশী বড সাহেব, একবার দেখে নিতাম।

—ওসব শুভ সঙ্কল্প থাক, কি করলে শুনি।

—কি আর করবো। বের হয়ে পড়লাম। বঙ্গোপসাগরের তীর বরাবর ঘোরা শুরু হ'ল। কখনো স্টীমারে, কখনো রেলে, কখনো নৌকায়, কখনো কখনো মোটর গাড়ী ব্যবহারও করেছি। তখন বর্ষাকাল, কষ্টের একশেষ।

—শীতকালে বেরুলে এত কষ্ট হ'ত না।

—কিন্তু তার উপায় কি। বড সাহেব যে বৈজ্ঞানিক। তিনি শুনেছেন 'বরিশাল গানের' আওয়াজ বর্ষাকালেই প্রবল হয়ে থাকে।

—কি রকম প্রবল আওয়াজ শুনলে?

—প্রবল যে সন্দেহ নেই। বরিশাল থেকে খুলনার মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল, চব্বিশ পরগণার দিকে তুলনায় কম। এক একদিন রাত্রে ঘুম হ'ত না। যেমন গম্ভীর, তেমনি ঘন ঘন! মনে হ'ত পৃথিবীর কোন্ সুগভীর থেকে ওঙ্কার ধ্বনি উঠছে। মনে হ'ত একসঙ্গে সহস্র কামান যেন গর্জাচ্ছে!

—ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক।

—এ অঞ্চলের সাধারণ লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলতে পারো কিছু? কেউ বলে নদীর স্রোতে আর সমুদ্র-তরঙ্গে ঠোকাঠুকির শব্দ, কেউ বলে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে অতলস্পর্শী সব গহ্বর আছে তারই মধ্য থেকে উঠছে, সবাই বলে জন্ম থেকেই আওয়াজ শুনছে, আর বলে যে আসল কারণ কেউ জানে না।

—তাদের যখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তো মাছ ধরতে সমুদ্রের জলে যাও, কিছু হদিস পাও না?

—তারা বলে আমরা কি লেখাপড়া জানি কর্তা? একজন বলল আমরা একবার স্রোতের টানে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন আওয়াজ শুনেছিলাম উত্তর দিকে।

—আর অন্য সময়ে?

সে বলল—এখন যেমন শুনেছি, দক্ষিণ দিকে, কখনো পূব-ঘেঁষা দক্ষিণ, কখনো পশ্চিম-ঘেঁষা দক্ষিণ। সেই একবার উত্তর দিকে শুনেছিলাম।

—বুঝলে প্রবোধ এইভাবে তিন মাস কাটলো।

—সিদ্ধান্ত কি করলে?

—যথা পূর্বং তথা পরম্। তবে এটুকু বুঝলাম যে ঐ শব্দের সঙ্গে সমুদ্রের একটা যোগাযোগ আছে। কারণ সমুদ্রতীর ভিন্ন শুনতে পাওয়া যায় না।... ওটা কিহে? নদীর ওপারে?

প্রবোধ। ওঃ কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি। তুমি এদিকে বুঝি আগে আসনি? ওটা চিলা রায়ের গড।

আমি। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি কালো। যেন অমাবস্যার পাথর কেটে গড়া হয়েছে।

প্রবোধ। প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, তবে কালো নয়, অন্ধকার বলেই কালো দেখাচ্ছে।

এতক্ষণে হুঁশ হইল। চারিদিকে আলকাতরা-গোলা অন্ধকার। এমন সূচীভেদ্য নিরেট যে, ক্ষণে ক্ষণে জোনাকীর ফুলকাটা না হইতে থাকিলে অন্ধকারের প্রতীতি হইত কিনা সন্দেহ।

অরবিন্দ। আজ আবার অমাবস্যা। চল ফিরি।

সকলে ফিরিলাম। বাড়ীর কাছে আসিয়া অরবিন্দ বলিল, আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই, আমি চললাম।

সে চলিয়া গেলে আমরা দুইজনে বাড়ীতে ঢুকিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিতেই পুরাতন প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রবোধ। সাহেবকে রিপোর্ট দিলে?

—সব খুলে বললাম।

প্রবোধ। সাহেব কি বলল?

—সাহেব বলল, প্রথমবার সম্পূর্ণ কিনারা না হলেই নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সাহেব বলল যে, আগামী বর্ষাকালে স্বয়ং সে বের হবে। বুঝলে প্রবোধ আমি তখন ছুটি নেবো।

প্রবোধ। সাহেব উৎসাহ পেলো কিসে?

—তা পাবেনা! ঐ শব্দের প্রসঙ্গে দুটো কারণ সুনিশ্চিত, কালটা বর্ষা, আর স্থানটা সমুদ্রোপকূল! ঐ দুটোর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আসল রহস্যটা।

—তোমার সাহেবকে এখানে নিয়ে আসতে পারো?

—কেন বলো তো।

—ঐ আওয়াজ শুনিয়ে দিতে পারতাম।

—এখানে? এই হিমালয়ের প্রান্তে?

—হাঁ, এবং তাও আবার বর্ষাকালে নয়, শীতকালে।

—'বরিশাল গান?'

—'বরিশাল গান' আর কেমন করে বলি, স্থানটা যখন বরিশাল বা তার কাছাকাছি নয়!

—সাহেব খবর শুনেই ছুটে আসবে, কিন্তু শেষে না অপ্রস্তুত হই।

—কেন?

—তুমি শুনেছো?

—এ অঞ্চলের সবাই শুনে থাকে।

—শুনে থাকে! আর মানে আওয়াজ প্রায়ই হয়!

—না, বৎসরে একদিন মাত্র।

—একটা দিন?

—বলা উচিত ছিল একটা রাত্রি।

—কিসের আওয়াজ?

—লোকে কামান গর্জন বলে থাকে!

—কি আশ্চর্য! এখানে? ঠিক কোথা থেকে ওঠে বুঝতে পারো?

—চিলা রায়ের গড়টা দেখেছ তো! ওখান থেকে।

—গড় থেকে?

—না, লোকদের ধারণা নদীর মধ্য থেকে সেদিন চিলা রায়ের কামান ওঠে।

—না, ভাই, তার সাহেবকে আনা চললো না দেখছি! এসব 'কামান ওঠা' রূপকথা বলতে গেলে আমার চাকরী থাকবে না।

—এটা ফাগুনের অমাবস্যা না হয়ে মাঘের অমাবস্যা হলে তোমাকে আজই শুনিয়ে দিতে পারতাম!

—রহস্য ক্রমেই ঘনতর হয়ে জমে উঠছে। কি জানো খুলে বল।

—তবে স্থির হয়ে ব'সো। যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা কারো প্রত্যক্ষ নয়, কারণ এ বহু শত বৎসর আগেকার কথা। সেই দূর সময় থেকে এই নিদারুণ স্মৃতি মুখে মুখে সঞ্চারিত হয়ে আজকার দিনে এসে পৌঁছেছে। মিথ্যা বলবার উপায় নেই—প্রত্যক্ষ প্রমাণ কামান গর্জন।

—কিংবা কামান গর্জনকে কেন্দ্র ক'রে একটা কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে।

—তবু কামান গর্জনটা থেকেই যাচ্ছে, আর তোমারও তো আগ্রহ ঐ ব্যাপারটা নিয়ে—

—গল্পটাতেও আগ্রহ অল্প নয়, কি জান জমিয়ে বলো।

—জমাবার প্রয়োজন হবে না, এ কাহিনী নাটকে আর চোখের জলে পূর্ণ।

—বলো, আর ভূমিকা নয়।

—তবে শোনো।

প্রবোধ গায়ে কাপড় জড়াইয়া বসিয়া আরম্ভ করিল। ঘরের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী, স্তিমিত আলোতে দেয়ালে মস্ত দুটি ছায়া, বাড়ি নির্জন, বাহির নির্জনতর, নিস্তব্ধতার আর অন্ধকারের যুগল আস্তরণে চরাচর নিরেট নীরন্ধ্র করিয়া জড়ানো।

—ঐ যে ভাঙা গড় দেখলে ওটা চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে ওটা নীলধ্বজ রাজার দুর্গ। চিলা রায় তার ছোট ভাই, তার প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ। সে ছিল নীলধ্বজ রাজার সর্বজয়ী সেনাপতি। চিলের মতো সে অতর্কিতে শত্রু সেনার উপরে গিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলতো, তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল চিলা রায়।

চিলা রায়ের বাহুবলে ভুটানের প্রান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র অবধি সমস্ত ভূখণ্ড বিজিত হয়েছিল—এই রাজ্যের অধিশ্বর ছিল বড় ভাই নীলধ্বজ। দুই ভাইয়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্য তেমনি সহযোগিতা ছিল। নীলধ্বজ ছিল সুশাসক রাজা,

তার শাসনে হিন্দু মুসলমানে, ভুটানী বাঙালীতে ভেদজ্ঞান করা হ'ত না, আর চিলা রায় ছিল বীর্যবান সেনাপতি। ভুটানীরা অনেকবার আক্রমণ করতে এসে তার হাতে মার খেয়ে ফিরে গিয়েছে, যেমন প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে দরং, কামরূপ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের সামন্ত রাজন্যগণ।

—চিলা রায়ের বীরত্বের রহস্য কি ছিল, পদাতিক না ঘোড়সোয়ার ?

—বীরত্বের আসল রহস্য নিহিত থাকে বীরের প্রকৃতির মধ্যে, ঘোড়সোয়ার, পদাতিক গৌণ। তবু প্রশ্ন তুলে ভালো করেছ।

চিলা রায়ের বীরত্বের সহায় ছিল—একটি প্রকাণ্ড কামান। কামান নাকি সতেরো হাত লম্বা ছিল, আর বসানো ছিল চারটা বড় বড় চাকার উপরে, টানবার জন্য জুড়ে দেওয়া হ'ত আট জোড়া ভুটানী ঘোড়া। কামানটার পাল্লা ছিল যেমন লম্বা, তেমনি তার গর্জন। সেই কামান যখন ডাকতো চার দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনি ক'রে ক'রে তার আওয়াজ ছুঁড়ে দিত দূর থেকে দূরান্তরে, সেখানে যত শত্রু আছে সতর্ক হ'য়ে যেতো। চিলা রায় তার কামানের নাম দিয়েছিল—কালু খাঁ।

কোথায় পেলো সে এই অমোঘ অস্ত্র কেউ জানতো না, এমন কি নীলধ্বজ রাজাও নাকি জানতো না, কিম্বা জানলেও ভাইয়ের গুপ্ত রহস্য সে কাউকে জানায়নি।

ঐ কামানটা নিয়ে তখন নানা রকম কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। কেউ বলে তরাইয়ের অরণ্যে গিয়ে মহাদেবের সাধনা করে কামানটা কিরাতরূপী মহাদেবের কাছে থেকে বর পেয়েছিল। কেউ বলে নেপাল না তিব্বত কোথাকার রাজা তার বীরত্বে খুশী হয়ে তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলে—ওটা ছিল আগেকার কোন্ এক মহাবীরের অস্ত্র। সেই বীরের মৃত্যুর পর কামানটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ডুব দিয়েছিল। একবার চিলা রায় চলেছিল দরং রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মাঝ পথে ব্রহ্মপুত্রের ধারে সে শিবির সন্নিবেশ করছে, সন্ধ্যা বেলা একাকী ঘুরছে সে নদীর ধারে, এমন সময় দেখতে পেলো যেন প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ উঠে আসছে জল থেকে। বিস্মিত হয়ে চিলা রায় ভাবছে, ব্যাপার কি ? এমন সময় দৈববাণী হ'ল—এই কামান নিয়ে যাও, তুমি সর্বত্র শত্রুজয়ী হবে। কামানের পূর্ববর্তী মালিকের শত্রু নাকি ছিল দরংরাজ! সেই থেকে, সেই কামান পাওয়ার পর থেকে চিলা রায় একেবারে অপরাজেয় হ'য়ে উঠল। লোকের

মুখে মুখে কালু খাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ; শত্রুরা কাছে ঘেঁষতো না, যারা তেমন দুঃসাহস দেখাতো, নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো কালু খাঁর কবলে। তখন দুই-ভাই নীলধ্বজ আর শুক্লধ্বজ নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসলো এই গড়ে—ভাবলো এবার সুখশান্তিতে রাজ্য শাসন করবে, যুদ্ধতো সুশাসনের লক্ষ্য নয়, তার অপরিহার্য ভূমিকামাত্র।

—এমন সময়ে ভূটানের দেব রাজার মৃত্যু হ'ল। নূতন রাজা নীলধ্বজকে বলে পাঠালেন।যে, তিনি উপঢৌকনাদি সহ নীলধ্বজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছায় দুই রাজ্যের সীমান্তের দিকে আসছেন। এ রকম দেখা সাক্ষাৎ দুই রাজ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝেই হ'ত। এতে নূতনত্ব কিছু ছিল না। বিশেষ নূতন সিংহাসন লাভ করবার পরে ভুটান রাজ যে দেখা করতে আসবেন, তা তো খুবই স্বাভাবিক।

চিলা রায় বলল—দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

নীলধ্বজ বলল—তার কি দরকার ভাই! এতো যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, মামুলী সৌজন্য মাত্র। তার চেয়ে তুমি দরং রাজ্যের দিকে যাও। দরং রাজ আবার আমার রাজ্য আক্রমণ করবার উদ্যোগ করেছেন বলে সংবাদ পেয়েছি।

তাই স্থির হ'ল। নীলধ্বজ প্রচুর উপঢৌকন ও কিছু লোকজন নিয়ে চলল সীমান্তের দিকে, আর চিলা রায় কালু খাঁকে নিয়ে চলল—আসামের পথে। তখন কে জানতো যে দুই ভাইয়ে সেই শেষ দেখা।

ভুটান সীমান্তে ভুটান রাজ ও নীলধ্বজের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল, উপঢৌকন বিনিময় হ'ল। ভুটান রাজ দেখল যে সঙ্গে চিলা রায় নেই, নেই তার অমোঘ কালু খাঁ। তখন সে সাহস পেয়ে সপরিচর নীলধ্বজকে বন্দী ক'রে সেখানেই হত্যা করলো। এ খবর চিলা রায়ের কাছে পৌঁছে দেবার লোকটা অবধি রইলো না। এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন চিলা রায় দরং রাজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। যেদিন দরং রাজ পরাজিত হ'ল জনশ্রুতি যোগে নিদারুণ দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছলো চিলা রায়ের কাছে। চিলা রায় তখন কালু খাঁকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হ'ল।

এ দিকে ভুটান রাজ নীলধ্বজের গড়ে এসে উপস্থিত হল। সমস্ত নরনারী স্ত্রী-পুরুষ সে হত্যা করলো—আর লুট তরাজ তো করলোই। এমন সময়ে তার কানে পৌঁছলো যে চিলা রায় আসছে। তখন সে নীলধ্বজের দুর্গ, যা এখন

চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত, তা ভেঙে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে দেশের অভিমুখে পলায়ন করলো।

ওদিকে চিলা রায় ষোলঘোড়াবাহিত কালু খাঁকে নিয়ে গড়ের কাছে এসে পৌঁছলো। তখন রাত্রি, সে রাত্রি আবার এমনি অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার। চিলা রায় দূর থেকে দেখলো, দুর্গ আর দুর্গ নেই ভগ্নস্তূপ, আপন প্রেতাত্মার মতো তার ভগ্নাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি গ্রামের লোকের নিকটে সব সংবাদ সে শুনল, শুনে সেই দুর্ধর্ষ বীর কামানের উপর বসে পড়ল। সেই প্রথম চিলা রায় হতাশ হ'ল, সেই প্রথম আর সেই শেষ। অনেকক্ষণ পরে উঠে চারিদিকে ঘু'রে ফিরে দেখল—আর কিছু করবার নেই, সত্যই সব শেষ।

লোকে বলল—ভুটান রাজাকে ভুটানে গিয়ে আক্রমণ করা যাক। কিন্তু চিলা রায় ভাবলো—তাতে কি ফলোদয় হবে? যুধিষ্ঠিরের মত ভাই কি ফিরবে? ফিরবে কি দুইজনের স্ত্রী-পুত্র কন্যা, ফিরবে কি অপহৃত সম্মান? তখন সেই অজেয় বীর, দিগ্বিজয়ী সেনাপতি লক্ষ্মণসম ভ্রাতা যা করলো, তা বীর ছাড়া কেউ করতে পারে না, আর ভগ্নহৃদয় বীর ছাড়াও কেউ করতে পারে না। সে নিজেকে কালু খাঁর সঙ্গে বেঁধে—ঐখানে, গড়ের কাছে ঐ নদীতে আত্ম-বিসর্জন করলো। কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল।

—ওখানে কি নদীতে অনেক জল?

—একেবারে অতলস্পর্শ। গ্রীষ্মকালেও দড়ি নামিয়ে নামিয়ে থই পাওয়া যায় নি। এই মাত্র বললাম যে কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল। কিন্তু ঠিক তা হ'ল না। প্রতি বৎসর মাঘী অমাবস্যার রাত্রে কালু খাঁ তীরে উঠে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে নাকি গর্জন আর গোলাবর্ষণ করে!

—গল্পই, তবে সে গর্জন অনেকেই শুনেছে। আমিও কতবার শুনেছি।

—বোধ করি মেঘের ডাক?

—মাঘ মাসে মেঘ কোথায়?

—আর কিছু হবে?

—আর কি হ'তে পারে?

—এ বছর মাঘ মাসে—

—কই এখনো শুনছি বলে মনে হয় না।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

—ও কি?

—ঐ তো কালু খাঁর গর্জন!

—কিন্তু আজ তো ফাল্গুন মাস!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখি—এই বলিয়া প্রবোধ ছুটিয়া গৃহান্তরে গেল এবং এক লহমার মধ্যে একখানা পঞ্জিকা হাতে ছুটিয়া আসিল, বলিল—এবারে মাঘী অমাবস্যা ফাল্গুনে পড়েছে।

গুড়ম, গুড়ম, গুম।

আমি একটা বিজলি বাতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ওকি, ওকি, কোথায় চললে?

ছুটিতে ছুটিতে বলিলাম—দেখি, কিছু দেখা যায় কি না?

আমার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে প্রবোধ বলিল—ফেরো ফেরো, ওদিকে আজ কেউ যায় না। কখনো, কখনো যারা গিয়েছে, তারা ফেরেনি!

—ওসব কুসংস্কার রাখো।

—দোহাই তোমরা ফেরো।

দুজনেই নদীর তীরে গড়ের অভিমুখে ছুটিতেছি।

কামান গর্জন ক্রমশঃ ভীষণতর হইতেছে, তার মানে আমরা নিকটতর হইতেছি।

একবার মনে হইল নদীর ওপারে একটা আগুনের মতো যেন দেখিলাম!

আরো কাছে আসিয়াছি। একবার মনে হইল গড়ের কাছে প্রকাণ্ড অজাগরী একটা বস্তু! বোধ করি আমার কল্পনামাত্র।

বিজলী আলোর পিকচারী ফেলিয়া দেখিলাম ওপারে অদূরে গড়ের ভগ্নস্তূপ আর কোথাও কিছু নাই। এবারে নদীগর্ভে আলো ফেলিলাম। নিবাতনিস্পন্দ জলতল আলোড়িত হইতেছে—খুব ভারি একটা পদার্থ এইমাত্র ডুবিয়া গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি!

তবে কি শত্রু নিধন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া কালু খাঁই ডুব দিল নাকি?

সেখানে অন্ধকার জলতলের ক্রমঃক্ষীয়মান আলোড়নের দিকে তাকাইয়া দুজনে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম, রহস্যের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

আজও পাই নাই, কিন্তু গর্জন যে মিথ্যা নয়, স্বকর্ণে যে শুনিয়াছি, তাহা খোদ সাহেবের সম্মুখেও সাহস করিয়া বলিতে পারি।

পাশের বাড়ী

সেবারে পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্যান্বেষীদের বড ভিড়। কাছাকাছির মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর যত শহর আছে সবগুলির সবগুলি বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে—অথচ লোক আসার বিরাম নাই! যাহারা বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছে তাহারা জায়গা পাইতেছে, যাহারা অমনি আসিতেছে স্টেশনে কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া অন্য স্থানে যাত্রা করিতেছে; বিরক্ত হইয়া অনেকে আবার কলিকাতাতেও ফিরিয়া যাইতেছে।

প্রফুল্লরা কোন একটি স্বাস্থ্যকর শহরে একটি বাসার সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু সব জায়গা হইতেই খবর আসিতেছে, আর কয়েকদিন আগে চেষ্টা করিলেই বাড়ী পাওয়া যাইত—এখন নিরুপায়। প্রফুল্লরা প্রায় যখন হতাশ হইয়াছে—তখন সিংভূম জিলার কোন একটি ছোট শহর হইতে নরেনের চিঠি আসিল। নরেন প্রফুল্লর সহপাঠী। এখন উক্ত স্থানে সে কাঠের ব্যবসা করে। নরেন লিখিয়াছে যে একটি বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে, বাড়ীটি ছোট তবে নূতন, স্থানের অভাব রঙের জৌলুষে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে, আর ভাড়াটাও চাহিদার তুলনায় সাধ্যের একেবারে বাহিরে নয়।

প্রফুল্ল আনন্দিত হইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিল—"এনগেজ এট্‌ওয়ান্স"—অর্থাৎ এখনি ভাড়া করিয়া ফেলো।

নরেন তারে জবাব দিল—"এনগেজড্‌ স্টার্ট"—ভাড়া করা হইয়াছে, রওনা হও।

পরদিন প্রফুল্ল তাহার স্ত্রীপুত্র ভাইবোন ও একটি চাকর সহ উক্ত স্থানে যাত্রা করিল।

স্থানটির নাম যে কেন গোপন রাখিতেছি গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলা আড়াইটার সময়ে প্রফুল্ল সপরিবারে নির্দিষ্ট স্টেশনে আসিয়া নামিল—নরেন প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, সে প্রফুল্লদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নরেন আগেই কয়েকখানা সাইকেল রিক্সাকে বলিয়া রাখিয়াছিল, এবারে সকলে সেই রিক্সা যোগে বাড়ীর দিকে চলিল; মিনিট কুড়ি পরে তাহারা সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। প্রফুল্লরা দেখিল সত্যই বাড়ীটি নূতন আর সুন্দর, অবশ্য ছোট সন্দেহ

নাই, তবে তাহারাও তো সংখ্যায় অগুণতি নয়, তাছাড়া বাড়ীর কম্পাউণ্ড বেশ বড়। দিনের বেলায় সেখানে কাটাইলেই চলিবে, খোলা হাওয়ায় থাকিতেই এখানে আসা।

প্রফুল্ল নরেনকে সঙ্গে করিয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইতেছিল—

নরেন বলিল—এবার বড় ভিড়, চালাঘরখানা অবধি প'ড়ে নেই।

প্রফুল্ল শুধাইল—এমন কি প্রতিবছর হয় ?

—আরে রাম। সব প'ড়ে থাকে, এবারে একটা বাড়ীও খালি নেই। কত চেষ্টা ক'রে যে এই বাড়ী পেয়েছি—

—আচ্ছা। ঐ বাড়ীটা যেন খালি মনে হচ্ছে—

এই বলিয়া সে অদূরবর্তী পাশের বাড়ীটা দেখাইল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের প্রচুর প্রাচীন গাছপালার মধ্যে মস্ত একটা বাড়ী।

নরেন বলিল—ও একটা পুরনো বাড়ী।

—যে চাহিদা তাতে পুরনো আর নূতন।

—ও-বাড়ী ভাড়া দেয় না।

—বাড়িওয়ালা আসে বুঝি ?

—কখনো তো দেখিনি।

—আশ্চর্য! ভাঙাচোরা বুঝি ?

—এমন কিছু অব্যবহার্য নয়।

—ভাড়া বেশি বলে মনে হয়।

—অসম্ভব নয়। তাছাড়া ও-বাড়ীটা সম্বন্ধে—এমন সময়ে চায়ের ডাক পড়িল, আলাপের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, দু'জনে ফিরিয়া আসিল।

২

শহরের কাছেই সুবর্ণরেখা নদী। নদীর একস্থানে কতকগুলো বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়িয়া আছে। আগন্তুকগণের সেটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। কলিকাতার বাবুরা আসিয়া সে স্থানটা দেখিতে যায়। শূন্য নদী খাতে শুষ্ক পাথরের খণ্ডগুলি দেখিয়া 'আহা আহা' করে, ফটো তুলিয়া নেয়, এবং জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা বুঝিতে পারে না সেখানে এমন কি দেখিবার আছে, ভাবে কলিকাতার বাবুদের দৃষ্টিই আলাদা।

সেদিন প্রফুল্ল ও নরেন সন্ধ্যার আগে সেখান হইতে ফিরিতেছিল। যখন তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লর চোখ সেই পাশের বাড়ীর দিকে পড়িল, সেদিনের অসম্পূর্ণ আলাপ তাহার মনে পড়িল, শুধাইল—সেদিন এই বাড়ীটার কথা কি বলছিলে?

নরেন বলিল—হাঁ, বাড়ীটা হানা-বাড়ী।

কৌতূহলী প্রফুল্ল শুধাইল—কিছু দেখেছ?

—না, শুনেছি।

—কি শুনেছ?

—বাড়ীটায় রাত-বিরেতে না'কি আলো দেখা যায়, মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়, ওখানে নাকি কে আত্মহত্যা করেছিল।

—প্রমাণ কি?

—আরে প্রমাণ নেই, সেই তো ভয়। তাছাড়া এসব জিনিস কখনো প্রমাণ হয়?

—কেউ সন্ধান করেন কেন?

—স্থানীয় লোক ওখানে ভয়ে প্রবেশ করে না।

প্রফুল্ল বাড়ীটার দিকে তাকাইল। ছমছমে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটা মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রফুল্লর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নরেন বলিল—মেয়েদের এসব কথা বলোনা, অযথা ভয় পাবে। তবে দেখো কেউ যেন ওদিকে না যায়, বিশেষ সন্ধ্যার পরে।

দু'জনে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যখন দু'জনে চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে—প্রফুল্লর ছোট ভাই টেবিলের ওপর কতকগুলি শিউলি ফুল রাখিল।

প্রফুল্ল শুধাইল—কোথায় পেলিরে?

সে বলিল—পাশের বাড়ীতে প্রচুর আছে।

নরেন বলিল—এ যে সন্ধ্যাবেলাকার ফুল এখনো সব ফোটেনি।

গীতিশ বলিল—এখনি তুলে আনলাম, কত ফুল ওখানে।

নরেন প্রফুল্লর দিকে তাকাইল।

রাত্রে শয়নের পূর্বে প্রফুল্ল পত্নীকে বলিল—গীতীশ সেই যে ফুলগুলি তুলে এনেছে, ভালো করেনি।

পত্নী ভাবিল পরের বাড়ীর ফুল মনে করিয়া প্রফুল্ল একথা বলিতেছে, তাই বলিল—খালি বাড়ী—আনলোই বা!

—সেই জন্যই তো বলছি।

—কেন, কি হ'ল?

তখন সবিস্তারে সব কথা প্রফুল্ল তাহাকে বলিল—এবং সাবধান করিয়া দিল—একথা যেন ছেলেমেয়েদের না বলা হয়!

—নিশ্চয়, একথা কি আর বল্‌তে আছে বলিয়াই পত্নী তখনি গৃহান্তরে গিয়া তাহার দুই ননদকে ও গীতীশকে সব বলিয়া ফেলিল—কিছু রঙ চড়াইয়া বলিল।

বড় ননদ ফুলু বলিল—তাই বলো বৌদি, ও-বাড়িটার দিকে তাকালেই গা ছমছম করে।

ছোট ননদ টুলু বলিল—আমি কাল রাতে একবার ছাদে গিয়েছিলাম, মনে হ'ল বাড়ীটার জানলায় যেন আলো!

গীতীশ কিশোর বালক, ভয় পাইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু যেখানে তাহার দুই বোন একরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, সেখানে তাহার অন্যরূপ বলা চলে না, তাই বলিল—আমি যখন আজ সন্ধ্যাবেলা ফুল আনতে যাই, মনে হ'ল বাড়ীর দোতলার বারান্দায় একটা যেন Shadow। তারপর বলিল—অবশ্য ভূতে আমি বিশ্বাস করি না।

ফুলু বলিল—ভারী বীর কিনা! তবে Shadow কিসে?

—অবশ্যই মানুষের!

—তবে মানুষটা দেখ্‌তে পেলে না কেন?

—অন্ধকার ব'লে।

—আহা কি বুদ্ধি! অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না—অথচ ছায়া দেখা গেল! একি হয় নাকি?

তাহাদের বৌদি জয়ন্তী বলিল—হয় কি নয় সে তর্ক থাক। ওদিকে আর যেওনা। আর এক কাজ করো—ওদিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ো। সেদিন এই পর্যন্তই।

পরদিন নূতন কৌতুহলে সকলে পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইল। ও-বাড়ীতে একটু শব্দ হইলেই,—যদি একটা কাক জোরে ডাকে বা একটা জানালা খট্ করিয়া পড়ে সকলে নূতন অর্থভরা চাহনিতে পরস্পরের দিকে

তাকায়। অবশ্য প্রফুল্ল এর মধ্যে নাই, কথাটা তাহার মনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্ল নরেনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাহার স্ত্রী, দুই বোন ও ভাই বসিয়া জটলা করিতেছে, পুরনো চাকর প্রফুল্লর ছোট ছেলে ও মেয়েকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে।

ফুলু বলিল—বৌদি কাল রাত্রে ওদিকে যেন একটা চাপা কান্না উঠছিল।

টুলু বলিল—আমিও শুনেছি।

গীতীশ বলিল—কুকুর কেঁদে থাকবে!

ফুলু ও টুলু বিরক্ত হইয়া শুধাইল—তুমি শুনেছ?

—অবশ্য শুনিনি, তবে কুকুর ছাড়া আর কি হবে?

ফুলু বলিল—তবে কেন কথা বল্‌তে এসেছ?

টুলু বলিল—জানো কুকুর Spirit দেখতে পায়।

সকলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এমন সময়ে হরি মিনু ও তিনুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরি বলিল—বৌদি, ও-বাড়ীতে মস্ত একটা হনুমান আছে। গাছের উপর খুব শব্দ করছিল।

চার জনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল—

—কি ক'রে বুঝলি হনুমান?

—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় গাছের উপর কি আর লাফাবে?

—সন্ধ্যাবেলায় কি হনুমান লাফায়? হনুমান যে কখন লাফায় না, জানা না থাকায় হরি বলিল—স্পষ্ট দেখলাম।

—কি দেখ্‌লে?

—কালো একটা কি!

—হনুমান কি কালো হয়?

—তাছাড়া আর কি হবে?

—যাই হোক, ওদিকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেওন'—এই বলিয়া বৌদি ছেলেমেয়েদের লইয়া উঠিয়া গেল।

ফুলু বলিল—হরি ওদিকে আর যেওনা।

—কেন দিদি!

—কেন নয়। যেওনা বলছি।

টুলু বলিল—ও-বাড়ী ভালো নয়!

গীতীশ ঠাট্টার সুরে বলিল—গোষ্ট!

—মানে ভূত প্রেত আছে।

হরি বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাই হবে দিদি! কাল রাতে ও-বাড়ীর জানালায় যেন একটা আলো দেখ্‌তে পেয়েছি।

ফুলু ও টুলু সমস্বরে গীতীশের প্রতি বলিল—কেমন এবার হ'ল তো বীরপুরুষ!

—ভূতে কি আলো নিয়ে চলাফেরা করে!

—প্রয়োজন হ'লে করে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বেশি বড়াই করো না, টেরটি পাবে।

—ভালই হবে, একটা নতুন জিনিস জানা যাবে।

তারপরে গীতীশ বলিল—এত তর্কে কাজ কি? ঐ তো ক্যালেণ্ডারে দেখা যাচ্ছে পরশু অমাবস্যা—আমি ঐদিন রাতো যাবো ও-বাড়ীতে, বাজী রাখতে রাজী আছো?

ফুলু বলিল—একশ বার রাজী।

টুলু বলিল—না।

—কেন? হেরে যাবে বলে?

—বিপদ ঘট্‌লে দাদার কাছে কে জবাবদিহি করবে?

—ঐ ব'লে পিছিয়ে যাওয়া! আচ্ছা, তোমরা বাজি রাখো না রাখো—আমি যাবই।

—অনেক হয়েছে—এখন থামো।

পরশু দিন। শনিবারে অমাবস্যা পড়িয়াছে। শনিবারই যথেষ্ট, তার উপর অমাবস্যা। ভূত-প্রেতের বারো পোয়া সুবিধা। আরও একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সকাল বেলায় গাড়ীতে প্রফুল্ল নরেনের সঙ্গে টাটানগর বেড়াইতে গেল, বলিয়া গেল, ফিরিতে অনেক রাত হইবে; বারটার এদিকে নয়।

গীতীশ বলিল—আজ রাত্রে যাবো।

ফুলু বলিল—এমন কাজ ক'রো না।

টুলু বলিল—যাবে মানে অন্ধকারে খানিকটা কোথাও লুকিয়ে থেকে এসে বাহাদুরি করবে যে গিয়েছিলাম।

গীতীশ বলিল—আচ্ছা এক কাজ করো। সন্ধ্যার আগে তোমাদের একখানা রুমাল ঐ বাড়ীটার সামনে রেখে আসবো। তারপর রাতে গিয়ে ওখানা আনবো। আর কি প্রমাণ চাও ?

ব্যাপার শুনিয়া তাহাদের বৌদি নিষেধ করিল, বোনেরাও নিষেধ করিল, কিন্তু গীতীশ কিছুই শুনিবে না।

তাহাদের এক ভয় পাছে গীতীশের কোন বিপদ ঘটে। আর এক ভয় পাছে প্রমাণ হইয়া যায় সত্যই ও বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কিছু নাই। পাশের বাড়ীতে ভীতিজনক কিছু আছে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কত গল্প করা যাইবে—সে সুযোগ তাহারা এমন ভাবে নষ্ট করিতে চায় না।

কিন্তু সমবয়স্ক মেয়ের কাছে গীতীশের পৌরুষ আহত হইয়াছে, সে কিছুই শুনিবে না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অপরাহ্ণে ও বাড়ীতে রুমাল রাখিতে গেল। দুই বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা প্রাচীর, ডিঙাইয়া অনায়াসে পার হওয়া যায়। ফুলু ও টুলু প্রাচীরের কাছে গেল, গীতীশ রুমাল লইয়া প্রাচীর পার হইল ও-বাড়ীর বাগানে ঢুকিল। তাহারা দেখিল বাড়ীটার সম্মুখে যে বাঁধানো বসিবার জায়গা আছে, সেখানে গীতীশ রুমালখানা রাখিল, তারপরে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রাচীর পার হইল।

—কেমন দেখলে তো যে রুমাল রেখে এলাম।

গীতীশ কিছুতেই নিষেধ শুনিবে না। শেষ মুহূর্তে তাহার ছই বোন ও বৌদি কত করিয়া বারণ করিল, হাতে ধরিল—কিন্তু সে অটল।

অগত্যা তাহারা নিরস্ত হইল।

রাত বারোটার কাছাকাছি গীতীশ একখানি লাঠি হাতে রওনা হইল।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বৌদি ও বোনরা ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আশা-আশঙ্কায় মিনিট গণিতে গণিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিল গীতীশ ধীরে ধীরে প্রাচীরটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবারে প্রাচীরের উপরে উঠিল, ঘন অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এবারে খুব সম্ভব সে ওপারে নামিয়াছে, কারণ তাহার শাদা জামাটা আরও অস্পষ্ট, এবারে আরও অগ্রসর হইয়া গেল—না! আর কিছু দেখা যাইতেছে না। বোধ করি

গাছে আড়াল করিয়াছে! মেয়ে তিনটির ভয়ে নিঃশ্বাস পড়িতেছে না! কতক্ষণ হইল! এক মিনিট, তিন মিনিট, না দশ মিনিট! ভয়ের মুহূর্ত আর ফুরাইতে চায় না!

এমন সময়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া গীতীশের আর্তস্বর উঠিল।

আলো হাতে করিয়া মেয়েরা প্রাচীরের দিকে ছুটিয়া গেল।

প্রাচীরের কাছে এদিকে শাদা কি একটা বস্তু! লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—মূর্ছিত গীতীশ!

'জল আন্, পাখা আন্, স্মেলিং সল্ট আন্।'

বিপদের উপর বিপদ। এমন সময়ে প্রফুল্ল ও নরেন আসিয়া উপস্থিত। তাহারা এই মাত্র স্টেশন হইতে আসিতেছে, বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র কোলাহল শুনিতে পাইয়াছে।

নরেন বলিল—সব বুঝেছি! কি সর্বনাশ! প্রফুল্ল বলিল—লক্ষ্মীছাড়া বুঝি বাহাদুরি দেখাবার জন্য ও বাড়ী গিয়েছিল।

—নাঃ ভয় নেই, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকই পড়ছে—নরেন ইতিমধ্যে তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

তখন সকলে মিলিয়া মূর্ছিত গীতীশকে তুলিয়া লইয়া ঘরে গেল। শেষ রাতে তাহার মূর্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু এত দুর্বল যে কথা বলিতে পারিল না। নরেনের আর সে রাত্রে বাড়ী যাওয়া হইল না। সারা রাত্রির সেবা-শুশ্রূষার পরে গীতীশ এতক্ষণে সম্পূর্ণ সম্বিৎ ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। প্রথম কথাই সে বলিল—রুমালখানা কই? সেখানা আমি সঙ্গে এনেছিলাম।

—কিন্তু ভয় পেয়েছিলে কেন? কিছু দেখনি কি?

—সে আমি বলতে পারবো না! শাদা শাদা অনেকগুলো মূর্তি!

—তখনি বলেছিলাম যেও না!

গীতীশ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা!

এমন সময়ে বাহিরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

নরেন বলিল—দেখোতো প্রফুল্ল ব্যাপারটা কি?

প্রফুল্ল জানলায় উঁকি মারিয়া বলিল—এ আবার কি? পাশের বাড়ীটা যে পুলিশে ভর্তি হয়ে গিয়েছে?

—সত্যি? তাইতো দেখি! এ আবার কি রহস্য?

রহস্যভেদের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দরজার কড়া

নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই একজন দারোগা নরেনকে বলিল—যাক্ আপনি আছেন আর ভয় নেই।

—কি হয়েছে ?

—একবার কষ্ট ক'রে সার্চ ওয়ারেন্টের সাক্ষী হবার জন্য ও বাড়ীতে যেতে হবে।

—কি ব্যাপারটা আগে শুনি।

—আজ কয়েকদিন হ'ল ওখানে কয়েকজন ফেরারী আসামী বাস করছিল। খুঁজতে খুঁজতে এই মাত্র সন্ধান পেয়ে তাদের arrest করেছি !

—ওটা না ভূতের বাড়ী ?

—সেই ভয়ের সুযোগ নিয়েই ওখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, ভেবেছিল কেউ সন্দেহ করবে না।

—ক'জন লোক ?

—ছ'জন।

—চলো প্রফুল্ল, একবার ঘুরে আসি।

—চলো, পাশের বাড়ীটা দেখবার কৌতুহল ছিল, দেখা হয়ে যাক্।

নরেন দারোগার উদ্দেশ্যে বলিল—চলুন যাওয়া যাক।

তাহারা তিনজনে পাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

সাহিত্যে তেজিমন্দি

অনিরুদ্ধ সেন একজন উঠতি কবি। সহরের অধিবাসী হইলে তরুণ, সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল প্রভৃতি অভিধা নামের 'শ্রী'র পরিবর্তে বসিয়া তাহাকে শ্রী-ভ্রষ্ট করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের লোক বলিয়া তাহার নামে শ্রী থাকিয়া গেল বটে কিন্তু কবিতায় শ্রী আসিল না। তাহার মাতুলের কিছু জমি ছিল দামোদরের তীরে, বন্যা কমিয়া গেলে জমি উঠিত সেই উঠতি জমির সুবাদে অনিরুদ্ধের অভিধা পড়িল উঠতি কবি। প্রথমে মাতৃকুলেই বিশেষণটি আবদ্ধ ছিল, কিন্তু কালক্রমে চারকুলে (পিতৃকুল, মাতৃকুল ও দামোদর নদের দুই কূল) তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল, অনি বা অনিরুদ্ধ বা অনিরুদ্ধ সেন একজন উঠতি কবি।

কিন্তু কোন্ কবি কবে কুলগৌরব বর্ধনের জন্য কবিতা লিখিয়াছে, সমগ্র মানব সমাজের আনন্দবর্ধন তাহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই অনিরুদ্ধ পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠাইতে সুরু করিল। 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না—' এই সম্পাদকীয় নীতির প্রমাণ-স্বরূপ তাহার কবিতাগুলি সম্পাদকীয় ঝুড়িতে মোক্ষলাভ করিতে লাগিল। অনভিজ্ঞ অনিরুদ্ধ ভাবিত ডাক টিকিটখানা বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু হায় কি করিয়া সে জানিতে যে সেই ডাকটিকিট সম্পাদকীয় পাওনাদারকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয় কিম্বা সহ-সম্পাদকীয় প্রণয়িনীর প্রতি প্রেম নিবেদনের জন্য প্রযুক্ত হয়। কেবল সে জানিত যে সম্পাদকীয় সিংহ বিবরের সম্মুখে কবিতার প্রবেশ পদ-চিহ্ন আছে, নির্গম পদ-চিহ্ন নাই।

উঠতি কবি অনিরুদ্ধ দমিবার পাত্র নয়, উঠতি কবির দল দমিত হইলে সাহিত্যের ভূ-ভার অনেক কমিত। কলিকাতার বিভিন্ন মতাবলম্বী যাবতীয় পত্র-পত্রিকায় সে কবিতা পাঠাইত, আর দেখিত যে পৃথিবীর সর্ববিষয়ে তাহাদের মতভেদ থাকিলেও অনিরুদ্ধর কবিতার প্রকাশ যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহারা একমত। প্রায় প্রতীক্ষমানা শবরীর মতো তাহার দশা হইয়া উঠিল, না আসিল পত্র-পত্রিকা, না আসিল কবিতা ফেরৎ, না আসিল রামচন্দ্র, কিন্তু সকল অভাব পূর্ণ করিয়া আসিলেন তাহার অগ্রজ, অনিমেষ সেন, কলিকাতায় কর্ম করেন।

তিনি শুধাইলেন, তুই বসে বসে কি করছিস।

সত্যের অনুরোধে তাহার বলা উচিত ছিল, কবিতা লিখছি, কারণ সত্যই তখন সে 'বিছুটি গাছ ও ছাগল' সম্বন্ধে একটি আধুনিক কবিতা লিখিতেছিল। কিন্তু কবিদের সত্যাগ্রহ তেমন প্রবল নয় বলিয়া সে বলিল, কি আর ক'রব? ম্যাট্রিকুলেশনটাও তো পাশ হতে পারলাম না, তাই বেকার জীবন যাপন করছি।

বেশ, তবে আমার সঙ্গে চল, আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবো।

তারপরে তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, তোর একটু লিখবার বাতিক ছিল না? বেশ হবে চল্। পরশু ফিরছি, তৈরী হয়ে নিস্।

অধিকাংশ মানুষ যে প্রস্তাবে খুশী হইত, সেই চাকুরীর প্রস্তাবে সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সে ভাবিল সরস্বতীর সেবকের প্রতি লক্ষ্মীর একি লাঞ্ছনা। কিন্তু সে তো জানিত না যে একালে লক্ষ্মী সরস্বতীতে আপোষ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর বরপুত্র শাদা কাগজে হিজিবিজি কাটিলে তাহা যুগান্তকারী রচনা বলিয়া পুরস্কার পায়, আবার সরস্বতীর খাস দরবারে একবার নাম লিখাইতে পারিলে বাড়ীর দরজায় প্রকাশক প্রযোজক ও সম্পাদকদের গাড়ীর সংখ্যা আঙ্গুলের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায়। এসব আধুনিক রহস্য না জানায় সে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার অগ্রজ ছাড়িলেন না, তাহাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেলেন।

২

অনিরুদ্ধ এখন তাহার অগ্রজের অফিসে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার পাইয়াছে। যদিচ সে কনিষ্ঠ কেরাণী কিন্তু তাহার অগ্রজ সমস্ত কেরাণীকুলের অগ্রজ বিধায় এই দায়িত্বপূর্ণ ভারটি সে পাইয়াছে। অন্য কেরাণীরা ইসারায় বলাবলি করে মামা থাকলে সবই সম্ভব।

অনিরুদ্ধ একটি ছোট কামরায় বসিয়া অফিস সংক্রান্ত নানারূপ বিজ্ঞাপন লেখে, তারপরে নির্দিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেয়। আবার কখনো কখনো বিজ্ঞাপন-প্রার্থী সম্পাদকদের চিঠির তাড়া লইয়া পড়ে, কোন পত্রিকা উপযুক্ত বোধ হইলে তাহাতে বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারে এমন নির্দেশ তাহার প্রতি ছিল। অনিরুদ্ধ দেখিল প্রত্যেক পত্রিকাই সর্বাধিক প্রচারিত, আর সম্পাদকগণ প্রত্যেকেই 'Confidentially' জানাইয়া দেন যে তাহাদের

কাগজ দশ হাজারের অধিক মুদ্রিত হয়। বাঁধা কাগজগুলি ছাড়া নূতন কাগজেও মাঝে মাঝে সে বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া দিত, কারণ তাঁহার অগ্রজ পরামর্শ দিয়াছিল ব্যবসার প্রসার যাহাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে কাব্য সরস্বতীকে সে ভুলিয়াছে তবে মস্ত ভুল হইবে। বিজ্ঞাপনের কপি লিখিবার অবকাশে সে বসিয়া কবিতা লিখিত (হয়তো উল্টোটাই সত্য)। কাব্য রচনার এমন সুযোগ সে ইতিপূর্বে পায় নাই। কামরাটি নিভৃত, অবকাশ অখণ্ড, অফিসের কাগজপত্র যেমন দামী তেমনি প্রচুর, আর সরকারী ডাকটিকিটও তাহার জিম্মায় থাকিত। সরস্বতী তাহার প্রতি যদিও এখন পর্যন্ত প্রসন্ন হন নাই, কিন্তু সদয় লক্ষ্মী তাহার ডাকমাশুলের দুশ্চিন্তা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য বাধা যে কখনো না ঘটিত এমন নয়, তাহার অগ্রজ বা অন্য কোন লোক মাঝে মাঝে অতর্কিত ঘরে ঢুকিয়া পড়িত, হয়তো তখন সে সদ্য রচিত কবিতাটিকে খামে পুরিয়া নলের রাজহংসের মতো সম্পাদক দময়ন্তীর কাছে প্রেরণ করিতেছে, সেটাকে চাপা দিয়া খামে বিজ্ঞাপনের কপি পুরিত। এই ভাবে সুখে দুঃখে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জোড়া নৌকায় পা রাখিয়া অনিরুদ্ধের চলিতেছিল।

৩

সেদিন অফিসে আসিয়া অন্যদিনের মতোই পত্রপত্রিকাগুলি দেখিতে লাগিল। এগুলিতে অফিসের বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে। অন্যমনস্কভাবে পত্রিকাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে সে চমকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল! বাংলাদেশে অন্য অনিরুদ্ধ সেন থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু এ যে তাহারই রচনা—

'হিমালয়ে বরফ গলে
ব্রহ্মপুত্রে বান
হে মাঝি সাবধান।'

অফিসের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া কামরার দরজা সে বন্ধ করিয়া দিল আর ঘরময় দাপাদাপি করিয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম কবিতাটি সে পড়িতে লাগিল। বাল্মীকির মুখে প্রথম কবিতা, প্রথম প্রেমের অনুভূতি, প্রথম চাকুরীর নিয়োগপত্র প্রভৃতি মনে উচাটন ঘটায় নিঃসন্দেহ কিন্তু অনিরুদ্ধের মনোভাবের কাছে সে-সব নিতান্ত নগণ্য। আধ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া যখন সে বসিল তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম

ঝরিতেছে। এতক্ষণে কিঞ্চিৎ সম্বিৎ পাইয়া দেখিল কাগজখানার নাম 'অন্য শিবির'। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল অফিসের বিজ্ঞাপন তাহাতে ছাপা হইয়াছে। তারপরে এ আবার কি? তাহার নামে 'অন্য শিবিরে'র খামে চিঠি। সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'আপনাকে পাইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের অভাব ভুলিলাম। প্রতি মাসে আমরা আপনার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সানন্দে ছাপিব।' আরও লিখিয়াছে 'দয়া করিয়া আমাদের অফিসে একবার আপনার পায়ের ধুলা দিলে আমরা কৃতার্থ হইব!' তাহার স্মৃতিশক্তি প্রবলা হইলে মনে পড়িত যে এই 'অন্য শিবির' পত্রিকাই পূর্বে নিয়মিত তাহার কবিতা ফেরত দিয়াছে অর্থাৎ বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে সব কথা মনে পড়ে না তাই সংসারে বাস করা সম্ভব হয়।

সেইদিন অপরাহ্ণেই অনিরুদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে (দুইবার বাস চাপা পড়িতে লাগিয়াছিল) 'অন্য শিবিরে' গিয়া পৌঁছিল। 'অন্য শিবির' তাহাকে দেখিয়া শিবাধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বেয়ারাকে বলিল 'চা নিয়ে আয়, দোকানে বলিস যে সেই ভালো কাপে যেন দেয় একজন মস্ত বাবু এসেছেন।'

অতঃপর 'অন্য শিবিরে' তাহার কবিতা ও অফিসের বিজ্ঞাপন নিয়মিত বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার প্রতিভা অধিক দিন 'অন্য শিবিরে' আবদ্ধ থাকিল না, অল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন শিবিরে ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যহ নূতন নূতন সম্পাদক তাহার কাছে আসিয়া কবিতা দাবী করে, উঠিবার সময়ে একখানি বিজ্ঞাপনও পায়, সম্পাদক বলে, না, না, ও থাক, ভাববেন না যে বিজ্ঞাপনের জন্য এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিজ্ঞাপনের কপি হাতে করিয়াই সে প্রস্থান করে। কোন কোন সম্পাদক বা ২/৩ সংখ্যা তাহার কবিতা ছাপায়, কিছুই দাবী করে না, অবশেষে বছরের বিজ্ঞাপন কণ্টাক্ট করিয়া ফেলে। শেষে এমন হল যে অনিরুদ্ধ কবিতা আর সাপ্লাই দিতে পারিত না। এক বছরের মধ্যে অনিরুদ্ধ সেন বাংলাদেশের সর্বাধিক পরিচিত কবি হইয়া দাঁড়াইল। হইবেই বা না কেন যে কাগজই খোলো অনিরুদ্ধ সেনের কবিতা আর তাহার অফিসের বিজ্ঞাপন। কাব্য ও ব্যবসা দুই-ই একযোগে বাড়িতে লাগিল: লক্ষ্মী-সরস্বতীর আড়াআড়ি পৌরাণিক কাহিনী; নূতন যুগে দু'য়ে সহযোগিতা।

এদিকে 'অন্য শিবির' তাহার সচিত্র জীবনী ছাপিয়া বিজ্ঞাপনের চিরস্থায়ী চুক্তি

করিয়া ফেলিল। তাই দেখিয়া প্রতিযোগী পত্রিকা 'ধূম্রমার' কবি অনিরুদ্ধ সেন জয়ন্তীর আয়োজনে লাগিয়া গেল। এবং অবশেষে একদিন টালিগঞ্জের এক বাগানবাড়ীতে অনিরুদ্ধ সেনের গুণগ্রাহীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে সম্বর্ধিত, 'কবি ভ্রমর' উপাধিতে ভূষিত ও স্রকচন্দনে চর্চিত করিল। পরদিন সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া সচিত্র সংবাদ বাহির হইল, (তাহারাও বিজ্ঞাপন রসে বঞ্চিত হয় না।) ফলে বাংলাদেশের পাঠক সমাজ বুঝিল যে 'কবি ভ্রমর' অনিরুদ্ধ সেন একজন মহাকবি, সম্পাদকগণ বুঝিল যে সে একটি আস্ত নিরেট নির্বোধ, কেবল অনিরুদ্ধ নিজে কিছুই বুঝিল না, বুঝিল না এতকাল কেন তাহার কবিতা ছাপা হয় নাই, আর এখনই কেন বা কাড়াকাড়ি।

৪

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কায়োমনোবাক্যে সাহিত্য সেবার উদ্দেশ্যে অনিরুদ্ধ চাকুরী ছাড়িয়া দিল। দুঃসংবাদ বিনা তারে সম্পাদক সমাজে প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না—আর ফলটাও নাকি হাতে হাতে ফলিল। এই সেদিন মাত্র বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলি বাণীর শ্বেত পদ্মের মতো অনিরুদ্ধ হইয়া 'কবি ভ্রমরের' কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, আজ তাহা কিসের ইঙ্গিত-মাত্রে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া 'কবি ভ্রমরকে' প্রত্যাখ্যান করিল। কোন পত্রিকা তাহার কবিতা ছাপিল না, অধিকাংশ সম্পাদক ভালো করিয়া তাহার সঙ্গে কথাও বলিল না, কেবল চিরস্থায়ী বিজ্ঞাপন চুক্তির কৃতজ্ঞতায় 'অস্ত্র শিবির' তাহাকে এক পেয়ালা চা জোগাইত, কিন্তু এবার আর ভালো পেয়ালার নির্দেশ হইত না। সেই কটু চা পান করিতে করিতে অনিরুদ্ধ ভাবিতে চেষ্টা করিত কেন এমন হইল? অনিরুদ্ধের নির্বুদ্ধিতায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর জোট ভাঙিয়া গিয়াছে তাই আজ তাহার এমন দুর্দশা।

সংস্কৃতি

বাসখানা কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল ট্রাম ষ্টপের কাছে ছোটখাটো একটি ভিড়। দোতলায় বসিয়াছিলাম তাই ভিড়ের আভ্যন্তরিণ রহস্য জানা আমার পক্ষে অনায়াস। দু'জন ভদ্রলোক, অন্ততঃ জামা কাপড় জুতা তাই বলে, পরস্পরের দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে তাকাইয়া আছে। ঐরূপ দৃষ্টি বিনিময় প্রায়ই নীরবে হয় না, কিন্তু পথের কোলাহল তাহা আমার কর্ণগত হইবার পক্ষে অন্তরায়। তবে দৃষ্টি বিনিময়ের অনুমান স্বরূপ যে সব বাক্য বিনিময় হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম। আমিও যে বাঙালী এবং জুতা জামা কাপড়ে ভদ্রলোক।

যে ট্রামখানায় আরোহণের প্রথম অধিকার লইয়া এই বিতণ্ডা বাধিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এতক্ষণে লালদীঘি পৌঁছিয়া গিয়াছে—আর পরবর্ত্তী দশখানা গাড়ীও নিশ্চয় লালদীঘি পৌঁছিল।

কিন্তু কোন অবস্থা দীর্ঘকাল ভারসাম্যে থাকে না, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম না হইলেও একটি সামাজিক বিধি। আর খুব সম্ভব সেই বিধানের প্রেরণায় একজন ভদ্রলোক হঠাৎ লাফাইয়া অপর জনের চুল ধরিলেন, আর তিনি আততায়ীর ধরিলেন গলা। জনতা উৎসাহে আহা, আহা করিয়া উঠিল। আমি নামিয়া পড়িলাম। অবশ্য কাছেই নামিবার কথা ছিল।

ভিড়ের কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে বীরদ্বয় ধরাশায়ী হইয়া গড়াইতেছে, কখনো একজন উপরে কখনো অপরে।

আমি জনতার একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ছাড়িয়ে দিন না।

পাঁচ জনে এক সঙ্গে পাঁচ রকম মন্তব্য করিলেন।

মাইরি আর কি! আফিস কামাই ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, আর উনি বলেন ছাড়িয়ে দিন না!

ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন আর কি!

স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু, গোয়া সত্যাগ্রহে এসেছেন ঠাণ্ডা জল ঢালতে।

তেমন, তেমন কিছু হলে অবশ্য ছাড়িয়ে দিতেই হবে।

তবে রে শালা!

আয় না হারামজাদা—

শেষের উক্তি দুটি আমার সম্বন্ধে প্রযুক্ত নয়, যুযুধানদ্বয় পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতেছে।

তারপরে যুযুধানদ্বয় যে সব উক্তি প্রত্যুক্তি করিতে লাগিল সে সব শব্দকল্পদ্রুমের মতো অতিকায় অভিধানে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র দাস, সুবল মিত্র বা চলন্তিকায় অজ্ঞাত। এতদিন বিশ্বাস ছিল, গালাগালির পক্ষে হিন্দী ভাষাটাই প্রশস্ততম, আজ সে বিশ্বাসের পরিবর্তন আবশ্যক বোধ করিলাম।

এক্ষণে দুইজনের জামা কাপড় ছিঁড়িয়া, নাক মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

জনতার মুখে চোখে সে কি ঔৎসুক্য আর উল্লাস। জনতার ও ভদ্রলোক দুটির এই প্রকাশ্য নির্লজ্জপনায় আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি অলক্ষিতে সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

নিন, নিন্, এবারে ছাড়িয়া দিন, দেখুন না, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ঠিক, ঠিক, আসুন।

তখন ৫।৭ জনে জোর করিয়া যুযুধানদ্বয়কে পরস্পরের আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া দিল।

ঝড় থামে কিন্তু ঢেউয়ের দোলা থামিতে চায় না।

উক্ত ভদ্রলোক দুটি ধমক মারিবার অবকাশে দুইজনের প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল।

শালা আমার সেক্রেটারি।

তোর মতো অনেকরকম হারামজাদা প্রেসিডেণ্ট দেখেছি।

শালা সেক্রেটারি হ'য়ে প্রেসিডেণ্টের আগে ট্রামে উঠতে যাস কেন?

ওঃ সম্বন্ধী আমার প্রেসিডেণ্ট হ'য়েছে ব'লে মাথা কিনে নিয়েছেন আর কি।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, তবে আপনারা পরিচিত।

—পরিচিত ব'লে পরিচিত। ওদের চৌদ্দ পুরুষ জানি, হাড় বজ্জাতের ঝাড়।

মারবো মুখে এক লাথি!

মশায়, আপনারা দুজনেই ভদ্রলোক। প্রকাশ্যে এমন আচরণ করতে আপনাদের লজ্জাবোধ করছে না?

লজ্জাটা কিসের শুনি ? এ'তো আর সমিতির অধিবেশন নয়।

এই উক্তিতে সকলেই কৌতুহল বোধ করিল !

কিসের সমিতি আপনাদের ?

আপনারাই বা সমিতির কি ?

আমাদের সমিতির নাম দক্ষিণ কলিকাতা সংস্কৃতি সমিতি, ও বেটা সেক্রেটারি।

আমার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। সমিতির নাম ডাক শুনিয়া সদস্য হইবার আশায় আবেদন পত্র হাতে আসিতেছিলাম।

উল্টা বাসে বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম।

জামার মাপে মানুষ

সেকালে কোন মদ্যব্যবসায়ীকে ধনী বোতল ব্যবসায়ী বলিয়াছিল যে আপনি যার শাঁস বেচে বড়লোক আমি তার খোসা বেচি।

কথাটা অবাস্তব মনে হইত, বোতল বেচিয়া আবার ধনী হওয়া যায়। কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ে নামিয়া দেখিলাম যে কথাটি বেদবাক্য; সংসারে খোসারই দাম, কখনো সে খোসা বোতল, কখনও বা সে খোসা মলাট।

প্রথম যখন পুস্তকপ্রকাশ সুরু করি অনভিজ্ঞতাবশতঃ শাঁসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। সৎ ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্য প্রকাশের চেষ্টা করিতাম আর বলিলে হয় তো কেহ বিশ্বাস করিবে না সে রকম পুস্তকও মিলিত! লোকে পড়িয়া বাহা, বাহা করিত, বলিত এতদিনে বইয়ের বাজারে বশিষ্ঠের আবির্ভাব হইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মুদ্রিত পুস্তক, কাগজ ও ছাপাখানার বিলের ভারে কলির বশিষ্ঠ কলিজা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিব ভাবিতেছি সেই ব্যবসায়ীর উক্তি মনে পড়িল। তখন শাঁস ছাড়িয়া খোসার দিকে মন পড়িল। লোকে যতটা কানাকানি করে ততটা না হইলেও 'টু পাইস' কিনা দু' পয়সা সঞ্চয় করিয়াছি।

এখন আমি মলাট ছাপি। অবশ্য দুই মলাটের অভ্যন্তরে খানকতক মুদ্রিত পৃষ্ঠা থাকে, কিন্তু সে নিতান্ত ঢাকের বাঁয়ার মতো, নিতান্ত না থাকিলে নয় বলিয়াই থাকে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় মানুষে আবিষ্কার করিয়াছে যে ভিতরে কিছু মুদ্রিত অংশ থাকিলে তাহাতে জৌলুষ খোলে ভালো, নতুবা অন্তঃসার শূন্য মলাট একেবারে ঢল্‌ঢল্‌ করে। খদ্দের আসিয়া মলাটের রঙ, রেখা ও বাহার দেখিয়া বই পছন্দ করে; বইয়ের বাজার তাসের খেলার মতো শেষ পর্যন্ত রঙের খেলায় পরিণত হইয়াছে। তবে সত্যের অনুরোধে না বলিয়া পারিতেছি না যে উচ্চাঙ্গ মলাটের অভ্যন্তরে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য থাকিলে খদ্দের তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করে না। মোটকথা এই যে প্রকাশকগণের উদ্যমে সরস্বতীর শুভ্র কপোলে ইন্দ্রধনুর বাহার ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাংলা মলাটের প্রশংসায় বাঙ্গালী পাঠক পঞ্চমুখ, হইবেই বা না কেন, বাঙালী যে জাতশিল্পী। শাঁসের চেয়ে খোসার দর অধিক প্রতিপন্ন হইয়া সেই বোতল ব্যবসায়ীর কথাকে সত্য প্রমাণ করিয়াছে।

কিন্তু একদিন যে এই নিদারুণ সত্য আমার জীবনেই প্রমাণিত হইবে তাহা কে জানিত! প্রমাণিত হইবে যে সংসারে বোতল ও মলাটের মতো আমারই আদর, আমার দরেই মানুষের দর!

এখনো ভাড়া বাড়ীতে থাকি। ইচ্ছা করিলে একখানা কেন তিনখানা বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারি। কিন্তু ইনকামট্যাক্স বিভাগের সহস্র চক্ষু এখনো ব্যবসায়ীদের অন্ধিসন্ধি সন্ধানে নিযুক্ত, তাই ভাড়াটে বাড়ীর মুখোস পরিয়া দারিদ্র্যের ভান করিয়া আছি। সময় বিশেষে দারিদ্র্যই ধনের প্রকৃষ্টতম ছদ্মবেশ। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সংসারে দারিদ্র্যেরও একটা প্রয়োজন আছে।

মোটর কিনি নাই, কারণ মোটর সচল হইলেই ইনকামট্যাক্স বিভাগও নাকি চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহারা কোন্ সূত্রে খবর পায় জানি না, তবে ঈর্ষ্যাপরায়ণ মানব স্বভাববিশিষ্ট প্রতিবেশী থাকিতে সূত্রের অভাব কি। বাড়ীও নাই, মোটরও নাই, কাজেই আমার গুপ্ত ধনের সন্ধান মৃত্যুঞ্জয় ইনকামট্যাক্স বিভাগেরও (এখন সত্যই মৃত্যুঞ্জয়, কারণ মৃত্যুর পরেও Estate duty নামে সে হস্ত বাড়াইয়া থাকে) অজ্ঞাত। অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন যে টাকার ব্যবহার হইল না সে টাকার সার্থকতা কি? 'টাকা আছে'—এই বোধটা মানুষকে এমন পরম তৃপ্তি দান করে যে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে না। ইষ্টনাম প্রকাশে শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বটে। অবশ্য ধন আছে জানিলে অনেক সুবিধা কিন্তু অসুবিধাও কম নয়। 'আছে' ও 'নাই' তৌল করিয়া দেখিয়াছি যে, 'নাই' পক্ষই কিছু ভারি, অন্ততঃ আমার মত সেইরূপ।

যাক্, এবার আসল ঘটনাটি বলিয়া ফেলি। ঘটনা সংক্ষিপ্ত, তাই দীর্ঘ ভাষ্য করিতে হইল।

আমার স্ত্রীর নাম মৃগাক্ষী এবং তাহার মৃগী রোগ আছে। যখন তখন তড়কা ওঠে আর ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। সেদিন অনেক রাতে সে মৃগবৎ আচরণ সুরু করিলে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ডাক্তারকে ফোন করিবার উদ্দেশ্যে খালি গায় খালি পায় রায়বাবুদের বাড়ীতে ছুটিলাম।

দরজায় দারোয়ানজী খাটিয়া পাতিয়া শয়ান ছিলেন। সে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আরে অন্দর মৎ যাও। দারোয়ানের এরূপ নিষেধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

আরে, আমি যে মুখার্জি।

মুখার্জি উখার্জি নেহি জানতা। অভি বাবুকো দেখা নেহি মিলেগা।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাতড়াইয়া অনুভব করিল ভোজপুরী পাকা লাঠিখানা পাশে আছে কিনা।

তাহার উক্তি ও নিরুক্তির উপরে আর কথা চলে না। কাজেই ফিরিয়া আসিলাম।

ততক্ষণে পত্নীর মৃগীরোগের তড়কা সারিয়াছে, কাজেই তত্ত্ব চিন্তার অবকাশ জুটিল। অন্যান্য স্বামীদের সুবিধা হইতে পারে আশায় প্রকাশ করিতেছি যে মৃগীরোগের একমাত্র উদ্দেশ্য অসময়ে স্বামীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলা নতুবা কুমারী, বিধবা ও পুরুষের ঐ রোগ হয় না কেন? নতুবা স্বামী বিদেশে বা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিলে পত্নীর ঐ রোগ হয় না কেন? নতুবা উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী দারোয়ানের তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে কেন যে মৃগীর আক্রমণ দূর হইয়াছে।

যাই হোক, প্রথমেই যে জিজ্ঞাসা মনে উদিত হইল, দারোয়ান বাধা দিল কেন? এই রায়বাবুদের বাড়ীতে আমি নিত্য সান্ধ্য অতিথি, প্রতিদিন প্রবেশ কালে উক্ত দারয়ানজীই উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিয়াছে। রায়-বাবুদের ছোট ছেলেটি একটি সদ্য পক্ষোদ্‌ভিন্ন সাহিত্যিক, একখানা বই ছাপিয়া দিবার জন্য আমার কাছে নিত্য উমেদারি করে, ঐ রাম অবতার তেওয়ারী কত দিন তাহার পত্র আমার হাতে আনিয়া দিয়াছে, আবার কতদিন আমার ছদ্মভাষী 'বাবু বাড়ী নাই' উত্তর বহিয়া লইয়া গিয়াছে, আসিতে যাইতে দুইবার সেলাম জানাইয়াছে। তবে সেই তেওয়ারী এখন বলিল কেন যে মুখার্জি উখার্জি নাহি জানতা! এ কেমন রহস্য!

সহসা আয়নায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, খালি গা, খালি পা দেখিয়া এক মুহূর্তে রহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল, বুঝিলাম তখন আমার খোসা ছিল, এখন নাই, তখন জামা চাদর জুতা ছিল, এখন শুধু শাঁসটা, তৈরী পোষাকেই মানুষের পরিচয়, শুধু দেহে সে নির্বিশেষ, খোসা না পাইলে বাঙালী পাঠক ভোলে না, ভোজপুরী তেওয়ারির অন্তর্দৃষ্টি তাহার চেয়ে বেশী হইবে আশা করাই অন্যায়। এই কথা মনে হইবামাত্র যাবতীয় গ্লানি দূর হইল বরঞ্চ দারোয়ানজী যে আমার নীতিরই একজন সমর্থক ভাবিয়া এক প্রকার গৌরব অনুভব করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যা বেলায় নিয়মিত সময়ে রায়বাবুদের বাড়ী ঢুকিলাম, তেওয়ারী শশব্যস্তে উঠিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

অভ্যাস মতো উক্ত সেলামটি অবহেলায় পকেটস্থ করিলাম, বুঝিলাম যে আমি এখন জামা চাদর জুতা ঘড়িতে রীতিমতো খোসাবস্ত।

সেই দিনই গভীর রাত্রে আমার সহধর্মিণী মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া মৃগবৎ আচরণ করিতে লাগিল। পূর্বাপর চিন্তার অবকাশ না পাইয়া আবার খালি গায়ে খালি পায়ে আলুথালু অবস্থায় রায়বাবুদের বাড়ীতে ঢুকিতে গিয়া দারোয়ানজীর কাছে বাধা পাইলাম।

'আরে দারোয়ানজী হামকো জানতা নেহি? হাম মুখার্জি বাবু হ্যায়।

নেহি, নেহি, মুখাজি উখার্জি কিসিকো হাম জানতা নেহি। আভি ভাগো।

ফিরিয়া আসিলাম। অতি পুরাতন সত্য আবার নূতন করিয়া বুঝিলাম। মনে পড়িল সংসারে খোসারই দর। তাই জামার মাপেই মানুষের মাপ; মনে পড়িল যে আমিও তো ক্ষেত্রবিশেষে ঐ নীতি চালাইয়া থাকি, তবে ভোজপুরী দারোয়ানজীকে আর বৃথা দুষিতে যাই কেন?

থার্মোমিটার

এক

একবার টেরামাইসিন দিয়ে দেখ্‌লে হয় না।

যা ভাল বোঝেন করুন, মোট কথা জ্বরটুকু তো যাওয়া দরকার, অনেকদিন হয়ে গেল।

অল্প জ্বরকেই তো ভয় করি, বেশী জ্বর সহজসাধ্য।

ডাক্তারবাবু, তবে না হয় টেরামাইসিন দিয়েই দেখুন। ওষুধটার নামও তো শুনিনি আগে।

সবে বেরিয়েছে, অসাধ্য রোগের যম।

তবে তাকেই ডাকুন।

হাঁ পেনিসিলিন, ষ্টেপটোমাইসিন সবই তো দিয়ে দেখলাম।

পেস্ক্রপশন লিখে দিন, আনিয়ে নিই।

আর ওতে কিছু ফল না হলে ডাঃ চ্যাটার্জিকে একবার কল দিতে হবে, চৌষট্টি টাকা ফি, তবে আমি ধরলে বোধ করি পঞ্চাশেই রাজি হবেন।

কিন্তু ঐ যে ৯৯° জ্বর কেন বলতে পারেন?

দেখুন, ষ্টুল, স্পুটাম, ইউরিন, ব্লাড সবই পরীক্ষা করলাম। আবার X-ray প্লেট তুলে, Cardiograph নিয়ে ওর দেহের আগাগোড়া জরিপ ক'রে ফেলেছি কিন্তু কোথাও কোন focus বা Toxin তো পেলাম না। খুব সম্ভব নূতন কোন ব্যাধি হবে।

অতটুকু ছেলে, ওর শরীরে আর কত সয়।

ওতেই তো মুস্কিল হয়েছে। ভা'লো করে প্রকাশ করতে পারে না কি হয়েছে।

যাই বলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে থেকে দেখতে বেশ সুস্থ দেখায় ওর মা বলে কোন অসুখ হয়নি ডাক্তারবাবু ভুল করছেন।

অসুখ সারতে দেরী হলে সবাই ঐ এক কথা বলে থাকে ডাক্তারবাবু ভুল করেছেন। আরে অসুখটা তো ডাক্তারবাবুর সৃষ্টি নয়। তা'ছাড়া আপনার থার্মোমিটার তো ভুল করেনি। আমার থার্মোমিটার হলেও বা বলতে পারতেন

টাকা আদায় করবার জন্ম সেটা খারাপ ক'রে রেখেছি—যাতে একটু ক'রে জ্বর ওঠে।

ডাক্তারবাবু আপনি রাগ করবেন না—আপনার উপরে কোন উদ্দেশ্যের আরোপ করি নি।

তা আমি বুঝেছি। যাক্ গে, তা হলে টেরামাইসিন দেওয়াই স্থির।

আর তাতেও ফল না হলে ডাক্তার চাটুজ্জেকে কল্ দেওয়া।

বেশ তবে তাই স্থির রইলো।

দুই

ভুক্তভোগী পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিচক্ষণ ডাক্তার ও রুগীর অভিভাবকের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল! যদুবাবুর তিন বছরের ছেলে রামু। সে বেচারা আজ তিন মাস হইল মৃদুজ্বরে ভুগিতেছে। ছাড়ে না, বাড়েও না, কমেও না, ৯৯° এর অঙ্কে অচল অটল হইয়া জ্বর বিরাজ করিতেছে। তিন চারদিন পরে ডাক্তার আসিল, এবং আজ তিন মাসের মধ্যে কুইনিন, প্যালুড্রিন হইতে সুরু করিয়া পেনিসিলিন, অরোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, ষ্টেপটোমাইসিন সব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একরোখা জ্বর বগলে থার্মোমিটারটি দিবামাত্র সেই পুরাতন ৯৯°। সকলে বলিতে সুরু করিয়াছে ইহাকেই বলে ৯৯ এর ধাক্কা।

অথচ ছেলেটির এদিকে বেশ সুস্থ সবল লাবণ্যপূর্ণ চোহারা অনেকে বলেন এমন অবস্থায় ও জ্বরটুকু গ্রাহ্য নাই করিলে। আবাব অনেকে বলেন—বাপরে, তা কি হয়। ঐটুকু জ্বরই বা থাকিবে কেন? ওষুধ বদলাও, তার চেয়েও ভাল ডাক্তার বদলাও।

দুই-ই হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার তিন চার দফা বদল হইয়াছে—আর ওষুধও বদলাইতে বদলাইতে সব শেষ হইয়া গিয়াছে এখন আর একটি মাত্র ঔষধ অপরীক্ষিত আছে—টেরামাইসিন। উক্ত ঔষধ ব্যবহারের পূর্বাহ্নে যদুবাবু ও ডাক্তারের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল পাঠক তাহা শুনিয়াছেন।

তিন

টেরামাইসিন প্রয়োগ করিয়াও ফলোদয় হইল না এবং তাহার পরিমাণ-স্বরূপ যদুবাবুর ভাগ্যাকাশে ডাক্তার চাটুজ্জের উদয় হইল। ডাক্তার চাটুজ্জে ডাকসাইটে ডাক্তার, তাঁহার দাপটে রুগীর অভিভাবক ও স্বয়ং যমরাজ একঘাটে

জল খায়। তিনি ঘরে ঢুকিয়া একবার রুগীকে দেখিয়া লইলেন তারপরে ডাক্তার বোসকে (যিনি আগে চিকিৎসা করিতেছিলেন) বলিলেন, দেখি রিপোর্টগুলো।

আধ মিনিটে রিপোর্ট দেখা শেষ করিয়া ষ্টেথোস্কোপটি নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন—ভেরী সিরিয়স, একে আর একদিনও এখানে রাখবেন না। কালই সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিন। তারপরে ডাক্তার বোসের সুপারিশে চৌষট্টি টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা মাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যদিকে যদুবাবু সপরিবারে বসিয়া পড়িয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন সুইজারল্যাণ্ড, সে কি মশায়!

ডাক্তার বোস বলিলেন, যে রোগের যে ওষুধ।

রামুর মা ছেলেকে কোলে লইয়া বলিলেন, গা-টা বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, দেখিতো একবার থার্মোমিটার দিয়ে।

থার্মোমিটার অভিজাত দোকানের দরের মতো এক বাক্যে ৯৯° হাঁকিল।

রামুর মা রাগিয়া 'তবে রে মুখপোড়া যন্তর' বলিয়া থার্মোমিটারটি মাটিতে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন, থার্মোমিটার শতখণ্ড হইয়া গেল।

ডাক্তার বোস বলিলেন, মিসেস্ রায় থার্মোমিটার ভাঙলেই কি রোগ দূর হবে?

স্ত্রীর ব্যবহারে যদুবাবু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ডাক্তারবাবু আপনার থার্মোমিটারটা বের করুন।

রামুর বগল হইতে ডাক্তারবাবুর থার্মোমিটার বাহির করিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া গেল—একি এ যে ৯৭'৪°।

আবার দিন তো।

এবারের ৯৭'৪°।

আচ্ছা পাশের বাড়ীর থার্মোমিটারটা চেয়ে আনো তো।

তাহাতেও উঠিল ৯৭'৪°।

তবে কি আমাদের থার্মোমিটারটাই খারাপ ছিল?

ডাক্তার বোস বলিল—তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব? এত ওষুধ, এত পরীক্ষা, এতগুলো ডাক্তার সব মিথ্যা হতে পারে না।

কিন্তু তা হলে থার্মোমিটারে জ্বর না উঠবে কেন?

সেটাও একটা রোগ কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমার ছেলে নিয়ে আর পরীক্ষা করতে হবে না বলিয়া রামুর মা ছেলেকে ডাক্তারের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে আমার রামুর কোন অসুখ হয় নি; আমি আগেই জানতাম! যত সব মুখপোড়া—

ডাক্তার বোসের এতক্ষণে বোধ হয় সম্বিত হইল, বলিলেন, তবে বোধ করি থার্মোমিটারটাই খারাপ ছিল। আচ্ছা আসি যদুবাবু।

যদুবাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভাঙা থার্মোমিটারের টুকরাগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

৭৭৭ নম্বর আসামী হাজির হ্যায় ?

৭৭৭ নম্বর আসামী হাজির হ্যায় ?

হ্যায় রে, বাবা হ্যায়, বলিয়া একটি স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি বিচারকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওঃ তুমি! বিচারক একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

আজ্ঞে বলিযা প্রৌঢ় রামহরি একটি অর্দ্ধস্ফুট নমস্কার করিল।

বিচারক নথীপত্রে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন যে তোমার মামলাটা বেশ কৌতূহলজনক। জীবনের প্রথম বাইশ, তেইশ বৎসর পুণ্যের ভাগই বেশি দেখছি। তারপর সব উল্টে গিয়েছে। এই তো দেখতে পাচ্ছি বাইশ বছর পর্যন্ত মিথ্যা কথা একরকম বলোই নি। তারপরে হঠাৎ এত মিথ্যা কথা বলতে সুরু করলে কেন ?

আজ্ঞে তখন যে বিয়ে করলাম।

বিয়ে করলে তো কি ?

হুজুর মনে হচ্ছে বিয়ে করেন নি!

না, করি নি. নথী থেকে মুখ না তুলিয়াই বিচারক বলিলেন। তারপরে আবার, কিন্তু বিয়ের সঙ্গে মিথ্যাকথার সম্বন্ধ কি ?

ঠিক বিয়ের সঙ্গে নয়, বিয়ের ফলে যিনি ঘরে এলেন সেই পত্নীর সঙ্গে।

তুমি তো আচ্ছা বেল্লিক হে, তুমি বলতে চাও তোমার স্ত্রী তোমাকে মিথ্যা শিখিয়েছে।

কি আকারে বললে আপনি ও আমার উক্ত-ফেলে আসা স্ত্রী খুশী হবেন জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা তাই।

আর একটু বুঝিয়ে বলো।

সেই ভালো। দেখুন স্যার, নিতান্ত নির্বোধ ও নপুংসক না হলে কেউ কখনো স্ত্রীর কাছে সদা সত্য কথা বলতে পারে না।

কেন ?

ধরুন একদিন রাত্রে একটু ফিরতে দেরী হ'ল, তখনি এক ঝাঁক প্রশ্নের হুল দংশন করবে, কেন দেরী, কোথায় গিয়েছিলে, মুখে পানের দাগ কেন, অমন

আয়ো কতো কি! তখন একমাত্র উপায় মিথ্যা বলতে হবে যে একজন লোকের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল তাগাদায় গিয়েছিলাম। অমনি তিনি বলবেন দিলে কিছু? কিছু না। বেটা ভারি পাজি।

আচ্ছা, দিলে আমার হাতে এনে দিও। ওটা তো মাসিক আয়ের মধ্যে নয়।

তোমার মাসিক আয় তোমার স্ত্রী জানতো তাহলে।

পাগল নাকি?

কেমন?

কেমন আর কি? বেতন থেকে পঞ্চাশ ষাট টাকা কমিয়ে তাকে জানিয়েছিলাম।

কেন?

কেন কি হুজুর। ঐ পঞ্চাশ ষাট টাকাই আমার যথাসর্বস্ব। আফিসে বা পথে ঘাটে জলটল খেতে হবে তো!

এই তো তোমার নথীতে দেখতে পাচ্ছি যে মদ খেতে। সে টাকাও কি আলাদা রাখতে?

না, না হুজুর, সে খরচ আমার স্ত্রী স্বহস্তে তুলে দিত।

এ কেমন ধারা হ'ল, জল খাওয়ার পয়সা দিত না, মদ খাওয়ার পয়সা দিত!

ওর মধ্যে একটু পলিটিক্স আছে। সময় মতো মাতাল বলে খোঁটা দিতে পারবে এই আশায় মদের পয়সা দিতো।

ও: অনেক মিথ্যা কথা বলেছ যে দেখছি।

অনেক হবে বই কি। ঘণ্টায় আঠারোশ মিথ্যা বল্লে অনেক না হ'য়ে পারে।

কিন্তু মাঝে মাঝে ২।১ মাস ফাঁক কেন?

তখন সে বাপের বাড়ী গিয়েছে।

তোমার তিনটে ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরেছে, আর দুটো মরেছে অচিকিৎসায়। কেন, কারণ দর্শাও।

আজ্ঞে, কারণ প্রায় একই।

কি শুনি!

প্রথম তিনটে মরেছে জল খেয়ে আর শেষের দুটো মরেছে জলপড়া খেয়ে।

সে আবার কি ?

প্রথম প্রথম দুধ খাওয়াতাম, বেশ মোটা সোটা হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময় গিন্নি বল্‌লে আমাদের কি দুধ খাওয়াবার মত অবস্থা! বার্লি আনো। এক কৌটা বার্লিতে এক বছর চল্‌লে তাকে জল ছাড়া আর কি বলে ? বাছারা শুকিয়ে মারা গেল।

আর জলপড়া খেয়ে কি রকম ?

দুজনেরই এক সঙ্গে হ'ল জ্বর, আনলাম ডাক্তার ডেকে। তাদের স্নেহময়ী জননী দিল ডাক্তার বিদায় করে। বল্‌ল, ডাক্তারে তো ভারি জানে। আমাদের গোবরার জলপড়া ধন্বন্তরি। তার পরিণাম যা ঘটবার তিন দিনের মধ্যেই ঘট্‌ল। হুজুর, অন্য ছেলে দুটোও মর্‌তো, কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াই বাধায় তারা বেঁচে গেল। চোরাই কারবারীর সুড়ঙ্গে ইঁদুরের ভূমিকা নিলো। এখন বেশ দু'পয়সা করেছে। ওদের মায়ের বড় আদরের ওরা।

তার মানে ওরা অসদুপায়ে টাকা রোজগার করে ?

অত ঘুরিয়ে বলবার দরকার কি স্যার! চোর! চোর! সন্ধ চোর।

আর সেই চোরকে তাদের মা আদর করে।

তবে কাকে আদর করবে প্রত্যাশা করেন, হুজুর! নেংটেকে!

তুমি কিছু বলো না ?

দু' একবার বল্‌তে গিয়ে শুনলাম যে আমি নাকি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সেটা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অপমানজনক মনে ক'রে বলা ছেড়ে দিয়েছি।

এই যে আবার এক অসহায় বিধবার গচ্ছিত তহবিল ভেঙেছ। এ কাজ করতে গেলে কেন ?

ভেঙেছি নয় স্যার, ভাঙতে বাধ্য হয়েছি।

কেমন ?

তহবিল না ভাঙলে আমার মাথাই ভাঙতো!

কে ?

মাথার যিনি মালিক।

ভগবান ?

পত্নী! স্যার, শাস্ত্রে বলেছে 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি', দারৈরপি করবার সুযোগ আর পেলাম কোথায় ? তাই ধনৈরপি মাথা বাঁচালাম।

অনেক পাপ যে করেছ ? মিথ্যা ভাষণ, অনাহারে ও অচিকিৎসায় পুত্রকন্যা বধ, পরস্বাপহরণ—

আরো আছে হুজুর নাবালক ভাইভগ্নীদের বাড়ী থেকে বিতাড়ন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থবাসে প্রেরণ—

যদি অন্যায় বোঝো তবে এসব কাজ করতে গেলে কেন ?

স্ত্রীর প্ররোচনায় দু'পয়সা বাঁচাবার জন্যে। আরো আছে হুজুর। বলো।

পরদার গমন।

সে আবার কি ?

পাড়ায় এক ধনী যুবতী বিধবা ছিল। তার ইচ্ছা পূরণ ক'রে অনেক টাকা পেলাম।

তোমার স্ত্রী জানতো ?

তাকে খুশী করবার জন্যেই ও কাজ করেছি।

কি বলো! সে কি তোমাকে পরদারগমন করতে বলেছে!

কথায় বলে নি, ইসারায় বলেছে।

কি আশ্চর্য! এ যে মানব-স্বভাব বিরুদ্ধ!

কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

কেমন ?

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম'।

নিজের সুখের জন্য করলে কি আর রক্ষা ছিল! এ যে তাকে খুশী করবার জন্যে করেছি কিনা!

খুশীর কারণ ?

ধনী বিধবার ধন।

এত অকথ্য, জঘন্য পাপ করতে গেলে কোন্ উদ্দেশ্যে ?

উদ্দেশ্য কল্‌কাতা সহরে একটি বাড়ী তৈরী।

তুমি বল্‌তে চাও কল্‌কাতা সহরে যত লোকে যত বাড়ী তৈরী করেছে সমস্তই এই সব উপায়ে ?

হুজুর, যে বাজার পড়েছে, তাতে সৎপথে থেকে একখানা কুঁড়ে ঘর তৈরি করা যায় না, বাকিটুকু আপনি বুঝে নিন।

কিন্তু পাপ ক'রে বাড়ী তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল ?

হুজুর, পাপ হবে আমার, বাড়ী হবে আমার স্ত্রীর, বাধাটা কোথায় ?

কিন্তু বাড়ীর জন্য তোমার স্ত্রীরই এমন আগ্রহ কেন ?

সে-ও শাস্ত্রের কথা হুজুর, শাস্ত্রে সবই আছে। 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।'

তোমার কি ধারণা যে সমস্ত স্ত্রীই এইরকম।

তা কেমন ক'রে বলবো হুজুর, একটার বেশী তো জানবার সৌভাগ্য হয় নি। তবে মনে হয় যে No woman is good enough to to be a man's wife.

সেসব তত্ত্ব কথা থাক। এখন শোনো! এই সমস্ত পাপের দণ্ড একা তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

একশ বার। কি দণ্ড ?

ত্রিশ হাজার বছর নরকবাস।

একটা অনুরোধ আছে হুজুর। আমি ত্রিশ বছর বিবাহিত জীব যাপন করেছি, তাতে ক'রে নরকবাসের মেয়াদ ভোগ কিছু কমেছে কিনা একবার তৌল ক'রে দেখুন।

ঠিক কথা।

বিচারকের আদেশে একজন চাপরাশি রামহরিকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ধর্ম-কাঁটায় তুলিয়া দিল আর কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, ত্রিশ হাজার বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে আরো কিছু ফাও দাঁড়িয়েছে।

বিচারক শুধাইলেন, রামহরি বলো তোমার কি চাই ? অনেকটা সময় তুমি অকারণ দণ্ড ভোগ করেছ। এখন তোর বাঞ্ছাপূরণ করবো, কি চাও ? স্বর্গ না মুক্তি ?

ও দুটোর কোনটাই নয়, আমর ইচ্ছা পুনর্জন্ম।

আবার পুনর্জন্ম ? তুমি কি বাতুল।

না হুজুর, আমি মানুষ। পৃথিবী ছাড়া আর কিছু জানিনে, কেবল এইটুকু দয়া করবেন, আমার কুষ্ঠিতে বিবাহযোগ লিখবেন না, লিখবেন শুধু প্রেমযোগ।

বিচারক বলিলেন—তথাস্তু।

অমনি রামহরির অশরীরী সত্তা শোঁ করিয়া নিম্নমুখী হাউই-এর মতো মর্ত্যলোকের দিকে চলিয়া গেল।

চিত্রগুপ্ত চাপরাশিকে বলিলেন—আজকার মতো বিচার শেষ, নথীপত্রগুলি ভালো ক'রে তুলে রাখ।

গোল্ড ইনজেকশন

পাশের ঘরে আমার সহধর্মিণী করুণ আর্তনাদ করিতেছে, না আছে তাহাতে ছেদ, না আছে স্বরগ্রামের খাদে অবতরণ। এমন তিন দিন চলিতেছে। স্ত্রীলোকের হৃদয় যে পরিমাণে কোমল, ফুসফুস সেই পরিমাণে সতেজ। সদর রাস্তার পাশেই বাড়ীটি। ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বারে বারে ভেজাইয়া দিই, পাছে পথিক অত্যাচার সন্দেহ করিয়া থানায় খবর দেয়। পরিচিত ব্যক্তিরা আত্মীয়তা প্রকাশচ্ছলে আসিয়া, আমার কথিত কারণ শুনিয়া 'তা বটে তা বটে' বলিয়া মুখে চোখে সন্দেহের ছায়া লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোকে অস্থির আর আমি উক্ত আর্তনাদপরায়ণার হতবুদ্ধি হতভাগ্য স্বামী একটা আস্ত চরখির মতো বাড়ীময় ঘুরিয়া মরিতেছি। পাঠক, সমস্তই বলিলাম কিন্তু আর্তনাদের কারণ বলিলাম না, তাই হয় তো এতক্ষণে তুমিও সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছ।

* * * *

সাইকেলের বেল শুনিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম যে ডাক্তারবাবু সাইকেল হইতে নামিতে নামিতে বলিতেছেন—রুগী কেমন ?

আমি তো ভাল বুঝিনা।

ব্যথা ?

আগের মতোই।

হাঁ, তা তো চীৎকার শুনেই মনে হচ্ছে।

রোগটা কি মনে হয় ?

আমি তো গুরুতর কিছু মনে করি না, বাংলায় যাকে কানপাকা বলে তাই।

তাতে এত ব্যথা আর চীৎকার !

সেটা রুগীর উপরে নির্ভর করে, কেউবা মুখবুজে সহ্য করে, কেউবা অল্পেই বেশী ব্যথা অনুভব করে, এ রুগী 'হাইপারসেনসিটিভ'। চলুন রুগী দেখিগে যাই।

ডাক্তার দেখিয়া রুগ্নী স্বরগ্রাম নিখাদের চূড়ান্তে তুলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু আর বোধহয় বেশীক্ষণ নেই।

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া (ডাক্তারবাবুটির সব কথাতেই মৃদু হাসি, ওটাকে তিনি 'এসেটের' মধ্যে গণ্য করেন) বলিলেন, সে রকম আশঙ্কা করবেন না আপনার শরীরে যথেষ্ট বল আছে।

কি ক'রে বুঝলেন ?

ডাক্তারবাবু বলিতে পারিতেন, আপনার ফুসফুসের শক্তি দেখিয়া কিন্তু কিছুই না বলিয়া, একবার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিয়া বিদ্যুতের আলো ফেলিয়া আমার সহধর্মিণীর কর্ণকুহর পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন, আমি তো বিশেষ কিছু দেখি না।

তবে এটা কি ? বলিয়া রুগী বিরাট আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমার ব্যথার অনুপাতে ব্যথার বোধ বেশী তাই—

না হইল আমার বাক্য শেষ, না পাইলাম তার উত্তর। রুগী ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ৩৪ লক্ষ পেনিসিলিন হ'ল।

আচ্ছা আর পাঁচ লাখ দিয়ে যাই, বলিয়া ডাক্তারবাবু ঔষধ ও যন্ত্রপাতির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

* * * *

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে আমি পাষণ্ড নই, আর দশজন স্বামীর মতোই ভালোয় মন্দে (স্ত্রী ছাড়া অপর সকলের কাছেই ভালো) মানুষ; আমার স্ত্রীর কান পাকিয়াছে, তাহার ফলে পাড়ার কানে তালা লাগিবার উপক্রম। এই মফঃস্বল সহরে যতদূর সম্ভব হয় চিকিৎসার ত্রুটি করি নাই, ডাক্তার দিনে ৩।৪ বার আসে—এই আশ্বাসও আমার স্ত্রীকে দিয়াছি যে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা লইয়া যাইব। কিন্তু স্বামীর সান্ত্বনা ও ডাক্তারের চিকিৎসা সত্ত্বেও রুগীর অবস্থার কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে নাই। এমন একটানা আর্তনাদ একমাত্র রণক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু খুব সম্ভব তাহাও বোধ করি সমবেত চেষ্টা ছাড়া হয় না।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু ইনজেকশন সারিয়া জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, এখন চল্‌লাম, ফিরিবার পথে দুপুরবেলা না হয় একবার দেখে যাবো। মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বিদায় হইলেন, রুগী নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পাইয়া আর্তনাদ করিতেই থাকিল।

* * * *

বেলা এগারটা আন্দাজ ডাকঘরের পিওন যখন ভারিগলায় হাঁকিল, পার্শ্বেল বুঝিলাম যে আমার স্ত্রীর আর্তনাদ সনাথ কানের ব্যথা সত্ত্বেও সংসার চক্র তাহার অভ্যস্ত পথেই চলিতেছে। থানা-পুলিশ রেলষ্টীমার, ডাকঘর, আদালত, হাটবাজার, ইস্কুল কলেজ হইতে নেহরুর বক্তৃতা আপন পথ হইতে চুলমাত্র বিচ্যুত হয় নাই।

কি পার্শেল বলিয়া উঠিয়া গেলাম। আলীহোসেন বলিল, ইনশিওর।

আমার নামে একটা ইনশিওর করা ছোট বাক্স আসিয়াছে, যথারীতি সই করিয়া গ্রহণ করিলাম।

ওটা আবার কি এলো? বলিল আর্তনাদের ক্ষণিক অবকাশে আমার স্ত্রী।

কি জানি কি, পরে দেখা যাবে, বলিয়া বাক্সটা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিলাম।

দেখোনা, দেখোনা, কি এলো? ভাবিলাম হয় তো শাপে বর হইল, এই ব্যাপারটার দিকে মন গেলে আর্তনাদে সাময়িক ভাটাপড়া হয়তো অসম্ভব না হইতেও পারে। কাজেই আশু হস্তে বাক্স খুলিয়া ফেলিলাম, সম্পূর্ণ খুলিবার আগেই বিষয়বস্তু বুঝিতে পারিলাম, বলিলাম, রথীনকে (আমার ভাই) কল্‌কাতা থেকে তোমার জন্য যে কদমফুলি দুল পাঠাতে লিখেছিলাম, বোধ হয় তাই এলো।

দেখি কি, দেখি কি—বলিয়া 'উঠিয়া বসিল রোগী শয্যার উপরে।' তিন দিবস পরে এই তাহার প্রথম গাত্রোত্থান।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আবার ব্যথা ট্যথা বাড়িয়া এক কাণ্ড করে বসবে। এখন থাক সারলে পরো।

আর সেরেছে, আর পরেছি।

বাক্সটা ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে। তিন দিনের উপবাসী মরণাপন্ন রুগী একটানে কাঠের বাক্স ও তস্য বন্ধন, কাগজের বাক্স ও তস্য রহস্য মোচন করিয়া ফেলিয়া দোদুল্যমান দুটি কদমফুলি দুল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

স্ত্রী বলিল—যাই বলো রথীনের রুচি আছে, আর জিনিসটাও বেশ ভারি।

আমি শুধু মনে মনে ভাবিলাম টাকা যে রথীনের নয়।

প্রকাশ্যে বলিলাম, ও কেউ নেবেনা, এখন রেখে দাও, কান সারলে পরো।

মুখের জিনিস রেখে দিতে নেই, বলিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিরূপা নারী দুল দুটি কানের (যে কানে তিন দিন আজ পাখীর পালক অবধি স্পর্শ করাবারও উপায় ছিল না) যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল।

বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, নাও এখন শুয়ে পড়ো।

আমি শুয়ে থাকলেই তো বাঁচো—এই বলিয়া তিনদিনের আসন্নমৃত্যু রোগী উঠিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাই বলো রথীনের টেষ্ট আছে। ওকি আবার যাও কোথাও?

পাশের বাড়ীর নতুনদিকে দেখিয়ে আসি, তিনি যে বলেছিলেন…

কিন্তু তোমার যে গুরুতর অসুখ।

আমার গুরুতর অসুখ হ'লেই তো তোমার দিব্যি মজা।

এই বলিয়া ঘৃণাপূর্ণ ধিক্কারপূর্ণ একটা দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া সহধর্মিণী নতুনদির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

* * * *

বেলা বারোটা আন্দাজ 'চীৎকার শুনছিনে কেন' বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল কই, রুগী কই।

আমি উত্তর দিবার আগেই মূর্তিমতী উত্তর অন্ত দ্বারপথে আবির্ভূতা হইল।

ডাক্তারবাবু অধিকতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন একি ব্যথা সারলো কি ক'রে? আমি নীরবে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে কানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলাম—

বলিলাম, গোল্‌ড ইনজেকশন। আমার কথায় ডাক্তারবাবুর মৃদুহাসি অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, বলিলেন, আমাকেই দিতে হবে ভেবেছিলাম, তা আপনিই দিলেন, ভালই হয়েছে।

আপনারা তো বিশ্বাস করবেন না আমার কানের কি ব্যথা। বলিয়া রুগী স্থান ত্যাগ করিল, পাড়ায় এখনো অনেকগুলি দিদি বৌদিকে দেখানো বাকি। সত্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না তাহার কানের কি ব্যথা।

রামায়ণের নূতন ভাষ্য

অভিরামবাবু একজন মনীষী ব্যক্তি। তাঁহার মনীষা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত, অনেকটা মহিষের শিঙের মতো। উক্ত বস্তুর আঘাতে তিনি যে-কোন সমস্যাকে ধরাশায়ী করিতে সক্ষম। এমন অনেক ভূপতিত সমস্যার প্রাণহীন দেহে তাঁহার গতিবিধির পথ আকীর্ণ। তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে ডেপুটি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় যথোচিত প্রোমোশন না পাইবার ফলেই ইংরেজ সরকারের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, আর এ হেন সরকারের উচ্ছেদ কামনা করিয়া আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা করেন।

আবার তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে মাইকেল নিরন্তর ঋণভারে পীড়িত ছিলেন বলিয়াই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছিলেন। দু'য়ে যোগাযোগ ভালো বুঝিলাম না, রাধাবিরহ ও অর্থবিরহ কোন সূত্রে যে যুক্ত তিনিও খুলিয়া বলিলেন না, আমিও শুধাইতে সাহস পাইলাম না। মনীষী ব্যক্তিদের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ক্রোধ। অভিরামবাবুতেও সে লক্ষণ ছিল। তাই তিনি যা বলিতেন নীরবে পরিপাক করিতাম।

অতঃপর একদিন অভিরামবাবু নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রচুর নস্যচূর্ণে পূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সানুনাসিক স্বরে বলিলেন, হৃদয়বাবু আপনাদের রবি ঠাকুরের এই কবিতাটির মর্ম বুঝতে পারেন?

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অধিকতর সানুনাসিক স্বরে আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন—

"আমার কাছে রাজা আমার রইলো অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজনা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দোব তারে ফাঁকি,
রাখবো দেনা বাকি—
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।"

আবৃত্তি শেষ করিয়া শুধাইলেন, বলুন এর অর্থ কি?

অবশ্য একটা অর্থ জানিতাম, কিন্তু সে অর্থ যে অভিরামবাবু পরিকল্পিত অর্থ নয় তাহাও জানিতাম, তাই বলিলাম—আপনিই বলুন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার বলেই আপনাদের ভগবানকে জমিদাররূপে কল্পনা করেছেন, বুঝলেন না ?

অবশ্যই বুঝিলাম, নতুবা তর্ক উঠিয়া অফিসের বেলা অতিক্রান্ত হইবে। সেদিন আমার ভাগ্য ভালো ছিল, তাই অভিরামবাবু জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে অধিক বাগ্ বিস্তার না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

কয়েকদিন পরে অভিরামবাবু এক তাড়া কাগজ হাতে মদীয় নিবাসে উপস্থিত হইয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—একটি প্রবন্ধ লিখেছি।

আমি মনে মনে শঙ্কা মানিয়া বলিলাম, অফিসের বেলা হ'ল যে।

তিনি সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া বলিলেন, রামায়ণের একটি নূতন ভাষ্য রচনা করেছি।

আমি মুখে কৃত্রিম উল্লাস সঞ্চার করিয়া বলিলাম, বেশ তো সন্ধ্যাবেলা শোনা যাবে।

নিন শুনুন। অবশ্য এখন সারমর্ম বলবো, সন্ধ্যাবেলায় প্রবন্ধটি প'ড়ে শোনাবো।

পড়িয়া রহিল অফিস ও অফিসের বেলা।

নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে মানুষের ইতিহাস Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর তিন চাকায় ভর ক'রে চলে।

স্বীকার করিলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে আশায় বলিয়া উঠিলাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রামচন্দ্র হচ্ছেন কৃষি সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে থিসিস। আর রাবণ হচ্ছে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে এন্টিথিসিস্। এবারে বলুন তো সিন্‌থিসিস কি ? বলিয়া সগর্বে আমার দিকে চাহিলেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি সদম্ভে বলিয়া উঠিলেন,

"অতঃপর খুশী হ'য়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

হনুমান হচ্ছে রাম রাবণের সিনথিসিস, বুঝলেন না ? হনুমান।

এবম্প্রকার সিনথিসিসের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, তাই স্বভাবতই বিস্ময়ে নীরব রহিলাম।

তখন তিনি পুনরায় সুরু করিলেন, রাম কৃষি সভ্যতা থিসিস্, রাবণ যান্ত্রিক সভ্যতা এন্টিথিসিস্, হনুমান এ দুয়ের মিলন—সিনথিসিস্

কিন্তু এ দুয়ের মিলন বল্‌তে কোন্ সভ্যতা বোঝায় ?

এ আর বুঝলেন না! টেকনোক্রাসি, হনুমান হচ্ছে টেকনোক্র্যাট, মহাকারিগর, কাজেই সে এ দুয়ের সমন্বয় বা সিনথিসিস।

বলেন কি মশায়, রামায়ণ তো ভক্তিরসের কাব্য।

ওসব আপনাদের কাছে। আপনারা সাহিত্য বিচার করেন, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির দূরবীক্ষণ দিয়ে, আর আমরা মানে প্রগ্রেসিভগণ বিচার করি অর্থনীতির অণুবীক্ষণ বাগিয়ে। মশায় জগৎটা অর্থনীতির তেজি-মন্দিতে তালে তালে পা ফেলে চলছে। সেই চলার পথের ছন্দকেই বলে থিসিস্, এন্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্, বুঝলেন।

কিন্তু তখন আর হাঁ, না বলিবার তত আবশ্যক ছিল না, কারণ অফিসের বেলা বহুক্ষণ অতিক্রান্ত। অতঃপর তিনি প্রকাণ্ড এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আর আমার মনের মধ্যে রামায়ণের নূতন ভাষ্য 'বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।'

ক'দিন আর অভিরামবাবুর দেখা নাই, ভাবিলাম একদিন সন্ধান লইব। এমন সময়ে উভয়ের পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

হাঁ মশায়, অভিরামবাবুর খবর কি ?

জানেন না বুঝি ? ভদ্রলোক বড়ই বিপন্ন।

কি রকম ?

ওঁর স্ত্রী ঘর ছেড়ে গৈরিক ধারণ ক'রে—মঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

হঠাৎ ?

হঠাৎ নয়। অভিরামবাবু যেমন প্রচণ্ড নাস্তিক, ওঁর স্ত্রীর তেমনি ধর্মের প্রবল টান। শেষে আর স্বামীকে সহ্য করতে না পেরে ভদ্রমহিলা মঠে গিয়ে উঠেছেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আর তখনই মনে পড়িল, থিসিস্ ও এন্টিথিসিস্। কিন্তু সিনথিসিসও যে হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল তাহা কি জানিতাম!

আরও বিপদ কি জানেন। ওঁর একমাত্র সন্তান পুত্রটিও নিরুদ্দেশ।

কোথায় গেল ?

কেউ জানে না। কিম্বা যে জানতো সেও নিরুদ্দেশ।

কে ?

পাড়ার একটি মেয়ে।

দু'জনে একসঙ্গে গেছে ?

যোগাযোগ দেখে তাই মনে হয়।

শুধু হাতে ছেলেটি নিরুদ্দিষ্ট হ'ল ?

একেবারে শুধু হাতে নয়। বাপের টাকাকড়ি ও মায়ের অলঙ্কার কিছুই রেখে যায় নি। আচ্ছা, এখন আসি। আর এক সময়ে এসে বিস্তারিত খবর দিয়ে যাবো।

বুঝিলাম যে অভিরামবাবুর ভাষ্য কেবল রামায়ণ সম্বন্ধেই সত্য নয়, তাঁর নিজ পরিবার সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। কেননা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পিতা অভিরামবাবু নাস্তিক্যের প্রতিনিধি তিনি থিসিস্, মাতা ধর্মের প্রতিনিধি তিনি এন্টিথিসিস্—আর পুত্র প্রেমের প্রতিনিধি সে সিনথিসিস্। আর এ সবের মূলে অর্থনীতির ধাক্কাটাও সক্রিয়—পুত্র যাইবার সময় টাকাকড়ি ও অলঙ্কার লইতে ভোলে নাই। বুঝিলাম যে অভিরামবাবুর মনীষা ও ভাষ্য সত্যই আসল বস্তুকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাহা ঐ হনুর লেজের মতোই বিপুল রহস্যময়। মাথার মধ্যে ক্রমাগত পাক হইয়া ঘুরিতে লাগিল—

"অতঃপর খুশী হয়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

* * * *

রাশিফল

ওরে বাবা অতবড় জ্যোতিষী কল্‌কাতা সহরে আর নেই।

কই নাম তো শুনিনি।

নামের কাঙাল তিনি নন, তাছাড়া তিনি যে প্রফেশনাল নন।

বেশ তো একদিন নিয়ে চলুন না।

যেদিন খুশী চলুন। তবে আগে নোটিশ না দিয়ে গেলে ফিরে আসতে হ'তে পারে।

এত ভিড়।

হবে না! মন্ত্রী, উপমন্ত্রী থেকে বড় বড় অফিসার সব কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলেন কি!

যা দেখেছি তাই বলছি। যিনি যত বড়ই হোন জ্যোতিষী, ডাক্তার আর মহাজনের কাছে সবাই অসহায়।

তাহলে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কোন্ ভরসায়?

আমাদের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের সম্বন্ধ, বিশেষ স্নেহ করেন আমাকে।

তবে আর দেরী নয় চলুন।

এই বলিয়া তিনজনে উঠিয়া পড়িলাম।

উপরোক্ত সংলাপ হইতে বুদ্ধিমান্ পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছেন। আর দু' একটা কথা বলিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

জ্যোতিষীর মহিমা কীর্তন যিনি করিতেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে সামাজিক সূত্রে পরিচিত, আর আমরা দুইজনে সাহিত্যিক।

২

তিন জনে আমরা যখন জ্যোতিষীর খাস কামরায় প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সত্যই কয়েকজন লোক সেখানে উপবিষ্ট। তবে তাহাদের কাহাকেও মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী বলিয়া মনে হইল না। অবশ্য তাহাদের চেহারা—চরিত্র, কথাবার্তা ও হাবভাব যে রকম তাহাতে অচির ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ বা কেহ কেহ মন্ত্রীপদ পাইলে অন্ততঃ আমি তো বিস্মিত হইব না।

আর একদিকে ঐ যে একাকী যিনি নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজিত তিনিই নিঃসন্দেহে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী যাহার কাছে মন্ত্রী ও বাছা বাছা অফিসারগণ অসহায় বোধ করিয়া থাকেন। এ হেন মহিমময় পুরুষের মুখমণ্ডলে যে দিব্য দীপ্তি সকলে আশা করিয়া থাকে তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না, কিন্তু কলিযুগের শেষ পাদে আশানুরূপ কয়টা কার্য হইয়া থাকে। ক্ষণকাল তরে মনে হইল তাঁহার মস্তকে একটা কিসের যেন আভা। না, উহা প্রচুর তৈলনিষিক্ত কেশদামে বৈদ্যুত বর্তিকার প্রতিফলন মাত্র। একবার মনে হইল তাঁহার ত্রিকালদর্শী চক্ষুদ্বয়ে কিসের যেন দীপ্তি! না, পরে, হায় অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম উহা দর্শক সমাগমজনিত আনন্দ কৌতুক। একবার মনে হইল, না, আর মনে হইবার সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ নাই।

অপরেশবাবু, যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি, বলিলেন—স্যার এঁদের নিয়ে এলাম। এঁরা খুব বড় সাহিত্যিক।

এই বলিয়া এ পর্যন্ত যে-সব পুস্তক আমরা লিখি নাই বা কখনো লিখিব এখন ক্ষীণতম ইচ্ছাও নাই সেই সব গ্রন্থের গ্রন্থকার বলিয়া আমাদের বর্ণনা করিলেন।

নমস্কার, বসুন, 'বসুন।

ভাবী মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর দল চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল, আর আমরা, কিনা ভাবী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দল উপবেশন করিলাম।

চা আনতে বলবো?

না, না, থাক।

বেশ তবে থাক। বুঝলেন অপরেশবাবু, কাল অনেক রাত্রে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল্ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে।

হঠাৎ?

হঠাৎ! এরই তো অপর নাম অদৃষ্ট! নেহরু নাকি তাঁকে ক্যাবিনেটে রাখতে চান না। কি হবে জানতে চান। আমি বললুম—মা ভৈঃ আপনি থাকবেনই।

আশ্চর্য!

এ অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু আজ সকালে যা ঘটেছে—তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আবার কি হ'ল?

এক মস্ত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির, শেয়ারের দর পড়ছে, এখন কি করবে জানতে চায়। আমি একটু চিন্তা ক'রে বললাম, আজ দুপুরেই দর চড়তে সুরু করবে, রামজীর নাম ক'রে বাড়ী ফিরে যান।

চড়েছে ?

চড়েছে বলে চড়েছে। এই দু'ঘণ্টা আগে ফোন ক'রে হাজার হাজার সুক্রিয়া জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর তুলনায় নিজেদের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল, দুইজনে হতবাক্ হইয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু অতঃপর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহার দাপটে হতবুদ্ধি হয় না এমন লোক স্বর্গধামে থাকিলেও মর্তলোকে নাই। জ্যোতিষী কৃষ্ণচরণবাবু তাঁহার ভক্ত অপরেশবাবুকে বিশ্বের যাবতীয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিতে লাগিলেন, তাহারই ছিটেফোঁটাতে আমাদের সাষ্টাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। বরাবর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি যে জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যৎ গণনায় যেমন উদার ভূতকাল গণনায় ততটা নহেন। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। আগামী বিশ্বযুদ্ধ কবে বাধিবে, কোন্ কোন্ রাষ্ট্র থাকিবে, ভারত নিরপেক্ষ কিম্বা মুখাপেক্ষী থাকিবে দেখিলাম সমস্তই কৃষ্ণচরণবাবুর নখদর্পণে। মনে হইল কিছুক্ষণের জন্য বিধাতার সেক্রেটারিয়েট স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চেম্বারে আশ্রয় লইয়াছে। ঘণ্টাখানেক এইরূপ চলিবার পরে তিনি উঠিলেন, কাজেই আমরাও উঠিলাম।

বাহিরে আসিলে আমি অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে বলিলাম—একটু চা খেলে হ'তনা ?

বেশ তো চলুন।

আমরা কৃতার্থ বোধ করিলাম, বিশ্বের অন্ধিসন্ধির রহস্য যাঁহার নোটবুকে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণে চা পান করিতে রাজি হইয়াছেন—এ যে মহত্তের লীলা।

একটি আভিজাত্য সম্পন্ন রেস্তোঁরায় গিয়া চারজনে বসিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে কৃষ্ণচরণবাবুতে মহাপুরুষোচিত অনেক লক্ষণই বর্তমান, এবং আমিষ নিরামিষে সমদৃষ্টি। ভোজনান্তে যখন উঠিলাম তখন তাঁর উদরপূর্তির সূত্রে অনেককয়টি রজত মুদ্রা বাহির হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছিল, এত বড় জ্যোতিষীকে তো তখন ট্রামে বাসে

বিদায় করিয়া দেওয়া যায় না—তাই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাঁহার স্বনিকেতনে পৌঁছাইয়া দিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময়ে আমাদের প্রথম সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, মনে হইল যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম, নিজেদের ভাগ্যগণনা সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করা হয় নাই। কিছুই আশ্চর্য নয়। মহাপুরুষ সঙ্গ আত্মপ্রসঙ্গ ভুলাইয়া দেয়—ঐখানেই তো তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

দুই বন্ধু বাড়ী ফিরিলাম। দেখিলাম যে আমার বৈঠকখানার তক্তপোষের উপরে সকালবেলাকার সংবাদপত্রখানা পড়িয়া আছে। প্রথম নজরেই চোখে পড়িল—এ সপ্তাহের ফলাফল।' মীন রাশির অর্থক্ষয়, আমার মীন রাশি। মেষ রাশি 'প্রবঞ্চকের হাতে পড়িবে'—বন্ধুর মেষ রাশি। আমাদের দুইজনের মুখে সমস্বরে বাহির হইল—'শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষের গণনাই সত্যি।' টাকা কয়টি বৃথা খরচ হয় নাই ভাবিয়া একপ্রকার সান্ত্বনা পাইলাম।

অলঙ্কার

বিবাহের পরদিন যমুনা শ্বশুর গৃহে রওনা হইতেছে। পাল্কীতে উঠিবার সময় অশ্রুমুখী জননী তাহাকে বলিলেন—মা, স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সতীত্ব ও অলঙ্কার। এ দুটি বস্তু সযত্নে রক্ষা করো।

যমুনা কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইল—আর জননীর কথা দুটি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল—সতীত্ব ও অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি—এ দুটি সযত্নে রক্ষা করো।

যমুনাকে যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা বুঝিলেন না দুটি রক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে প্রথমটি হারাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা তাহার ছিল না। এরূপ কুৎসিত ও মুখরা রমণী বিধাতা বোধ করি একটির অধিক সৃষ্টি করেন নাই। তাই সে প্রথমটি সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বিতীয়টির রক্ষায় মন দিল।

শ্বশুরগৃহে আসিবার অল্প পরেই যমুনার শাশুড়ী ঠাকুরাণী পরলোকগমন করিলেন। যমুনা তখন বাড়ির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিল—সংসারে রহিল কেবল তাহার স্বামী ও সে নিজে। সাধারণতঃ সংসারে দু'চার জন ঝি চাকরও থাকে, যমুনার সংসারে ছিলও বটে, কিন্তু তাহার মুখের ধারে পুরাতন লোক একে একে সরিয়া পড়িল, নূতন লোক আসিল না। কাজেই যমুনা মনের সুখে নিঃসপত্ন রাজত্ব করিতে লাগিল। দুটি প্রাণীর সংসারে কাজ-কর্ম্ম অল্প, বিধায় জননীর আদেশ পালনে সে উদ্যত হইল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ভদ্র-নিয়ম-বহির্ভূত, কাজেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহার পতি-দেবতাও তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আলোচনায় বাধা নাই—বস্তুতঃ সেই আলোচনাই এ গল্পটি।

যমুনা শ্বশুরগৃহে একটি লোহার সিন্দুক পাইলে সেই সিন্দুকের অন্ধকার গর্ভে সযত্নে অলঙ্কারগুলি রক্ষা করিয়া কুলুপ আঁটিয়া তাহা সন্তর্পণে বাঁধিল। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যেও অলঙ্কারগুলি সে বাহির করিত না—এমনি সতর্কতা।

২

একবার সদর খাজনা দাখিলের সময় কিছু টাকার টানাটানি পড়ায় যমুনার স্বামী নরেশ বলিল, দু'চারখানা গহনা দাও, ধান উঠলেই ফিরিয়ে দেবো।

যমুনা জননীর উপদেশের শেষাংশ আবৃত্তি করিয়া বলিল—অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ও দিতে নেই।

এ সম্পত্তিও যে তোমার, খাজনার দায়ে যায় যে!

তার আমি কি করবো।

তবে টাকা কোথায় পাই?

ধার ক'রো গে, না পাও চুরি ক'রো গে—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ধার ও চুরি কিছুই সম্ভব না হওয়ায় নরেশের একখানা তৌজি সেবারে নীলাম হইয়া গেল।

যমুনা ভাবিল সর্ব্বনাশ। সম্পত্তি তো গেলই, সঙ্গে অলঙ্কারও যাইত। সেই অভিজ্ঞতায় সে স্থির করিয়া ফেলিল যে কখনো কোন ছলনাতেই আর অলঙ্কার দিবার নামটিও করিবে না।*

পাচ সাত বছর পর পর অজন্মা ও বন্যা প্রভৃতি হওয়ায় সম্পত্তি হইতে রীতিমতো খাজনা আদায় হইল না আর সদর খাজনার দায়ে একে একে সবগুলি তৌজি নীলাম হইয়া যাওয়ায় নরেশ প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইল। নিতান্ত বিপন্ন হইয়া আরো দু'একবার সে স্ত্রীর কাছে হাত পাতিয়াছে আর উত্তর শুনিয়াছে যে সম্পত্তির সঙ্গে আমার অলঙ্কারগুলোও যাক্—এই তো চাও। সেটি হবে না।

অবশ্য কথাগুলি ঠিক এই ভাষায় কথিত হয় নাই—সে ভাষা একমাত্র যমুনার আয়ত্ত হওয়ায় অপরের পক্ষে তাহার ব্যবহার সম্ভব নয়।

অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত ভগ্নহৃদয় নরেশ কঠিন পীড়ায় পড়িল। গাঁয়ের ডাক্তার দু'চারদিন চিকিৎসা করিয়া যমুনাকে বলিল—মা, রোগের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না, সদর থেকে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করান।

সে যে অনেক টাকার দরকার।

দু'চারখানা অলঙ্কার বেচুন, স্বামী স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

যমুনা ইহার বিপরীত উপদেশ পাইয়াছে। তাই বলিল—দেখি কি করা যায়।

অর্থাৎ, অলঙ্কার রক্ষা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নাই ইহাই তাহার মনোগত ভাব।

তারপরে যথাকালে কালপূর্ণ হইবার অনেক আগেই যমুনার সযত্নে-রক্ষিত অলঙ্কারের স্তূপ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া নরেশ পরলোকে প্রস্থান করিল।

যমুনা আন্তরিক দুঃখে কাঁদিল, কিন্তু কোন্ কালোমেঘে না সুবর্ণের রেখা আছে! গভীর দুঃখের মধ্যে মুহুর্মুহু তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল—সংসারে আর কিছু না থাক্ স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অলঙ্কারগুলি তো অন্ততঃ আছে! অমনি একপ্রকার অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনা সে অনুভব করিল। সংসার সত্যই সুখের স্থান!

সকলে বলিল, নরেশবাবু একটা দিক্পাল ছিলেন, শ্রাদ্ধাদি যোগ্যমত করুন।

সদ্য বিধবা বলিল—টাকা কোথায়?

একজন বলিল, দু'চারখানা অলঙ্কার বেচুন—এই তো সময়।

যমুনা যাহা ভাবিল মুখে তাহা উচ্চার্য্য নয়।

নমো নমো করিয়া শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল।

যমুনার ভাই আসিয়া বলিল, দিদি আর কেন? এবারে চলো একটা সহরে গিয়ে বাস করি।

যমুনা বলিল, আমার কি অসাধ! কিন্তু সাধ্য কই!

কেন, তোমার তো প্রচুর অলঙ্কার আছে, বিক্রি করো।

মা উপদেশ দিয়েছিলেন অলঙ্কার বেচতে নাই।

ভাই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

যমুনা গ্রামেই রহিল আর কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে পড়শীরা আসিয়া বলিত, বউ এত কষ্ট করো কেন, কিছু ধানী জমি কিনে ফেল।

আমার অদৃষ্টে সে সুখ কি আছে ভাই—টাকা কোথায়?

কেন, কিছু অলঙ্কার বেচো।

না ভাই, ও করতে নাই।

সিন্দুকে প্রচুর অলঙ্কার সযত্নে রক্ষা করিয়া যমুনা শাকান্নে জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

যমুনার অভ্যাস ছিল বিজয়া দশমীর দিনে সিন্দুক খুলিয়া অলঙ্কারগুলিতে শান্তিজল ছিটাইত আর নয়ন ভরিয়া সেগুলি নিরীক্ষণ করিয়া নারী-জন্ম ধন্য করিত। জীবনে ঐ দিনটি তাহার চরম সুখের—সেই সুখে সারা বছরের অভাব ও ক্লেশ ভুলিয়া যাইত।

সেদিন বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রদীপ ও শান্তির জল হাতে সিন্দুক

সমীপে উপস্থিত হইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু একি! গহনার বাক্সটি কোথায়? ক্ষীণ দীপালোকের উপরে ভরসা না করিয়া একটি লণ্ঠন আনিয়া ফেলিল—প্রদীপ ও লণ্ঠন দু'য়েরই সাক্ষ্য এক, গহনার বাক্স নাই—তার স্থানে খান তিনেক খান ইট। যমুনা পাগলের মতো ইঁটগুলায় টান মারিতেই এক টুকরা কাগজ চোখে পড়িল। লণ্ঠনের আলোয় দেখিল কাগজে কি লেখা। সে আশায়, আগ্রহে ও আশঙ্কায় পাঠ করিল—"মা ঠাকরুন্, গহনায় তোমার দরকার নাই, কেবল গহনা আছে এই বোধটাই যথেষ্ট। আমার বিশেষ দরকার। যে গহনা কখনও ব্যবহার করিলে না, কখনো করিবে মনে হয় না, তাহার মূল্য কি! তাই তাহার পরিবর্ত্তে তিন খানা খান ইঁট রাখিয়া গেলাম—মনে করো ঐ তোমার অলঙ্কার। বিশেষ ইতরবিশেষ হইবে না। ইতি নিদারুণ অভাবগ্রস্ত।"

চিঠি পড়িয়া সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল—আঁটকুড়ের বেটা! আঁটকুড়ের বেটা! অলঙ্কারগুলি কে লইল, কেমন করিয়া লইল এসব জটিল কথা ভাবিবার মতো তাহার মনের অবস্থা ছিল না। মাথা কুটিতে কুটিতে রক্ত পড়িয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অনেক রাত্রে মূর্চ্ছা ভাঙিলে হঠাৎ ঐ চিঠিখানির উপদেশ একটি পরম তত্ত্বরূপে তাহার মনে উদিত হইল। সত্যই তো তাহার কি এমন ক্ষতি হইয়াছে! ঐ খান ইঁটগুলোর আর অলঙ্কারের কি তাহার কাছে সত্যই সমান মূল্য নয়! বাকি রাত্রিটুকু ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে গেল। ভোররাত্রে ইঁটগুলো সযত্নে সিন্দুকে রাখিয়া সিন্দুকের তালা বন্ধ করিল।

কয়েক দিন পরে তাহার একখানা ঘর পুড়িয়া গেল।

পড়শীরা বলিল—নতুন ঘর তোল।

টাকা কোথায়?

এবার ২।১ খানা অলঙ্কার বেচো।

না ভাই, ও বস্তু বেচতে নাই, অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি,

পড়শীরা রাগিয়া উঠিয়া গেল, তবে সোনার তাল সিন্দুকে রেখে রোদে জলে ভিজে মরো।

যমুনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যার যেমন কপাল ভাই। অলঙ্কার হরণের আগে ও পরে তাহার জীবনে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে এমন কেহ লক্ষ্য করিল না। যমুনার দিন আগের মতোই সুখে এবং আগের মতোই দুঃখে চলিতে লাগিল।

অদৃষ্ট-সুখী

কোন দেশে 'অদৃষ্ট-সুখী' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি বাস করিত। সংসারে তাহার কোন অভাব ছিল না, তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ছিল, স্নেহময়ী পত্নী ছিল, সহানুভূতিসম্পন্ন আত্মীয় স্বজন ছিল, দাস দাসী প্রচুর ছিল। তবু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্ধ ব্যক্তি কবে সুখী? সংসারে অন্ধব্যক্তির যে-সব অসুবিধা হইয়া থাকে অদৃষ্ট-সুখীর তাহার কোনটিই ছিল না। সে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যাহার দাস দাসী প্রচুর তাহার না দেখিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। হাতে ধরিয়া চলাফেরা করাইবার লোকের তাহার অভাব ছিল না। সকালে বিকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইত, যখন যাহা প্রয়োজন চাহিবার আগেই তাহা জুটিত। সকলে বলিত লোকটা সুখী বটে। তাহার দৃষ্টির অভাব আর দশ রকম প্রাচুর্য্যের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—লোকের চোখে পড়িত না। কিন্তু অদৃষ্ট-সুখীর মনে শান্তি ছিল না, সে ভাবিত কেবল যদি দৃষ্টি পাইতাম, আর কিছু চাহিতাম না। সে গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকে স্নেহময়ী পত্নী আসিয়া মধুর কণ্ঠে শুধাইত, তুমি গম্ভীর হয়ে আছ কেন? কিসের তোমার অভাব? তাহার পিতা বলিত, বৎস, তোমার নামে আজ একটি নূতন সম্পত্তি কিনলাম। মাতা পুত্রবধূকে বলিত, বৌমা, তুমি একটু বাছার কাছে গিয়ে ব'সো না—তোমার সংসারের কাজের মধ্যে থাকবার প্রয়োজন কি? বন্ধুরা বলিত, ভায়া, এই নাও গোলাপ ফুলের তোড়া, তোমার নূতন বাগানের ফুল—এমন ফুল আমরা চোখে দেখি নাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিত—ভাই আমিও চোখে দেখি নাই—

বন্ধুরা বলিত, তা হলে আর তোমাতে আমাদের প্রভেদ কি?

তারপরে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, চোখে দেখতে পেলেই কি লোকে সুখী হয়? এই তো ও পাড়ার গোবিন্দ—চোখ তার দুটো বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে দেখার মতো একটা বস্তুও কি তার ঘরে আছে? সে না পায় খেতে, না পায় পরতে! ভগবান তোমার উপর খুশী নিশ্চয়!

অদৃষ্ট-সুখী ভাবিত, হায়, ভগবান খুশী হইলে আমার এমন দশা হইবে কেন? সে ভাবিত লোকে বলে আকাশ নীল, পৃথিবী সবুজ, দিবস উজ্জ্বল, রাত্রি নক্ষত্রময়, লোকে বলে আমার পত্নী সুন্দরী, আমার পিতা সুপুরুষ—কিন্তু আমার

কাছে সবই অন্ধকার। ইহা কি ভগবানের খুশীর লক্ষণ? সে ভাবিত আমার মতো হতভাগ্য কে?

ক্রমে তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। আত্মহত্যা করিবে বলিয়া সে স্থির করিল—অন্ধের পক্ষে আত্মহত্যা করাও সহজ নয়, কারণ সে পরাধীন। তখন সে সঙ্কল্প করিল যে ভগবানের সাধনা করিয়া দেখিবে, সে শুনিয়াছে যে সাধনায় ভগবান খুশী হন, আর খুশী হইলে তিনি মানুষকে অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন। তখন সে বাড়ীর বাগানের একটি আতাগাছের তলায় বসিয়া তপস্যায় মন দিল। তিন দিন তিন রাত্রি কঠোর তপস্যায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—বৎস, আমি খুশী হইয়াছি—তুমি বর প্রার্থনা করো।

অদৃষ্ট-সুখী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—ভগবান, যদি সত্যই খুশী হইয়া থাকো, তবে আমাকে দৃষ্টি দাও।

ভগবান বলিলেন—বৎস, অন্য বর প্রার্থনা করো।

সে বলিল—আমার অন্য কিছুর অভাব নাই—

ভগবান বলিলেন—কত লোকের কত অভাব থাকে। তোমার একটিমাত্র অভাব—তবু তুমি সন্তুষ্ট নও কেন?

সে বলিল—আমার শত অভাব ঘটুক, কেবল দৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া দাও।

ভগবান বলিলেন—চোখে দেখিতে পাইলেই কি মানুষ সুখী হয়? বৎস, আমার কথা শোনো, সুখ দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে না, কাজেই দৃষ্টি তুমি চাহিও না।

কিন্তু অদৃষ্ট-সুখী কিছুতেই ছাড়িবে না। মানুষের স্বভাব এই যে তাদের একটি মাত্র অভাব থাকিলেও সে অসুখী বোধ করে, সে ভাবে তাদের শত দুঃখ ওই অভাবটির রন্ধ্রপথে আসিতেছে। করায়ত্ত শত সুখ অনায়ত্ত একটি অভাবের চেয়ে ছোট মনে হয়।

ভগবান তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বলিলেন, বৎস তুমি দৃষ্টি লাভ করিবে বটে কিন্তু সুখী হইবে কিনা বলিতে পারি না। কাল সকালে তুমি দৃষ্টি পাইবে। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্টসুখী সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর ভিতরে ফিরিয়া আসিল।

২

পরদিন প্রাতঃকালে অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিবামাত্র সমস্তই দেখিতে পাইল। জগতের সহিত এই তাহার প্রথম শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি মাত্রই যে সুখ-দৃষ্টি নহে বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত। অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিয়া প্রথম কি দেখিতে পাইল? দেখিল তার পত্নী তখনও নিদ্রিত। সে দেখিতে পাইল, তাহার সুন্দরী পত্নীর নাকের নীচে অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল একটি গোঁফের রেখা। সে শুনিয়াছিল স্ত্রীলোকের গোঁফ, দাড়ি ওঠে না। তবে তাহার পত্নীর বেলায় এমন ব্যতিক্রম কেন? না সকলেরই এমন আছে? তাহার মনে হইল নিয়মই হোক আর ব্যতিক্রমই হোক ওই অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল লোমটি না থাকিলেই ছিল ভালো। ইহাই তাহার চোখের দৃষ্টির প্রথম অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা এই যে সে অন্ধের সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে চেষ্টা করা মাত্র পাঁচ সাত জন চাকর আসিয়া ধরিয়া ফেলিল—বলিল, এ কি দাদাবাবু প'ড়ে যাবেন যে।

দুই দিন পরে আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যখন তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল তাহারা প্রকাশ্যে অদৃষ্ট-সুখীকে নিমকহারাম বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল, সংসারে কৃতজ্ঞতা নাই, নইলে কাজ ফুরোলে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে কেন? দৃষ্টিলাভ করিয়া অদৃষ্ট-সুখী যে অন্যায় করিয়াছে ইহাই তাহাদের অভিমত। ইহা তো দুই দিন পরের অভিজ্ঞতা। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এখনো বর্ণনা করা হয় নাই।

অদৃষ্ট-সুখীর দৃষ্টিলাভে তাহার স্নেহময়ী জননী বলিল—ছি বাছা, এতদিন চোখ বুজে থেকে কি বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিতে হয়? তুমি তো আমার ভাল ছেলে!

পিতা আসিয়া বলিল—যাক্ ভালোই হ'ল। এখন তো ওর কোন কষ্ট নেই। নূতন সম্পত্তিটা ওর একার নামে না রেখে ওদের কয়েক ভাইয়ের নামে ক'রে দেবো।

সাধ্বী স্ত্রী সম্মুখে আসিল। হাসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—যা হোক্ এতদিন খুব ঢঙ করলে—এমন নাকি মানুষেও পারে?

অদৃষ্ট-সুখী স্ত্রীর কথা কানে না তুলিয়া তাহার পত্নীর গুম্ফরেখার দিকে

তাকাইয়া রহিল। পত্নী চারুবালার চোখ দুটি সুন্দর বলিয়া তাহার মনে একটু অভিমান ছিল। তাহার আশা ছিল সম্ভলব্ধদৃষ্ট স্বামী পত্নীর চোখ দুটি দেখিবে, প্রশংসা করিবে। কিন্তু স্বামীকে চোখের দিকে না তাকাইয়া নাকের নীচে তাকাইতে দেখিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—কি দেখা হচ্ছে?

চারুবালা বোধকরি দর্পণ যোগে নিজের দুর্ব্বলতার ক্ষীণ চিহ্নটুকু দেখিয়াছে। স্বামী কোন কথা না বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। সাধ্বী স্ত্রীর কাছে স্বামীর মনের কথা গোপন থাকে না, দীর্ঘনিশ্বাস তো সামান্য। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার ছাড়িয়া ক্রেঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—মেয়ে মানুষ কি এর আগে দেখনি?

স্বামী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিত সত্যই দেখি নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চারুবালা গৃহান্তরিত হইল।

তার পরে বন্ধুরা আসিয়া বলিল—ভায়া খুব চলানটাই চলালে। অন্ধ নাম নিয়ে থেকে পাড়ার মেয়েগুলোকে নির্ব্বিবাদে দেখেছ। আমাদের সামনে মেয়েগুলো আসতে চায় না—অথচ অন্ধ বলে তোমাকে লজ্জা করতো না, খুব মতলব যাহোক করেছিলে, ব্রেভো—এই বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

সে শুনিতে পাইল চাকর দাসীগণ আড়ালে ঠেলাঠেলি করিতেছে—আসল কথা কি জানো। এতদিন বৌমার উপরে অভিমান ক'রে চোখ বুজে ছিল—মানভঙ্গের পরে এবার কলির কেষ্ট চোখ মেলেছে।

রাত্রে পত্নী পাশ ফিরিয়া শুইল—স্বামীকে নাকের নীচের অংশ দেখিবার সুযোগ দিল না। আর বিনিদ্র অদৃষ্ট-সুখী সারাদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া ভাবিল শেষ পর্য্যন্ত বিধাতার কথাই কি সত্য হইবে নাকি? অন্ধত্বরূপ একটি দুঃখের পরিবর্ত্তে একাধিক অগ্নিকুণ্ডে পড়িলাম নাকি? সে ভাবিল—দেখাই যাক্—সংসারেব রহস্য একদিনে বুঝিয়া ওঠা যায় না। অদৃষ্ট-সুখী দৃষ্ট-সুখী হইবে আশা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

পরদিন অদৃষ্ট-সুখীর পুত্র স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে শুধাইল—বাবা, প্রতারক শব্দের অর্থ কি?

পিতা বলিল—যে বলে এক, করে আর, যে লোককে ঠকায়। তারপরে শুধাইল, কেন রে?

পুত্র বলিল—পণ্ডিত মশায় আজ তোমাকে প্রতারক বলেছে।

পিতা শুধাইল—কেন?

পুত্র বলিল—প্রতারক শব্দের অর্থ বল্‌তে গিয়ে গিয়ে পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন যেমন আর কি নন্তুর বাপ। সে অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ বলে' লোককে বলে।

পিতা পণ্ডিতের উপর রাগিয়া পুত্রকে এক চড় মারিল—সে পাড়া-জাগানো স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। তাহার কাছে সব কথা শুনিয়া মাতা আসিয়া অদৃষ্ট-সুখীর ঘাড়ে পড়িল, বলিল—সকাল বেলাতে নন্তুকে মারলে কেন? বলি তোমার হয়েছে কি? তুমি কি হাতীর পাঁচ পা দেখেছ নাকি?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তাই বলে কি আমি প্রতারক।

পত্নী বলিতে পারিত সে কি নন্তুর দোষ; কিন্তু সে তর্কে প্রবেশ না করিয়া বলিল—প্রতারক বই কি। একেবারে প্রতারক! ঢং ক'রে চোখ বুজে থেকে খাটিয়ে খাটিয়ে আমার হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে দিয়েছ, তুমি যদি প্রতারক না হও তো তবে কি ও পাড়ার রাম শর্ম্মা প্রতারক?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—আমার দৃষ্টিলাভ করায় তোমরা খুশী হওনি দেখছি।

পত্নী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—হইনি তো! অন্ধ অন্ধের মতো থাকো—তার আবার এত আহ্লাদ কেন?

এই বলিয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

অদৃষ্ট-সুখী দেখিল বিধাতার সতর্ক-বাণী অমূলক নয়। তাহার দৃষ্টিলাভে কেহ সুখী হইয়াছে মনে হইল না। তাহার পিতা বলে—চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে কেন। এবারে বিষয় সম্পত্তি একবার দেখা শোনা করো।

মাতা বলে—এতকাল কেন মিছা কষ্ট দিলে।

পত্নী যাহা বলে—আগেই শুনিয়াছি।

ভাইরা বলে—বাবু এতদিন খুব মজা করেছে, এবারে খাটুক। এমন আরাম পেলে সংসারসুদ্ধ লোক অন্ধ হ'য়ে থাকতে রাজী আছে।

পাড়ার মেয়েরা বলে—ভারি সেয়ানা, অন্ধ সেজে থেকে সব দেখে নিতো।

অদৃষ্ট সুখী দেখিল যে বন্ধুরা পরিহাসছলে গঞ্জনা দেয়, ভৃত্যেরা গঞ্জনাছলে পরিহাস করে, প্রতিবেশীগণ অনুযোগ-প্রতিযোগের আর অন্ত নাই। তখন তাহার মনে হইল অন্ধ থাকিতেই সে সুখী ছিল, অন্ধত্ব ফিরিয়া পাওয়াই তখন তাহার কামনা হইল।

আবার সে বাগানের আতাগাছটির তলায় গিয়া বসিয়া তপস্যা শুরু

করিল। অল্প সাধনাতেই ভগবান দেখা দিলেন, শুধাইলেন—বৎস, ব্যাপার কি ?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—স্যার আপনার কথাই ঠিক, দৃষ্টিলাভ করিয়া কাহাকেও সুখী দেখিলাম না, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিন।

ভগবান এবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, দেখিলে তো, মানুষের চেয়ে ভগবানের বুদ্ধি বেশি। তোমরা আজকাল প্রায়ই ইহা অস্বীকার করিয়া থাকো।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—ঘাট হইয়া গিয়াছে, এবার দৃষ্টি লইয়া পুনরায় অন্ধ করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক।

ভগবান বলিলেন—তুমি সুখ চাহিয়াছিলে কিন্তু সুখ চোখ কান নাক মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উপরে নির্ভর করে না। মরুভূমির বালু হইতেও খেজুর গাছ বা কাঁটা মনসা যেমন রস শুষিয়া লইতে পারে তেমনি সংসারের নীরসতম অবস্থাও মানুষকে রস যোগাইতে পারে—যদি মানুষের মন থাকে। দৃষ্টি থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে সংসারে এত দুঃখ কেন ? অন্ধ আর কয়জনে ? অর্থ থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে ধনীর সন্তান সংসার ত্যাগ করে কিসের দুঃখে ? আত্মীয় স্বজন যদি সুখের কারণ হয় তবে কুরু বংশ ও যদু বংশ কাটাকাটি করিয়া মরিল কেন ? নিঃসঙ্গতাই যদি দুঃখের হেতু, তবে সন্ন্যাসীগণ অরণ্যে বাস করে কেন ? বৎস, দৃষ্টির গুপ্ততত্ত্ব এই যে সুখ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব সৃষ্টি করিবার সময় আমার মনে হইল জোড়ে জোড় গণিয়া হিসাব মিলাইয়া যদি তৈয়ারী করি তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব ব্যাপার পরিতৃপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তাই গোদুগ্ধের মধ্যে অম্ল বিন্দুর মত বিশ্বের মধ্যে একবিন্দু অতৃপ্তির রস ফেলিয়া দিলাম—তাহার ফলে দেখো না কেমন আসর জমিয়া উঠিয়াছে। ঐই অতৃপ্তির আবেগে লোকে ছুটাছুটি করিয়া মরে—শুধাইলে বলে সুখ খুঁজিতেছি। খুঁজিতে আপত্তি কি—কিন্তু যাহা নাই, তাহা কে পায়।

অদৃষ্ট-সুখী শুধাইল—সৃজন করিতে গেলে কেন ?

ভগবান বলিলেন—একাকী অবস্থায় বড়ই বিরক্তি জন্মিতেছিল—তাই যা হোক একটা কিছু তৈয়ারী করিলাম। এই বিশ্ব আমার সুবৃহৎ পরিহাস। সবাই সুখ সুখ করিয়া হাঁফাইয়া মরিতেছে দেখিয়া আমি আনন্দ পাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর।

ভগবান বলিলেন—আমি নির্ম্মম, কিছুতেই আমার মমত্বজ্ঞান নাই। শিল্প-বস্তুর প্রতি শিল্পীর মতো আমার মনোভাব। দ্রৌপদীর দুঃখে কি বেদব্যাস বিচলিত হইয়াছিলেন? সীতার ক্রন্দনে কি বাল্মীকি বিচলিত হইয়াছিলেন? তবে আমিই বা কেন রামশর্ম্মার পুত্রবিয়োগে, বা যদুবাবুর সম্পত্তিবিনাশে বা অদৃষ্টসুখীর অন্ধত্বে দুঃখিত হইতে যাইব?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—প্রভু, অনেকটা বুঝিয়াছি, বাকিটুকু ধীরে সুস্থে বুঝিতে চেষ্টা করিব, আপাততঃ ফিরাইয়া লও।

ভগবান বলিলেন—তথাস্তু! তারপরে অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্ট-সুখী পুনরায় অন্ধ হইয়া অতিশয় আনন্দে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন তাহাকে অন্ধ দেখিয়া পিতা, পত্নী, মাতা, আত্মীয়স্বজন ভৃত্যবর্গ এবং পাড়ার রমণীগণ সকলেই বহুকালের অভ্যস্ত আনন্দের সাধ পাইল।

পত্নী বলিল—যা রয় সয় তাই কর, তোমার কেন বাপু চোখওয়ালার মতো চলা ফেরা।

মাতা বলিল—বাছার আমার কত কষ্ট।

পিতা বলিল—ভাগ্যে দলিলটা পরিবর্ত্তন করিনি।

ভাইরা বলিল—দাদা, আমরা আছি—তোমার ভয় কি?

ভৃত্যরা বলিল—এই তো বড়লোকের মত কাজ।

প্রতিবেশীগণ বলিল—সকাল বিকাল ওঁর বাড়ী গিয়ে চা না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবেন।

পাড়ার মেয়েরা বলিল—পাড়ার দু'একটা অন্ধ থাকা ভাল, মনের সুখে মুখ ভাঙানো যায়।

পুত্র বলিল—পণ্ডিতমশাই বলেছেন আমার বাবা মুখে আর কাজে এক।

অদৃষ্ট-সুখী শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—আঃ বাঁচলাম! সার্থক আমার অদৃষ্ট-সুখী নাম।

এলার্জি

গ্রামের জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটি সম্প্রতি এম-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া পিতামাতা ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল ব্যাপার কি?

মনোজ চিরকাল ছটফটে দুরন্ত, কৌতুকে ও কৌতূহলে উচ্ছল, তাহার দৌরাত্ম্যে গাঁয়ের লোক অস্থির, হঠাৎ তাহার ভাবান্তর কেন? সর্বদা বিষন্ন মনে একা বসিয়া থাকে কাহারো সঙ্গে মেশে না, নিতান্ত জিজ্ঞাসিত না হইলে উত্তর দেয় না, মুখ মলিন, শরীর অবসন্ন।

ব্যাপার কি?

বাপ বলেন—পরীক্ষা খারাপ হ'য়েছে নিশ্চয়।

মা বলেন—তোমার যেমন কথা। পরীক্ষা খারাপ হ'লে মন খারাপ হোক, শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন? বাছার আমার চেহারা যে আধখানা হ'য়ে গিয়েছে।

বড় ভাই বলেন—তোমরা ওকে আহ্লাদ দিয়েই মাটি করলে, খুব খানিকটা পরিশ্রম করুক সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ছোট বোন বলে—দাদা অনেক রাত অবধি জেগে জেগে কি সব লেখে, ওতেই শরীর খারাপ হচ্ছে।

একটার জায়গায় চারটার মত হইল, তবু সমাধান নিকটবর্তী হইল না, তখন বাধ্য হইয়া ডাক্তার ডাকিতে হইল।

বিজ্ঞ ডাক্তার রুগীকে দর্শন স্পর্শন জিজ্ঞাসার দ্বারা নানারূপে বাজাইয়া লইয়া ঘন্টাখানেক পরে বলিলেন—এলার্জি।

আগেকার দিনে ডাক্তারেরা যেখানে বলিত কোন রোগ নাই, এখন, কোন রোগ নাই বলা চলে না, রোগ নাই তবে ডাকিয়াছে কেন, তাই এখানকার বিজ্ঞ চিকিৎসক বলে—এলার্জি।

এলার্জি বাৎলাইবার অনেক সুবিধা। প্রথমত: শব্দটা অপেক্ষাকৃত নূতন, দ্বিতীয়ত: রোগের কারণ স্থির করিবার দায়িত্ব রোগীর উপরে বর্তায়, তৃতীয়ত: স্বচ্ছন্দে যে-কোন একটা ঔষধ দেওয়া চলে—রোগী হঠাৎ মরে না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—এলার্জ্জি। এলার্জ্জি শুনিয়া রুগীর ওষ্ঠাধরে একটি রক্তরেখা ফুটিল।

জমিদারবাবু শুধাইলেন—তার মানে?

তার মানে একটা কিছু মনোজের System-এ সহ্য হচ্ছে না, বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে।

কোন্ খাদ্য?

খাদ্য না হতেও পারে! কোন গন্ধ এমনকি কোন দ্রব্যের স্পর্শেও এলার্জ্জি হওয়া অসম্ভব নয়।

কি সেটা?

সেটা রুগীকে আর আপনাদের সন্ধান ক'রে আবিষ্কার করিতে হবে, চিকিৎসকের পক্ষে বলা কঠিন।

তবে এখন উপায়?

আপাততঃ এই মিকশ্চারটা চলুক, আর আপনারা সকলে মিলে লক্ষ্য রাখবেন।

এখন বাড়ীময় সকলের মুখে এলার্জ্জি— আর সকলের সকল ইন্দ্রিয় এলার্জ্জির কারণ সন্ধানে তৎপর!

এলার্জ্জি! এলার্জ্জি! খাদ্যে, গন্ধে এমনকি স্পর্শেও অসম্ভব নয়।

তোর এলার্জ্জি কেমন ক'রে হ'লো রে? স্বাদে না গন্ধে না স্পর্শে—প্রভৃতি প্রশ্নের কোন উত্তর মনোজ দেয় না, মৃদু মৃদু হাসে।

মা বলেন—ডাক্তার রোগ ঠিক ধরেছে, তাইতে বাছার আমার মন অনেকটা যেন হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে—এখন মাঝে মাঝে মুখে হাসি দেখা যায়।

বাপ বলেন—হাসি দেখলেই তো চলবে না, কিসে এলার্জ্জি হচ্ছে সেটা আবিষ্কার করতে হবে তো।

বড় ভাই বলেন—হাসি দেখলেই তো চলবে না, কিসে এলার্জ্জি হচ্ছে সেটা আবিষ্কার করতে হবে তো।

ছোট বোন মঞ্জুলা বলে—আচ্ছা আমি নজর রাখবো, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

২

পরবর্তী অধ্যায়!

মনোজের বড ভাই অম্বুজনাথ একদিন মনোজকে ডাকিয়া শুধাইলেন—হাঁ রে তোর কি হ'য়েছে?

মনোজ বলিল—আমি কি ডাক্তারের চেয়েও বেশি জানি?

তার মানে?

ডাক্তারে বলেছে, এলার্জ্জি।

আমিও তাই অনুমান করি, কিন্তু এলার্জ্জির পুরো নামটা কি?

পুরো নাম ডাক্তারে জানতে পারে আমি কি ক'রে জানবো?

বটে—তবে এখানা কি?

অম্বুজ ছোট একখানা রুমাল বাহির করিলেন, এক কোণে লাল রেশমী সূতায় লেখা আছে L' R. G.

ওটা কোত্থেকে এলো?

কোত্থেকে এলো! তোমার বালিশের ওয়াডের ভিতর থেকে।

রেল গাড়ীতে বিছানা পেতে শুয়েছিলাম, পাশের কারো বিছানা থেকে এসে থাকবে।

তাও আবার ঢুকলো গিয়ে একেবারে বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে। ব্যাপারটা কি?

ঐ তো বললাম। কিন্তু পেলো কে?

মঞ্জুলা ওয়াড বদলাতে গিয়ে পেয়েছে।

আর এই বইখানাতেও দেখছি লেখা L. R. G.

বইখানা মনোজের পুস্তকরাশির মধ্যে ছিল—এটাও মঞ্জুলার আবিষ্কার।

কলেজের কোন বন্ধুর নাম হবে।

তা যে হবে জানি। কিন্তু পুরো নামটা কি?

মনোজের যাহা মুখে আসিল বলিল। বলিল ললিত রঞ্জন গুপ্ত।

ললিত, না, ললিতা, ভালো করে ভেবে ছাখ্।

কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। মঞ্জুলা একখানা ছোট ফটোগ্রাফ হাতে প্রবেশ করিল, বলিল—ছোটদা তোমার স্যুটকেসে ছিল, সুন্দর চেহারাটি।

সুটকেস কেন খুলেছিলি? দে আমাকে।

না, আমি দেখি, বলিয়া অম্বুজ ফটোখানি লইলেন, পড়িলেন নীচে লেখা—To Monoj From L. R. G.

অম্বুজ আর একবার ছবিখানা দেখিয়া বলিলেন, তবে এই হচ্ছে গিয়ে L. R. G.-র মূল বীজাণু!

মনোজ উত্তর দিল না, আর উত্তর দিবার ছিলই বা কী, সে লজ্জায় লাল হইয়া প্রস্থান করিল।

৩

তা হ'লে মা, তোমরা ঐ এলার্জির বীজাণু ঘরে আনাই ঠিক করলে।

তা কি করবো বাবা। ছেলের শখ। তাছাড়া মেয়েটিও তো মন্দ নয়।

কি ক'রে জানলে?

মনুর কাছে সব শুনলাম যে, মেয়েটির নাম ললিতা রাণী গুপ্ত, ওরা এক সঙ্গে পড়তো। আমাদের পাল্টি ঘর। মন্দ কি। তুমি কি বলো?

কি আর বলবো! আমার ভাগ্য যে রোগটা এলার্জির উপর দিয়েই গিয়েছে—আরো কিছু মারাত্মক হয়নি।

অম্বুজ বলিল—তোমাদের যখন ইচ্ছা তবে তাই হোক।

মনুজা সব শুনিয়া ঘটনার ক্রেডিট আত্মসাৎ করিল, কারণ, রুমাল, বই ও ফটোখানা তাহার আবিষ্কার।

সে বলিল—এমন যে হবে আমি জানতাম।

অম্বুজ এক তাড়া দিয়া বলিল—তুই চুপ কর।

কিন্তু সে চুপ করিল না।

কিন্তু যাই বলো মা, ললিতা বড় বৌদির চেয়ে সুন্দর নয়।

এবারে অম্বুজের চুপ করিবার পালা—শুধু তাই নয় সে উঠিয়া পালাইল!

তবে তুমি ললিতার বাপকে একখানা চিঠি লেখো।

অগত্যা। ছেলের বাপ হ'য়ে মেয়ের বাপের সাধ্য সাধনা করিগে। দিনে দিনে দেশের হ'ল কি।

৪

অতঃপর মাসখানেক পত্রাপত্রি করিবার পরে একদিন শুভলগ্নে এলার্জি ওরফে L. R. G. ওরফে ললিতা রাণী গুপ্ত মনোজের হৃদয়ে বেশ কায়েম হইয়া

বসিল। কিন্তু এলার্জিগ্রস্ত মনোজের সঙ্গে ডাক্তারি শাস্ত্রের সব লক্ষণ মিলিল না। কোথায় গেলো তাহার মন-মরা ভাব, কোথায় গেলো আলস্য, আলস্য, কোথায় গেলে উদাসীনতা।

বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া প্রবীণ ডাক্তারবাবু বলিলেন—রোগটা তা'হলে ধরেছিলাম।

অম্বুজ বলিল—তাতে আর সন্দেহ কি?

এবারে আমার কথাটি ফুরালো, কিন্তু তার আগে একটি কথা না বলিলেই নয়।

মঞ্জুলা নূতন বৌয়ের নামকরণ করিল—এলার্জি বৌদি।

এলসেশিয়ান ডগ

মেমারি ষ্টেশনে সকাল বেলাতেই বড় সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে।

ষ্টেশন মাষ্টার প্রকাণ্ড টাকের উপরে অদৃশ্য চুল ছিঁড়িবার ভঙ্গী করিতে করিতে বলিতেছেন, নাও এবারে চাকুরিটি গেল।

এ, এস, এম, বয়সে অল্প তাই আশাবাদী। বলিল, অত অল্পে হতাশ হবেন না স্যার, দাঁড়ান সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

এস, এম বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আর সব ঠিক করেছ! সাতাশ বছরের পাকা চাকুরি, আর দু'বছর হলেই পুরো গ্র্যাচুইটি নিয়ে রিয়াটার করতাম, নাও সব গেল।

নাঃ আপনি বড় সহজে ঘাবড়ান। আপনার চেয়ারে গিয়ে ঠিক হয়ে বসুন তো, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

এই বলিয়া এসিস্‌টান্ট ষ্টেশন মাষ্টার—এস, এম কে এক রকম টানিয়া লইয়া গিয়া স্বস্থানে বসাইয়া দিল। তিনি ক্ষোভে হতাশায় আপন মনে গজরাইতে লাগিলেন। এ, এস, এম দুইজন কুলিকে লইয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রবাবু (অর্থাৎ যাঁহাকে এতক্ষণ এ, এস, এম বলিয়াছি) একটা নেড়ি কুত্তার গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল। জীবটা বলাবাহুল্য প্রাণপণে আপত্তি প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সে আপত্তি পাছে unconstitutional হয় তাই পূর্ব্বোক্ত দুইজন কুলি লাঠি হাতে খবরদারি করিতেছে।

এই নিন স্যার আপনার কুকুর।

কুকুরটা দেখিবামাত্র বেণীমাধববাবু (পূর্ব্বোক্ত এস, এম, বা ষ্টেশন মাষ্টার) চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিলেন, আর ইয়ারকি করবার জায়গা পাওনি ছোকরা। এই কি এলসেশিয়ান ডগ! কোত্থেকে পথের একটা নেড়ি কুত্তা ধ'রে আনলে আবার বলা হচ্ছে এই নিন আপনার কুকুর।

রাগ করলে চলবে কেন স্যার, শাস্ত্রে বলেছে 'বিপদি ধৈর্য্যম' পড়েছি স্যার, ম্যাথেম্যাটিকস-এ ফেল না করলে এতদিন প্রফেসর হয়ে যেতাম। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি টিকিটে কি লেখা ছিল যে 'এলসেশিয়ান ডগ!'

কে জানে কি লেখা ছিল! টিকিট শুদ্ধ পালিয়েছে।

সেটি হতে দিইনি—এই দেখুন! চন্দ্রবাবু কুকুরের গলার টিকিটখানা দেখালো।

কি ক'রে পেলে?

কুকুরটা যখন দৌড় মারলো, টিকিটখানা চেপে ধরলাম, রয়ে গেল হাতে। 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। স্যার আমার ঠাকুরদ্দা পণ্ডিত ছিলেন।

আর ঐ কুকুরটা নিজে পণ্ডিত, টিকিটখানা পরিত্যাগ করে নিজে পালিয়েছে!

পালাতে পারতো না স্যার, বড্ড জোয়ান, আসল এলসেসিয়ান কিনা।

আর তার বদলে এনেছ এই নেড়ি কুত্তাটা। তা এটাকে নিয়ে কি করবে শুনি।

টিকিটখানা গলায় বেঁধে, ডগবক্সে পুরে দি, চলে যাক ট্রেনখানা, কুকুর পৌঁছবে মালিকের কাছে।

মালিক বিশ্বাস করবে?

না করলে তার খুশি। ভাগলপুর থেকে কলকাতার মাঝে কত ষ্টেশন আছে, কোনখানে এলসেশিয়ান যে নেড়ি কুত্তায় পরিণত হ'ল তার দায়িত্ব কি মেমারির। আর তা ছাড়া মূলে যে এলসেশিয়ান কুকুর ছিল তারই বা প্রমাণ কি?

চন্দ্রবাবুর কথায় বেণীমাধববাবুর ধড়ে প্রাণ আসিল, তিনি প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না হে ছোকরা তোমার future আছে।

বোধ করি তিনি মনে মনে তাহাকে অচিরে প্রফেসার হইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চন্দ্রবাবু তখন কুলিদের সাহায্যে কুকুরটার গলায় টিকিটখানা বাঁধিয়া ডগবক্সে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কুকুরটা বিস্তর আপত্তি করিল কিন্তু কেহ কর্ণপাত করিল না।

চন্দ্রবাবু বলিল—আবার কেঁউ কেঁউ করা হচ্ছে। যাঃ বেটা দুধে ভাতে থাকবি। তাছাড়া তেমন তেমন চোখে দেখলে সময় বিশেষ নেড়ী কুত্তা হ'য়েও তুই এলসেশিয়ান হয়ে উঠবি।

তখন ৩৩৪ ডাউন কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

এ গাড়ীখানার মেমারি ষ্টেশনে থামিবার কথা নয়। কিন্তু লাইন ক্লিয়ার

না পাওয়ায় থামিতে বাধ্য হয়। ভগবক্সে প্রকাণ্ড একটা এলসেশিয়ান কুকুর ছিল। বেণীমাধব বাবু হঠাৎ জীবে দয়ার তাড়নায় কুকুরটাকে কিছু দুধ দিবার উদ্দেশ্যে ভগবক্সের দরজা খুলিলেন, অমনি তাগড়া এলসেশিয়ান বাহির হইয়া একছুটে দূরবর্ত্তী পাটক্ষেতের দিকে ছুটিল, চন্দ্রবাবু ধরিতে উদ্যত হইলে হাতে টিকিটখানা রহিয়া যায়, আসল বস্তু ততক্ষণ প্রায় পাটক্ষেতের সীমানা প্রাপ্ত হইয়াছে।

২

পরবর্ত্তী ঘটনা পাঠকের অজ্ঞাত নয়!

এক সময়ে দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল সুধা পাওয়ার লোভে। অনুরূপ একটা ঘটনা কলিকাতার একটা বাড়ীতে যে চলিতেছে কোনো পুরাণে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও কম সত্য নয়।

অরবিন্দ রায়ের মেয়ে কণিকা পাড়ার যুবকদের নেত্র-লক্ষ্মী। তাহারা কণিকা নামে শপথ করে। কণিকা বিদুষী অর্থাৎ এম, এ পাশ, রূপসী অর্থাৎ মুখে রঙ মাখিলে ধরা পড়ে না, কর্ম্মিষ্ঠা অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও রাঁধিতে পারে; ছলাকলাময়ী অর্থাৎ তাস টেনিস বিলিয়ার্ড ও সন্তরণে পটু; আর দয়াময়ী অর্থাৎ পোষা কুকুরগুলিকে সত্যই যত্ন করে। দু'চার জন হতাশ প্রণয়ী তাহার সঙ্গলোভ পরিত্যাগ করিবার সময়ে মন্তব্য করিয়া গিয়াছে যে, নিতান্ত মানুষ বলেই আমি নিষ্ফল হ'য়ে ফিরতে বাধ্য হ'লাম, কুকুরগুলো রইলো।

সত্যই কুকুর পোষায় ও পোষা কুকুরে কণিকার বড় অনুরাগ।

এসব গল্পের আদি পর্ব্বের আগেকার ব্যাপার! তারপরেও অনেকগুলা পর্ব চলিয়া গিয়াছে, এখন প্রায় আমরা শান্তিপর্ব্বের কাছে। শেষ পর্যন্ত দুজ'ন প্রণয়ী টিকিয়া আছে। দেবেন ও সুরেশ। তাহাদের নাম দুটা স্মরণ করিয়াই আমরা 'দেবাসুরের' সমুদ্রমন্থনের উল্লেখ করিয়াছি।

দেবেন কলিকাতায় কোন কলেজের অধ্যাপক, বেতনটা অনুমান যোগ্য, উল্লেখযোগ্য নয়। উপরের মধ্যে আছে পূর্ব্ববঙ্গে কিছু বিষয় সম্পত্তি, কিন্তু এখন তাহা বাঘের মুখে, সে নিতান্তই ভালো মানুষ। সুরেশ কলিকাতার লোক ধনী ও ব্যারিস্টার, একেবারে ধোপদুরস্ত ব্যক্তি। দেবেন ভালো মানুষ না হইলে অমন অসম অসম যুদ্ধে নামিত না, আগেই সরিয়া পড়িত।

কণিকার পিতৃকুলের ইচ্ছা, বলাই বাহুল্য, সুরেশকে কণিকা পছন্দ করুক। কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, আজকালকার মেয়ে হয়তো বর

ছাড়িয়া উধাও হইবে, হয়তো বা ঐ দেবেনটাকে পকেটস্থ করিয়াও উধাও হইবে! কাজেই পিতৃকুল নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিয়া ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করিতেছে।

সুরেশ যখন আসে আগে হইতেই মোটরের হর্ণ সকলকে সচকিত করিয়া তোলে, কণিকার পিতামাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ওঠে, চাপরাশী দারোয়ানের সেলাম অবহেলাভরে পকেটে পুরিতে পুরিতে সুরেশ সদর্পে প্রবেশ করে।

কণিকা হাসিয়া বলে, আসুন মিঃ মজুমদার।

দেবেন প্রবেশ করে কুণ্ঠিত ভাবে, কেহ তাহাকে বড় অভ্যর্থনা করে না, কণিকা উদ্বেগের সঙ্গে শুধায়, আজ দেরী কেন?

দু'জনে কোনোযোগে চায়ের টেবিলে একত্র হইলে ভালো পেয়ালাটা পড়ে সুরেশের ভাগ্যে। কণিকার পিতা ইসারায় স্ত্রীকে দেখান, দু'জনের মনটা খুশী হইয়া ওঠে। সুরেশ কখনো কখনো কণিকাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যায়। পিতামাতা মনে মনে প্রজাপতিকে প্রণাম করে। দেবেন কখনো কণিকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে কণিকা বলে, না।

পিতামাতা পরস্পরকে বলে শুনলে তো।

কিন্তু সময় বিশেষে মাঠে ঘাটে বেড়াইবার চেয়ে ঘরের কোণে বসিয়া দু'জনে গল্প করা যে ব্যাধি বিশেষের মারাত্মক লক্ষণ—একথা বুঝিবার সাধ্য পুত্রকন্যার থাকিলেও পিতামাতার না থাকিতেও পারে।

মোটকথা কণিকাকে কেন্দ্র করিয়া দেবেন ও সুরেশের আচরণকে আমরা দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন প্রচেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—বড় ভুল করিয়াছি কি?

৩

সেদিন কণিকার জন্মদিনে সুরেশ একজোড়া হীরেবসানো ব্রেসলেট্ কণিকাকে উপহার দিল।

কণিকা বলিল—মিঃ মজুমদার, এ যে চোর ডাকাতকে নিমন্ত্রণ জানানো। তাছাড়া এ রক্ষা করতে পুলিশ পাহারা বসাতে হবে, তত খরচ করবার সাধ্য কি আমাদের আছে?

সুরেশ বলিল, খোয়া যায় পূরণ ক'রে দেবো।

আপনি কি স্যাকরার ব্যবসা সুরু করেছেন।

কথাটা ওখানেই মিটিয়া গেল। কণিকা স্থির করিল দুদিন পরে ব্রেসলেট জোড়া ফিরাইয়া দিবে।

কিছুক্ষণ পর দেবেন আসিয়া কণিকার হাতে একখানা কাগজ দিল।

ব্যাপার কি! তুমি কি নগদের বদলে হ্যাণ্ডনোট দিলে নাকি?

হ্যাণ্ডনোট নয়, রসিদ।

তার মানে রসের বদলে রসিদ, কিন্তু রসদ হবে কি?

দেখই না!

ব্যাপার কি খুলে বলো! রেলওয়ে রসিদের মর্মোদ্ধার করবার ব্যবস্থা এম-এ সিলেবাসে ছিল না।

এলসেশিয়ান ডগের রসিদ।

তার মানে?

তোমার জন্মদিনের উপহার।

পেলে কোথায়?

আমারই সম্পত্তি, ছিল আমার এক কুকুররসিক বন্ধুর জিম্মায় ভাগলপুরে।

এতদিন বলনি কেন?

ভেবেছিলাম জন্মদিনে তোমাকে surprise দেবো।

কবে পৌঁছবে?

রওনা হয়েছে, দু'এক দিনের মধ্যেই পৌঁছবার কথা।

তখন বিস্মিত পুলকিত কণিকা বলিয়া উঠিল—দেবেন তুমি ভারি ভারি ভারি—

কিন্তু ঠিক শব্দটা কিছুতেই হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না।

দেবেন বলিল, যত ভারিই হইনা কেন ঐ ব্রেসলেট জোড়ার চেয়ে নিশ্চয় ভারি নই।

এই ব্রেসলেট খানা হবে তোমার এলসেশিয়ান ডগের গলাবন্ধ।

আর ঐখানা হবে বুঝি আমার।

দেবেন আমি এলসেশিয়ান কুকুর খুব ভালবাসি।

সব ভালবাসা কি কুকুরটাই পাবে?

না তার মনিবও কিছু পাবে।

কি?

আমার স্বহস্ত রচিত এক পেয়ালা চা।

এই বলিয়া দেবেনকে একরকম টানিয়া কণিকা প্রস্থান করিল, হয়তো চা-উদ্দেশ্যেই।

দুইদিন পরে সুরেশ ব্যস্ত সমস্তভাবে আসিয়া কণিকার পিতাকে বলিল শুনেছেন মিঃ রায়, দেবেনবাবুর পূর্ববঙ্গের সম্পত্তি পাকিস্থান সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে।

অরবিন্দ বাবু বলিলেন, বলেন কি! ক্ষতিপূরণ অবশ্য পাবে।

এক পয়সাও নয়, ওরা ইসলামিক রিপাবলিক!

তবে এখন দেবেনের উপায়?

উপায় ঐ কলেজের বেতন। আশা করি তার সঙ্গে কণিকার বিয়ে দেবার পরিকল্পনা আপনাদের মনে নেই।

পাগল নাকি। কখনোই ছিল না, এখন তো আরো নয়।

নিশ্চিন্ত হইয়া সুরেশ খবরটা কণিকাকে দিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে দেবেন আসিতেই অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী কৃত্রিম সমবেদনার সুরে বলিলেন—শুনলাম তোমাদের সম্পত্তি পাকিস্থান সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে। তবে এখন তোমার চলবে কি ক'রে বাপু।

দেবেন বলিল—এখন যেমন ক'রে চলছে।

একে কি আর চলা বলে?

অরবিন্দ বাবু বলিলেন, অকারণে এখানে ওখানে ঘুরে না বেড়িয়ে তোমার উচিত সেই সময়টায় কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করা, ধরো, একটা প্রাইভেট টিউশনি তো করতে পারো।

অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, উনি যা বলেছেন তা মন্দ নয়, চাকরির পর প্রাইভেট টিউশনি মিলিয়ে এক রকম চলে যাবে, আর যাই করো বাপু বিয়েটা নিজের থাকে ক'রো, নইলে দুঃখের অন্ত থাকবে না।

সমবেদনার সুরে কথিত হইলেও এসব কথার একটিই অর্থ এবং দেবেন তাহা বুঝিতে ভুল করিল না।

সে ভাবিল আর কণিকার সঙ্গে দেখা করিবার কি প্রয়োজন। সে নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময়ে কণিকা আসিয়া উপস্থিত।

কি এসেই চলে যাচ্ছ যে।

একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বিশেষ প্রয়োজন আমারও আছে, ভিতরে চলো।

দু'জনে একা হইবামাত্র দেবেন বলিল কণিকা আমার দেশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

তা শুনেছি।

জানতাম যে শুনেছ। ভেবেছিলাম আমিই আগে বলবো—

কিন্তু তার আগে তোমার Rival এসে সুসংবাদ দিয়েছেন।

তুমি কি বিচলিত হওনি ?

কোন দুঃখে ?

যে দুঃখে তোমার পিতামাতা বিচলিত হয়েছেন।

তোমার কি আজ মাথা খারাপ হয়েছে ?

সেই জন্যই তো যেতে চাচ্ছি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাও।

কেন ?

ষ্টেশনে লোক গিয়েছে। এলসেশিয়ান কুকুরটা আনতে।

আনতে পাঠিয়েছ ?

পাঠাবো না !

এলসেশিয়ান কুকুরের রহস্য অবগত হইয়া সুরেশ বেশ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কণিকার কুকুর প্রীতি সুবিদিত। ইতিমধ্যে দেবেনের সম্পত্তি নাশ সংবাদ তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল। সুরেশের অভিজ্ঞতা বলে যে কুকুর যতই প্রিয় হোক সম্পত্তিনাশের ফলে দেবেনের সব আশা নির্মূল হইয়াছে। সুরেশ মনে মনে বলিল বাহাদুরি সার্ভিস্। হাঁদগটা গোপনে গোপনে খুব এগিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র ক'রে নিয়েছিল।

কাজেই সুরেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে এলসেশিয়ান কুকুরের আবির্ভাব দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বাড়ীর লনে অরবিন্দ বাবু! অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী, কণিকা, দেবেন, সুরেশ ও অন্যান্য সকলে এলসেশিয়ান ডগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বাড়ীর গাড়ী প্রবেশ করিল। সকলে আশায় উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

কই। কই!

বাড়ীর সরকার শিকলে বাঁধা কুকুর লইয়া নামিল, সকলে দেখিল একটি শীর্ণ জীর্ণ নেড়ী কুত্তা।

অরবিন্দ বাবু বলিলেন—একি অন্যায় ঠাট্টা।

তদীয় পত্নী বলিলেন—এর চেয়ে ভালো বেচারা পাবেই বা কোথায় ;

সুরেশ সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—এই কি আপনার এলসেশিয়ান নাকি দেবেন বাবু?

দেবেন কোন কথা বলিতে পারিল না, বুঝিল কোথাও একটা নিষ্ঠুর ভুল ঘটিয়া গিয়াছে; সে বুঝিল আজ তাহার সর্ব প্রকারে পরাজয়, অদৃষ্ট এতটুকু দয়া করিবে না আজ তাহার প্রতি।

তাহার পাংশু পাণ্ডুর পরাজয়করুণ মুখখানা এক ঝলকে দেখিয়া লইয়া কণিকা বলিয়া উঠিল—এলসেশিয়ান নিশ্চয়! কুকুরের সম্বন্ধে আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি জানি। তিন দিন না-খাওয়া না-স্নান হ'লে এমন তো হবেই, মরে যে যায়নি এই ভাগ্য।

এই বলিয়া সে এক হাতে কুকুরের শিকল, অন্য হাতে দেবেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

মেমারি ষ্টেশনের চন্দ্রবাবুর কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল তেমন তেমন চোখে দেখলে নেড়ী কুত্তাই এলসেশিয়ান হয়ে উঠ্‌বে।

ছোটগল্প-উপন্যাস-রহস্য

একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে হঠাৎ ছোটগল্প ও উপন্যাসে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হইয়া গেল। প্রথম দু-এক মুহূর্ত দুজনে বিস্ময়ের নীরবতায় নির্বাক থাকিল, তারপরে নমস্কার ও শিষ্ট সম্ভাষণ করিল। অতঃপর তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উপন্যাস। ভায়া হে, অনেক দিন তোমার দেখা পাইনি, ব্যাপার কি!

ছোটগল্প। আর ব্যাপার! টালা থেকে টালিগঞ্জ হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ে কড়া প'ড়ে গেল।

উপন্যাস। হঠাৎ ব্যস্ততা?

ছোটগল্প। কিছুই খবর রাখ না দেখছি। পূজো আসছে, পূজো সংখ্যায় আমার ডিম্যাণ্ড বেশি, সব লেখকই আমাকে স্মরণ করছে, তাই আর অবসর নেই। তুমি বেশ আছ।

উ। অন্তত পূজোর সময় যে আরামে থাকি তাতে সন্দেহ নেই, পূজোর ছুটি উপভোগ করি বলতে পার।

ছো। তা হ'লেই দেখো, আমার প্রাণান্ত।

উ। তোমাকে নিয়ে এখন খুব টানাটানি হ'লেও সুবিধা এই যে তুমি অল্পে ছুটি পাও, দশ-বিশ পৃষ্ঠার বেশি কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারে না। সে তুলনায় আমার যেন কঠোর মেয়াদের কারাদণ্ড।

ছো। কি রকম?

উ। এখনকার ঝানু নাম-করারা যদি একবার ধরে পাঁচ-সাত শো পৃষ্ঠার কমে ছাড়ে না—আবার ছাড়লেও পরবর্তী খণ্ডের জন্য মুলতুবি রেখে দেয়। ওদের আমি বড় ভয় করি।

ছো। ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা আমাকেও ছাড়ে না। আশা করি, নবীন লেখকদের কিছু দয়া-মায়া আছে।

উ। লেখকদের আবার দয়ামায়া! ওরা সব সমান। এই দেখ না, উঠতি দু-চারজন আমাকে ছ-সাত শো পৃষ্ঠা পর্যন্ত টেনেছে।

ছো। তারা আবার কে?

উ। একেবারে অর্বাচীন তুমি। হালের খবর রাখ না?

ছো। নিজের ঠেলাই সামলাতে পারি না দাদা—

উ। তা বটে। আবার ধর, একজন শুনছি দু হাজার পৃষ্ঠা লিখে বাংলা ভাষার বৃহত্তম উপন্যাস রচনার গৌরব অর্জন করবে। আমার মরণ আর কি!

ছো। এর তুলনায় প্রাচীন লেখকেরা ভাল ছিলেন।

উ। কাদের কথা বলছ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ? নমস্য নমস্য। তাঁদের মনে দয়া-মায়া ছিল হে। কিন্তু এরা—কি আর বলব!

ছো। তবে এবার আমার বিপদটা শোন। অন্য সময়ে বেশ থাকি। কিন্তু এই পূজোর সময়ে সবাই মিলে ঘানিতে জুড়ে দিয়ে সারা বছরের সঞ্চিত রসটুকু আদায় করে নেয়। তার উপরে আবার কত বায়না! আধুনিক, অতি আধুনিক, প্রগতিপূর্ণ, কত রকম চাহিদা! কেউ চায় ভূতের গল্প, কেউ চায় গার্হস্থ্য কাহিনী, কেউ চায় প্রেমের গল্প। আজকাল দুটি চাহিদা খুব প্রবল। রাজনৈতিক মতবাদকে ছোটগল্পের মোড়কে মুড়ে দিতে হবে। আর দিতে হবে যৌনতত্ত্বকে ছোটগল্পের নিকার-বোকার পরিয়ে, বয়স্ক ব'লে হঠাৎ কেউ যেন সন্দেহ না করতে পারে। কি মুশকিল বল তো!

উ। অস্বীকার করলেই পার।

ছো। পাগল। আটক ক'রে দেবে।

উ। দুজনেরই দেখছি সমান বিপদ। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

ছো। প্রতিকার! আজকের দিনে কোন্ অনাচারটাই বা প্রতিকার হচ্ছে? আর শুধু লেখক হ'লেও বা কথা ছিল; সঙ্গে সম্পাদক আর প্রকাশকরা আছে না।

উ। ওদের প্রাণ বড় কঠিন। সর্বদা মাপকাঠি হাতে ব'সে আছে, ফর্মার একটু এদিক ওদিক হ'লেই নির্মমভাবে কাঁচি চালায়।

ছো। কিন্তু যাই বল দাদা, প্রকাশকরা তোমার উপরে খুব সদয়—আমাকে বড় খাতির করে না।

উ। তেমনি সম্পাদকরা খাতির করে তোমাকে, না হ'লে পত্রিকা চলে না।

ছো। কিন্তু তেমনি উপন্যাস না হ'লে আবার বাজারে চলে না।

উ। সত্যি, এ বড় রহস্য। ছোটগল্প না হ'লে কাগজ চলে না। সেই গল্প একত্র সংগৃহীত হ'লে প্রকাশক বিমুখ।

ছো। তাদেরই বা দোষ কি! পাঠকে চায় একটানা গল্প—কাটা কাটা আলাদা গল্প হ'লে হাত গুটোয়!

উ। তাই তো বলছি প্রতিকারের একটা উপায় স্থির কর।

ছো। এস তোমাতে আমাতে একটা প্যাক্ট করি। আজকাল হচ্ছে প্যাক্ট আর এগ্রিমেণ্টের যুগ।

উ। অর্থাৎ জোড়া-তালির যুগ।

ছো। ওই জোড়া-তালিই আমাদের আত্মরক্ষার উপায়।

উ। কি রকম?

ছো। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম একটি মেয়ে অনেকগুলো রেশমী রুমাল জোড়া দিয়ে দিব্যি একখানা বেনারসী শাড়ি তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

উ। মনে হচ্ছে আমিও যেন পড়েছি।

ছো। লেখকদের আছে আমি এমন কৌশলে আত্মপ্রকাশ করব, যাতে পত্রিকার চাহিদা মিটে গেলে জোড়া দিয়ে উপন্যাস তৈরি হতে পারে।

উ। অনেকটা কবিগুরুর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মত—কি বল?

ছো। ঠিক। অন্য অনেক ক্ষেত্রের মত এখানেও কবিগুরু পথ প্রদর্শক।

উ। বাস্তবিক কবিগুরুর তুলনা হয় না। তাঁর 'নষ্টনীড়' আমি বই নয়, কিন্তু চালালেন তোমার নামে।

ছো। আবার 'মালঞ্চ' আর 'দুই বোন' আমি-বই নয়, চালালেন তোমার নামে।

উ। তবে এস, সেই পন্থাই অবলম্বন করা যাক। এই প্যাক্টের ফলে আমাদের দুজনেরই কষ্টের লাঘব হবে।

ছো। তবে সেই কথাই রইল, এস, এখন একটু চা খাওয়া যাক।

তাহারা দুইজনে নিকটবর্তী এক চা-ঘরে চা পানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিল।

গণ্ডাকতক চপ কাটলেট সহযোগে কয়েক পেয়ালা চা পান করিয়া যখন তাহারা দাম মিটাইবার কথা ভাবিতেছে তখন দেখিতে পাইল যে, এক বিখ্যাত ছোটগল্প-লেখক প্রবেশ করিতেছে। তখনই তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দোকানী হাঁকিল, ও মশাই, দাম দিয়ে যান। আর মশাই! মুহূর্ত মধ্যে তাহারা কোথায় সরিয়া পড়িল।

সেই ছোটগল্প-লেখক যখন দোকানে ঢুকিল, তখনও ঘটনার আন্দোলন শেষ হয় নাই। সে শুধাইল, ব্যাপারটা কি মশায়? দোকানী আন্তস্ত বলিল।

ছোটগল্প-লেখক পূজার গল্পের প্লট চিন্তা করিতেছিল, ঘটনাটি শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিল, যাক একটা ছোটগল্প পেলাম।

ভুলিয়া যাইবার আগেই অভিজ্ঞতাটি লিপিবদ্ধ করিবার আশায় তখনই সে দোকান ছাড়িয়া ছুটিল। ছোটগল্প ও উপন্যাস পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, ছোটগল্প ক্ষীণকায় কিন্তু উপন্যাসের বপুটি বড় কম নয়, তাহার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ছোটগল্প-লেখক ছুটিতে ছুটিতে ছোটগল্পের ঘাড়ে গিয়া পড়িল, আর বলিয়া উঠিল, মনে হচ্ছে আরও একটা ছোটগল্প পেলাম।

পিছন হইতে কে বলিল, বাড়ি গিয়ে ওইগুলো জোড়া দিয়ে নাও, একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।

কে বলে?—বলিয়া ছোটগল্প-লেখক পিছনে ফিরিয়া তাকাইল, মনে হইল একজন স্থূলকায় ব্যক্তি গলির মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

তখন ছোটগল্প-লেখক নিজের মনে বলিয়া উঠিল, দি আইডিয়া!

আইডিয়া কার্যে পরিণত করিবার আশায় বাড়ির দিকে সে দ্রুত যাত্রা করিল।

টিকি

স্থান মাহাত্ম্যে ও কাল-মাহাত্ম্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে অবিলম্বে একটি টিকি না রাখিলেই নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষগণের তপস্যার তেজে ব্রহ্মতালু অবধি শুকাইয়া গিয়া বিপর্যায় একটি টাক পড়িয়াছে, টিকিরূপে দেখা দিবার মতো কয়েকগাছা চুলও আর অবশিষ্ট নাই। তাই মহাসমস্যায় পড়িয়াছি। পরদুঃখ-কাতর জাপানীদের আজ আগের অবস্থা থাকিলে নিশ্চয় এতদিনে তাহারা কৃত্রিম টিকি আমদানি করিত। পাঁচ ছয় আনা পয়সা খরচ করিলেই ডজন খানেক টিকি পাইতাম। অগত্যা বাধ্য হইয়া মার্কিনে-প্রস্তুত টিকি খরিদ করিতেছি, দেড় টাকা ডজন। খরচ পোষায় না—কিন্তু যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেখানে এ খরচটুকু না করিলেই নয়। যাইহোক মস্তকের যথাস্থানে একটি মার্কিন টিকি জুড়িয়া লইয়া নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছি!

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মার্কিন চৌলশিল্পের মনে মনে প্রশংসা করিয়াছি। কালো, মসৃণ, নাতিদীর্ঘ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বঙ্কিম, শরীরের তালে তালে দুলিয়া ওঠে। একালের শিখাধারীদের তো কথাই নাই, ধৌম্য, পরাশর, চাণক্যপণ্ডিত প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ শিখাধারী অবধি নিশ্চয় আমার শিখাগৌরবে ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন। এ আমার বৃথা অনুমান মাত্র নয়। পথে যাইতে যাইতে লোকের কানাকানি ও ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে বেশ বুঝিতে পারি আমার শিখাই তাহাদের আলোচনার একমাত্র বিষয়। তাহার উপরে আবার সারামাথায় টাক, এমন টাকে এমন টিকি। লোকে বিস্মিত না হইবে কেন? নকলের কাছে আসলে পরাজিত হয় আমার টিকি তাহার একটি নাতিদীর্ঘ উদাহরণ।

একদিন আমাদের পাড়াতে একটি ফিরিওয়ালা প্রবেশ করিল! লোকটা অপরিচিত। সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল—কে এই লোকটা? এত বড় তাহার আস্পর্দ্ধা যে বিনা পরিচয়ে পাড়ায় ঢুকিতে সাহস করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিল—মুসলমানের গোয়েন্দা?

আবার কেহ বলিল—ও নিজেই মুসলমান।

পাড়ায় যেখানে যত খোন্তা কুড়ুল, লাঠি ডাণ্ডা ছিল সব প্রস্তুত হইয়া উঠিল। কিন্তু লোকটার হুঁস নাই! সেই 'চাই চিরুণী, আয়না, ভালো ভালো কাঠের খেলনা'—হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়াছে।

নাঃ আর সহ্য করা যায় না। এ কেবল আমাদের পাড়ার অপমান নয়—সমগ্র হিন্দুধর্ম্মটাই অপমানিত হইতে চলিয়াছে।

অবশ্য লোকটাকে মারিয়া ফেলা কিছুই কঠিন নয়। এমন কতই না হইতেছে। কিন্তু যদি লোকটা হিন্দু হয়! এক বিন্দু হিন্দু রক্তপাত হইলে লজ্জায় যে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

কিন্তু লোকটা কি সহরের আবহাওয়ার খোঁজ রাখেনা! অপরিচিত পাড়ায় আসে আসুক কিন্তু পরিচিত টিকিট উগত করিয়া আসিলেই তো পারে। ওই টিকিট হিন্দুয়ানির পাসপোর্ট। স্বদেশের পতাকা হাতে করিয়া যেমন দেশের যত্রতত্র নির্ভয়ে যাওয়া যায়, স্বদেশের দুর্গ শিখরে স্বদেশের পতাকা উড্ডীন দেখিলে মন যেমন আশ্বাস ও আনন্দে ভরপুর হয়—হিন্দুর মাথায় টিকিও যে তেমনি যুগপৎ আশ্বাস, ভরসা ও আনন্দের মিশ্র অবদান!

নাঃ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল! একজন অগ্রসর হইযা গিয়া শুধাইল—তুমি কি হিন্দু।

ফিরিওয়ালা হাসিয়া বলিল—বাবু, হিন্দু না হ'লে এখানে কেউ সাহস করে আসে!

সে যদি চুপ করিয়া থাকিত, এমন কি মুসলমান হইত তবু বোধ করি সকলে সহ্য করিতে পারিত। কিন্তু লোকটা যে তর্ক করে! দুর্ব্বলের তর্কে সবল সন্তুষ্ট হয় না। কেবল কথামালার সেই নেকড়ে বাঘটা নয়—মনুষ্য সমাজ নেকড়ে বাঘে পূর্ণ। এত নেকড়ে বাঘ বোধ করি অরণ্যেও নাই।

একজন বলিল—হিন্দু তো টিকি কই?

লোকটি এই সব প্রশ্নোত্তরের সহিত পরিচিত বলিয়াই মনে হইল। সে মাথার ডালা নামাইয়া পাগড়ি খুলিল—কিন্তু কই যথাস্থানে টিকি কোথায়?

সবাই বিস্মিত হইল—লোকটা বিস্মিত হইল সব চেয়ে বেশী!

একজন গর্জ্জিয়া উঠিল—তবে রে শালা!!

লোকটা বলিল—বাবু, আমি হিন্দু, জাতিতে ছত্রি, ঘর ছাপরা…কলকাতায় বিশ বরষ……

তাহার বাক্য শেষ না হইতেই লোহার ডাণ্ডা তাহার মাথায় পড়িল।

তিন চারটা আঘাতেই বাস্—সব শেষ! শত্রু নিপাতের গৌরবে সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কয়েকজনে মিলিয়া তাহার খেলনাগুলি ভাগযোগ করিয়া লইল। একজন

যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে তাহার পাগড়িটা লইয়া লাঠিতে জড়াইয়া নিশান করিয়া উড়াইয়া দিল। পাগড়ি খুলিতেই টুক্ করিয়া নাতিদীর্ঘ একটা টিকি পড়িল।

ব্যাপার কি ?

একজন হাতে তুলিয়া সকলকে দেখাইয়া মন্তব্য করিল—পরচুলার টিকি।

কাহারো আর সন্দেহ রহিল না যে লোকটা মুসলমান। একটা নকল টিকি জুড়িয়া শত্রুর কোঠে প্রবেশ করিয়াছিল।

আমার কিন্তু সন্দেহ গেল না। বেচারীর মাথায় আমার মতোই প্রকাণ্ড টাক। হয়তো তাই সে নকল টিকি জুড়িয়া লইয়াছিল। সস্তায় দেশী টিকি কিনিয়া বেঘোরে মারা গেল। মার্কিন টিকি হইলে তাহাকে আজ মারে কে! তবু একবার নিজের মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম। নাঃ ঠিক আছে। হাজার হোক মার্কিনের টিকির তো দেশী টিকির সঙ্গে তুলনা চলে না। মনে মনে মার্কিন টিকির ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে সরিয়া পড়িলাম।

'পঞ্চশীলা'

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, বুঝলেন কিনা।

আজ্ঞে কথা তো সত্যি, কাজে করাই কিছু কঠিন।

কেন কঠিন, এ কথা আমাদের তপোবনেরই আবিষ্কার।

সেটা মিথ্যে নয়, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, তখনকার দিনে সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি সব এক সুরে বাধা ছিল, তাই মন্ত্র আর সাধনায় হেরফের ছিল না। কিন্তু এখন ?

এখনই বা তফাৎ কোথায় ? জীবনের দেয়ালে অনেক কালিঝুলি পড়েছে সত্য, তুলির পোঁচ লাগান—ওই দেখুন বালতি বোঝাই রঙ। ওটারই নাম 'পঞ্চশীলা'।

আজ্ঞে শব্দটা 'পঞ্চশীলা' নয়, পঞ্চশীল।

আচ্ছা না হয় পঞ্চশীলই হল।

পাঠক, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি জরুরি কথা বলিয়া লই। পূর্বোক্ত কথোপকথন কোথায় হইতেছে বলিয়া তোমার ধারণা ? সেকালের নৈমিষারণ্য না হইলেও একালের কোন 'শান্তিবৈঠকে' হইতেছে বলিয়াই নিশ্চয় তুমি মনে করিয়াছ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তোমার অনেক ধারণার মতো এই ধারণাটিও ভ্রান্ত ! কথোপকথনের স্থান বালিগঞ্জগামী একখানি ২-বি সরকারী বাসের দ্বিতল, বক্তাদ্বয়ের একজন বৃদ্ধ, অপরে যুবক, সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল। আর শ্রোতা পিছনের আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং লেখক। বৃদ্ধের পোষাক দস্তুরমতো সাহেবী, যুবকটির গায়ে ধুতি পাঞ্জাবী।

অতঃপর।–

বৃদ্ধ বলে—দুঃখ এই যে আমাদের তপোবনের শান্তির বাণী প্রচার করবার ভার নিলো কিনা ওদেশের লোক।

আপনি ওদের উপরে বেশি ভরসা করবেন না, ওসব রাজনীতিকদের চাল।

না, না, এ অশ্রদ্ধেয় কথা। দেখছেন তো আমাদের ছেলেরা কেমন শান্তি মিছিল করে। সকলের মনে প্রকৃতই শান্তির জন্য আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

এটাও ফ্যাশান।

ফ্যাশান ! কেমন শান্তি-কপোত ছাড়ে। ফ্যাশানের খাতিরে কেউ খরচ করে না।

প্রয়োজন হলে তাও করে। কিন্তু খরচ কোথায় দেখলেন ?

কপোতের দাম।

ওসব ভাড়া করে আনা, পোষা পায়রা মালিকের কাছে ফিরে যায়।

বলেন কি ?

যথার্থ বলছি। আজ ওদের প্রয়োজন বলে 'শান্তি শান্তি' বলছে, পায়রা ওড়াচ্ছে ; কাল আবার অনুরূপ প্রয়োজন হলে বলবে 'শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' শকুন ওড়াবে।

শকুন ভাড়া পাওয়া যায় নাকি ?

ওরা সব পোষে। পায়রা, ঘুঘু, শকুন, যখন যেমন প্রয়োজন।

কিন্তু শান্তি যে অত্যাবশ্যক তা অবশ্যই স্বীকার করেন।

একশ বার।

শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় কি ?

যুবক বলে—রাজনীতির প্রয়োজনে শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ তারা শান্তি চায় না, চায় নিয়ন্ত্রিত অশান্তি ; অস্ত্র বিক্রি হবে অথচ রীতিমতো বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না, এই তাদের কাম্য।

তবে কি উপায় হবে বলুন।

ব্যক্তির প্রয়োজন বোধ থেকে স্থায়ী শান্তির উদ্ভব হবে।

অর্থাৎ—

স্থায়ী শান্তির মূল হচ্ছে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা।

ঐ কথাটি শুনিবামাত্র তিনকালগত বৃদ্ধ আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, যা বলেছেন। আমারও ঐ মত। আমি তিন সন্ধ্যা শান্তি মন্ত্র জপ করি, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গান করি।

ফল কিছু পেয়েছেন ?

মনটি এখন বেশ শান্ত হয়ে এসেছে, হঠাৎ কারো গায়ে হাত উঠতে চায় না, তা সে যত অন্যায়ই করুক না কেন।

স্যার, আপনার টিকিট শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

বুঝলেন আগে বড় উদ্ধত ছিলাম কিন্তু 'পঞ্চশীলা' গ্রহণ করবার পর থেকে আমি আর আগের মানুষ নেই।

স্যার, আপনার এলগিন রোডের টিকিট ছিল।

এতক্ষণে বৃদ্ধ সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল—কিন্তু যাবো যে পণ্ডিতিয়া রোড।

তবে আর চারটে পয়সা দিন।

পয়সা দিন বললেই হ'ল। আমাকে এলগিন রোডের টিকিট দিলে কেন? আমি তো চাইলাম পণ্ডিতিয়ার টিকিট।

আপনি কিছুই বলেননি। টিকিট কিনেছেন এই ভদ্রলোক।

তার মানে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ। মুখ সামলে।

আমি আবার বলছি আপনি টিকিট কেনেন নি। এই ভদ্রলোক আপনার হয়ে কিনেছিলেন। হাঁ কি না ইনি বলুন।

যুবক বলিল, কণ্ডাক্টার ঠিক কথাই বলছেন। আপনি এলগিন রোড যাবেন বললেন, আপনার জন্মে একখানা দু' আনার, আমার জন্মে একখানা তিন আনার টিকিট কিনলাম।

স্যার, আমি কি তবে মিথ্যা বলেছিলাম?

তার মানে তুমি আমাকে যে মিথ্যাবাদী বলেছিলে সেটা সত্য।

এই কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটি যুবকের মতো লাফাইয়া উঠিয়া 'দিস ইজ ইওর ডিউ' বলিয়া কণ্ডাক্টারের নাকে এক ঘুঁষি বসাইয়া দিল। বাসশুদ্ধ হৈ হৈ বাধিয়া গেল।

নানা জনে নানা রকম মন্তব্য করে।

একি আপনার মতো ব্যবহার!

হঠাৎ এমন কি হল?

একেবারে ঘুঁষি মেরে বসলো।

পাগল।

ঠিক পাগল নয়, তবে মাথা খারাপ।

একজন ইন্সপেক্টার আসিল। সব ব্যাপার শুনিয়া বলিল—মারা আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনি রিপোর্ট করতে পারতেন।

বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া ওঠে, রিপোর্ট আবার কার কাছে করবো হে।

হেড অফিসে।

নিকুচি করছি তোমার হেড অফিসের। যত সব শয়তানের জাত।

স্যার, মুখ সামলে কথা বলবেন।

তখন বৃদ্ধের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। বাসের নিম্নতম কর্মচারী হইতে সুরু করিয়া ধাপে ধাপে ষ্টেট বাসের ডিরেক্টার, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মায় রাষ্ট্রপতি সকলের সপিণ্ডীকরণ হইয়া চলিল।

একজন বলিল—এই তো এখনি আপনি পঞ্চশীলের ব্যাখ্যান করছিলেন--

তার বাক্য শেষ হইতে পাইল না—রাখো হে ডেঁপো ছোকরা। 'পঞ্চশীলা' মানি বলে কি মাথা বিকিয়ে বসে আছি নাকি!

আমার মনে পড়িল বৃদ্ধের সেই স্বীকারোক্তি—আগের সে আমি আর নেই।

না জানি সে কি বস্তু ছিল।

আবার মনে পড়িল—হঠাৎ কারো গায়ে হাত উঠতে চায় না, শান্তি মন্ত্র জপ করতে করতে মনটা বেশ নরম হয়ে এসেছে।

এমন সময়ে বাসখানা রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে পৌঁছিতেই পুলিশ পুলিশ রব উঠেছে।

একজন বলিল—গোলমাল শুনে পুলিশ উঠেছে।

অপরে বলিল—পুলিশ নয় ইন্সপেক্টার।

পুলিশই হোক আর ইন্সপেক্টারই হোক কথাটা শুনিবামাত্র এতক্ষণ যিনি রাষ্ট্রপতি হইতে সুরু করিয়া মোড়ের মাথার পুলিশটাকে অবধি 'দেখিয়া লইবার' অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিলেন তিনি নিতান্ত ভালো মানুষটির মতো স্বস্থানে বসিয়া পড়িলেন—এক মুহূর্ত্ত আগের যুযুধানকে চিনিবার উপায় রহিল না।

অপরে তখনো হল্লা করিতেছিল! পরে প্রকাশ পাইল পুলিশ আসে নাই। বাস পুনরায় রওনা হইল।

দেখিলাম যে—মাঝখানে যাহাই ঘটুক শেষপর্যন্ত 'পঞ্চশীলারই' জয় হইল।

বুঝিলাম যে সংসারে 'পঞ্চশীলার' জয় অনিবার্য কিন্তু তৎসঙ্গে পুলিশরূপ অনুপান না থাকিলেই নয়।

ওরা

বিলাস রায় সরকারী চাকুরী হইতে অবসর ও পেন্সন গ্রহণ করিয়া বাংলা-দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বাসনা জীবনের শেষ ক'টা দিন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সোনার বাংলার মাতৃক্রোড়ে কাটাইবেন। শিশুকালে পিতার সহিত পশ্চিমে গিয়েছিলেন, তারপরে পঞ্চান্নটা বছর মীরাট, দিল্লী, আজমীঢ় প্রভৃতি স্থানে কাটিয়াছে। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা সহরবাসী। এখনো তাঁহার একটিও চুল পাকে নাই বা দাঁত পড়ে নাই, মুখে বলি-চিহ্নও বিরল। সকালে বিকালে পার্কে ও লেকের ধারে যে নব পেন্সনধারী স্বাস্থ্য সংগ্রহ করিবার আশায় ঘোরাফেরা করেন, তাঁহারা বিলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া নিজেদের মধ্যে ঈর্ষ্যায় বলাবলি করেন, 'ছাতুর গুণ মশাই, ছাতুর গুণ।'

বিলাসবাবু এখন নিজ বাসভূমে পরবাসী। দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে আত্মীয়স্বজন পর হইয়া গিয়াছে তাই তিনি পরকে আপন করিবার আশায় বিকাল বেলায় পার্কে ও সকাল বেলায় লেকের ধারে যান। আগে শুধু হাতেই যাইতেন, কিন্তু পেন্সনধারীদের হাতে লাঠি দেখিয়া বুঝিয়াছেন, যে উহাই তাঁহাদের রাজদণ্ড, কাজেই একখানি লাঠি সংগ্রহ তিনি করিয়াছেন। অকুস্থানে গিয়া বেঞ্চির একান্তে বসিয়া পড়েন। একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া সকলে হেঁ হেঁ করেন, তারপরে সব ভালো তো, কেমন লাগছে প্রভৃতি সম্ভাষণের পরে হাতের সূত্র ধরিয়া আলাপ চলিতে থাকে, বিলাসবাবু নীরবে মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন।

তারপরে আপনার বড় নাতিটির খবর কি? দিল্লী থেকে ফিরেছে?

পরশু ফিরেছে।

ইণ্টারভিউএর ফলাফল কি হ'ল?

যথা পূর্ব্বং তথা পরং। এবারেও ফেল। নাঃ ওরা আর বাঙালীকে খেতে দেবে না।

আবার খাওয়া-পরা! কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকলে হয়।

সেটুকুও বুঝি ওদের কৃপায় থাকে না।

থাকবেই তো না। ওরা যে বাংলার শত্রু!

আমরা করলাম দেশ স্বাধীন আর এখন কিনা ওরা আমাদের ওপরে ছড়ি ঘোরায়।

কথাটা বলিলেন পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ সাহেব যিনি এককালে স্বদেশী-ওয়ালাদের ত্রাস ছিলেন।

এর চেয়ে ইংরেজ অনেক ভালো ছিল।

কি যে বলছেন! আমাদের সেই লারকিন, প্রেস্টন, গ্রিফিথ সাহেব আর ওরা! কিসে আর কিসে!

মোট কথা ওরা থাকতে বাঙালীর আর নিস্তার নেই। নিন চলুন এবারে ওঠা যাক।

সকলে উঠিলেন, কাজেই বিলাসবাবুও উঠিতে বাধ্য হইলেন। এতক্ষণ আলোচিত সব কথাই তিনি বুঝিতে পারিলেন কিন্তু কিছুতেই বোধগম্য হইল না যে ওরা কাহারা?

সন্ধ্যা বেলায় পাড়ার "Benglo-Vedic Ayurvedic Pharmacy" গৃহে পেন্সনধারীগণের সভা জমিয়া ওঠে। সেখানে বিপত্নীকগণ চ্যবনপ্রাশ ও তৃতীয়-পত্নীকগণ মদনানন্দ মোদক সংগ্রহ করেন, তারপরে চরাচরের যাবতীয় সমস্যার সমালোচনা ও সমাধান হইতে থাকে। বিলাসবাবুও সেখানে বসিতে শুরু করিয়াছেন, কি করিবেন সময় তো কাটানো চাই, তাছাড়া পরকেও আপন করিয়া লওয়া আবশ্যক, কবিরাজের দোকান, বাজার ও শ্মশান তাহার প্রশস্ত স্থান।

শুনেছেন, আবার যে নূতন সেলট্যাক্স বসছে।

নাঃ আর কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার করা সম্ভব হ'ল না দেখছি।

কিন্তু টাকাও তো চাই নইলে দেশের দশ রকম কাজ হবে কি ক'রে?

কথাটি বলিলেন বিলাসবাবু, দেশমাহাত্ম্যে এখন দু'চার কথা তিনি বলিতে শুরু করিয়াছেন।

টাকা লাগে ওরা দিক। আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা কেন?

দেশ তো আপনাদেরও।

বটে! বটে! টাকা দেবার বেলায় দেশ আমাদের—আর ক্ষীর সর খাবার বেলায় ওদের।

বিলাসবাবু বুঝিতে পারেন না সেই সৌভাগ্যবান ওরা কাহারা, যাহারা নিরন্তর ক্ষীর সর ভোজন করিতেছে।

তাছাড়া দেশের কাজটাই বা কি হচ্ছে ? কেবল ওদের ভাই ভায়ে শালা শালাজ মুঠো মুঠো টাকা মারছে ।

কাজ হচ্ছে না কেন ! এই দেখুন না কেন দামোদর ক্যানাল, দেশে যে সোনা ফলবে !

সোনা ফলবে ? বলি দামোদরের উৎপত্তিটা কোথায় ?

কেন, বিহারে !

তবে ?

বুঝিতে না পারিয়া বিলাসবাবু বলিলেন, ক্ষতি কি ?

ক্ষতি এই যে বিহারের জল বাংলায় ঢুকলে বাংলার ধানের ক্ষেতে গম ফলবে, আর তাই খেয়ে বাঙালীর বুদ্ধি ছাতুমার্কা হয়ে যাবে না ! ওদের চালাকি কি বুঝিনা। বাঙালীর হাই অর্ডারের ইনটেলেক্‌টকে মারবার জন্তই এই ফন্দিটি ।

বক্তা বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া উপস্থিতগণ বাংলার ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ।

কিন্তু বাংলা দেশের বাইরেও তো বুদ্ধিমান লোক জন্মেছে ।

কে, কে, শুনি ।

এই ধরুন গান্ধীজি ।

তিনি হচ্ছেন গান্ধীজি ।

তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা, তাঁর কথা আলাদা, তাছাড়া কে আবার কোথা থেকে শুনবে, ওদের গুপ্তচরের তো অভাব নেই । কিন্তু আর কে শুনি ?

কেহই নাই, কাজেই সকলে নীরব ।

তাই না গোখ্‌লে বলেছেন—What Bengal thinks to day, the rest of India thinks to-morrow কতখানি বুদ্ধি দেখুন !

কিন্তু তিনিও তো অবাঙালী ।

আরে ঐটুকু বলেছেন বলেই তো তিনি বুদ্ধিমান । নইলে তিনি আর কি করেছেন ।

অতঃপর সকলে ঔষধ সংগ্রহের জন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া বিলাসবাবু উঠিয়া পড়িলেন—এবং ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—ওরা কাহারা ।

বিলাসবাবু একটু ঘুরে সরিতেই সুরু হইল—ওঁকেও ওরা দু'পয়সা খাইয়েছে !

দু'পয়সা খাইয়েছে না ছাই ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিয়েছে নইলে মেড়োর দেশ ছেড়ে বাংলায় আসতে গেলেন কেন ?

কথাটা সকলেরই মনে লাগিল। কিন্তু যাই বলুন না কেন বিলাসবাবুর স্বাস্থ্যটি বেশ।

হবে না কেন ছাতুর গুণ মশাই ছাতুর গুণ।

কবিরাজ মহাশয় অবসর সময়ে অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তিনি গুণ গুণ স্বরে গাহিয়া উঠিলেন।

'মোটি মোটি ডাল রোটি
ছোটি ছোটি চানা
হরদম চিবানা, ভেইয়া
হরদম চিবানা।'

অজীর্ণের রুগী ভূতপূর্ব সাবজজবাবু বলিলেন—ও গতর বেশিদিন থাকবে না, গেলো বলে।

ভূতপূর্ব পোস্টাল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের ইতিমধ্যে হাঁপানীর টান উঠিয়া পড়িয়াছে—তিনি অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, হাঁপানী দেখা দিল বলে !

—কিন্তু ভদ্রলোক নিমকের গুণ রাখতে জানে। ওরা টাকা খাইয়েছে, উনি এখন ওদের গুণ গাইছেন।

পুলিশ সাহেব, যিনি নিরপরাধ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আসামী বলিয়া চালান দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ক্রোধে ও ধিক্কারে বলিয়া উঠিলেন—ট্রেটর।

২

সকাল বেলায় লেকের ধারে পেন্সনধারীদের সভা বসে। প্রথমে কিছুক্ষণ ডাক্তারের বিধান অনুসারে সকলে ঘোরাফিরা করেন। কেহ এক মাইল হাঁটেন, কেহ আধ মাইল, কেহ সিকি মাইল, কেহ একশ গজের অধিক নয়, যাহার যেমন রোগ, যেমন প্রয়োজন, যেমন প্রেস্ক্রপশন। বিলাসবাবুর মজবুত শরীর, বিনা প্রেস্ক্রপশনেই তিনি সমস্ত লেকটা তিন চার বার ঘুরিয়া আসেন। সকলে

ঈর্ষ্যার সঙ্গে দেখেন। হাঁপানীর রুগী পোস্টাল সুপার বলেন, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়, মনে মনে বলেন, আহা যদি আমিও পারিতাম।

তারপরে সকলে একখানা বেঞ্চি জুড়িয়া বসেন, সরকারী বড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তখন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ শুরু করেন। যেদিন বেঞ্চিতে কুলায় না পাশের চায়ের দোকানদার খান দুই চেয়ার সরবরাহ করে, লোকটা জানে যে পুণ্যকার্যে সাহায্য করিলে পুণ্যের ভাগ পাওয়া যায়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ চলিতে থাকে। এমন সময়ে সংবাদপত্র হাতে একজন পেন্সনধারী প্রবেশ করেন।

কি খবর ?

উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যা। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলা জলের তলায়, চারিদিকে অন্নাভাব আর হাহাকারধ্বনি।

ও সব বাজে কথা থাক। আপনি পড়ুন। আহা কত জ্ঞানের কথা।

বিলাসবাবু বলেন—এযে অত্যন্ত গুরুতর সংবাদ।

তার জন্যে চিন্তা কি ? ওরা আছে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

বিলাসবাবু ভাবেন ওরা কি সেই তাহারা যাহাদের উপরে ইহাদের বিদ্বেষের অন্ত নাই। বলেন—কিন্তু এ যে সকলেরই কর্ত্তব্য !

তার মানে বলতে চান আমাদেরও কর্তব্য ?

কেন নয় ?

নয় এই জন্যই যে পেন্সনের উপরে D. A. নেই। থাকলে না হয় সেটা খয়রাত করা যেতো।

বিলাসবাবু বলেন—কিন্তু ওরাই বা কেন করবে ?

ওরা করবে-না ওদের ঘাড় করবে !

আরে না করে যাবে কোথায় ? ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে। এখন না ক'রে উপায় কি ?

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। কেবল হাঁপানীর রুগী পোস্টাল সুপার সশব্দে হাসির পরিবর্তে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের তালে তালে সুদক্ষ অভিনেতা যেমন মুখ নাড়ে তেমনি ভাবে দন্ত বিকাশ করিতে থাকেন কিন্তু তাহাতেও হাসি ও দন্তের অভাব প্রচ্ছন্ন থাকে না।

মশাই ওরা যতই আমাদের ভেতো, মছলিখোর বলুক না কেন আমাদের বুদ্ধিটুকু যাবে কোথায় ? হাজার হোক ব'ঙালী বটি তো।

আবার সকলে হাসিয়া ওঠে।

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর—এসব দেখবার জন্যে তো ওরা আছে। আমাদের ভাবনা কি। নিন পড়ুন, বেশ হচ্ছিল।

বিলাসবাবু ভাবেন যে তিনি বাঙালীকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এক এক সময়ে মনে হয় কখনো বুঝিতেও পারিবেন না। আর ভাবেন সহস্রবার নিন্দিত অথচ পরমশরণ্য সেই ওরা কাহারা?

৩

সেদিন সকালে যোগবাশিষ্ঠের বেঞ্চির কাছে পৌঁছিয়া বিলাস বাবু দেখিলেন বড়ই ব্যস্তসমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, সকলের মুখে চোখে উদ্বেগের অন্ত নাই, আর স্বয়ং যোগবাশিষ্ঠ, পেন্সন জীবনে D. A.—র স্বল্পাভিষিক্ত কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা, একান্তে অনাদরে পড়িয়া আছে।

ব্যাপার কি?

আর ব্যাপার! শোনেন নি বুঝি!

সর্বনাশ, মশাই সর্বনাশ।

এতক্ষণে হাজারে হাজারে ঢুকে পড়েছে।

কলকাতায় এসে পৌঁছলো বলে!

আচ্ছা মশাই পেন্সনটা থাকবেতো?

বিলাসবাবু বলিলেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

সবাই জানে আর আপনি জানেন না!

পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রের সৈন্য পশ্চিম বাংলায় ঢুকে পড়েছে।

না, না, এও কি সম্ভব? কই আজকার কাগজে দেখিনি তো।

আপনার দেখছি কাগজের উপরে খুব ভরসা। আর তাছাড়া কাগজ এখনো খবর পায়নি।

আপনারা কোথ থেকে জানলেন?

লোক এসে বলেছে মশাই দুঃসংবাদ কখনো মিথ্যা হয় না।

আর যদিই বা সত্যি হয় তার জন্যে আপনাদের চিন্তা কেন?

চিন্তা করবো না! কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, পেন্সনের টাকায় ডাল ভাতের জোগাড় হয়, না হয় নাই থাকলো D. A.! আর আপনি বলছেন চিন্তা করছেন কেন?

আমি বলছি ওসব বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করবার লোক আছে।

হঠাৎ দুর্গম জীবন-টানেলের অপর দিকের আলোক বিন্দুটি পোস্টাল সুপারের চোখে পড়িল—তিনি উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠিলেন, কিন্তু মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশের পূর্বেই হাঁপানীর টান উঠিয়া পড়িল, তবু যে দুটি শব্দ বলিলেন অপর সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট—তিনি বলিয়া ফেলিলেন—ওরা আছে।

দিগ্‌ভ্রান্ত কলম্বাসের দল অকূল সমুদ্রে ভগ্ন বৃক্ষশাখা দেখিল।

তখন সেই তিনকাল গত, D. A.-হীন পেন্সনজীবীর দল স্থান কাল পাত্র ও পবিত্র যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বিস্মৃত হইয়া, একযোগে উত্তাল নর্তন ও এক কণ্ঠে ঐকতান করিয়া উঠিলেন—ভয় নেই ওরা আছে, ভয় নেই ওরা আছে।

কিন্তু বয়স ও স্বাস্থ্যের অনুরোধে অধিকক্ষণ নৃত্য ও ঐক্যতান সম্ভব হইল না। সকলে একে একে বসিয়া পড়িলেন—এবং নিজ নিজ ফুসফুসের সামর্থ্য অনুসারে কমবেশি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কথা ফুটিল।

তাই বলো এতক্ষণ মনেই পড়েনি যে ওরা আছে!

আরে বাপু হাজার হোক ওরা ওরাই। মশাই ওরা ভেতো বাঙালী হলে আজ আমাদের রক্ষা করতো কে। ভাগ্যে ওরা ছাতু, আটা, গম খায়।

আরে এতদিন ওদের সম্বন্ধে যা বলেছি আশা করি সে সব সব কথা ওরা শুনতে পায়নি!

আর পেলেই বা কি! ওদের মনে দয়ামায়া আছে, অন্তরে ক্ষমা ব'লে একটা বস্তু আছে। আরে ওরা তো বাঙালী নয় যে সুযোগ পেলেই গলা টিপে মারবে।

আরে বীর তো ওরাই!

শুধু বীরত্ব কেন! বুদ্ধি!

এতক্ষণে ওদের কাছে খবর নিশ্চয় পৌঁছেছে।

খবর নিয়ে দেখুন হাওড়া স্টেশনে এতক্ষণ ওদের সৈন্যে, ট্যাঙ্কে, কামানে ছয়লাপ হ'য়ে গেল।

বাব্বা। ওরা কত বড় জাত।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বড় কম নন, এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন।

আমাদের ভয়টা কি মশাই ? আমরা আছি ওদের মাতৃক্রোড়ে।

মুখে যতই ওদের গালাগালি দিই না কেন, মনে ভক্তি আর ভরসার অন্ত নাই।

যা বলেছেন ! ঠিক এমনি ভাবটি ছিল আমাদের ব্রাদার অফিসারদের মনে ইংরাজ সরকার সম্বন্ধে !

শুনুন এক কথা, ওরা যখন শত্রু তাড়িয়ে দিয়ে কল্‌কাতায় ফিরবে তখন ওদের সম্বর্ধনা জানাতে হবে !

চমৎকার আইডিয়া।

আরে বাপু ওরাই তো মানুষ ! আমরা কেবল কথার পুঁটুলি।

এক কাজ করুন না কেন। একখানা মানপত্র লিখে ফেলুন না !

মন্দ নয়। প্রথমেই কবিগুরুর বাণী থাকবে 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়।'

না, না, বাংলা ভাষাতে চলবে না। আরে রাম একি একটা ভাষা।

তবে কি ইংরাজিতে।

সেটাও উচিত হবে না, আমরা যে এখন স্বাধীন !

তবে ?

পোস্টাল সুপার মহাশয় এতক্ষণে হাঁপানীর প্রাথমিক ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি শরীরের যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন —হিন্দি।

বলিয়াই পুনরায় কাশির কবলীভূত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল না, সকলে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, হিন্দি ! হিন্দি !

যেমন বীরের জাত, তেমনি বীরের ভাষা।

বাস্তবিক ভাষা তো হিন্দি ! হিন্দি বলতে শুরু করলেই মনে হয় বুকের ছাতি চার ইঞ্চি বেড়ে গেল।

তা ছাড়া রাষ্ট্রভাষা।

আর সর্ব্বোপরি ওদের ভাষা !

চলুন, তবে বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক। এতক্ষণে নিশ্চয় ওরা লড়াই ফতে করে ফিরছে।

তাই বলি ওরা থাকতে আমাদের ভয়টা কিসের ?

সবাই যখন উঠিতে ব্যস্ত আর বিলাসবাবু যখন বাঙালীচরিত্রের রহস্যো-

প্যাটনে উদ্‌ভ্রান্ত এমন সময়ে অপর একজন অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি এক বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পেন্সন পান না, তাই উভয় পক্ষই দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে। তেলে জলে তো আর মিশ খায় না। কিন্তু বিপদের সময়ে এসব সামান্য প্রভেদ কাহারো চোখে পড়ে না।

শুনেছেন মশায় দুঃসংবাদ।

বেসরকারী কলেজের পেন্সনহীন অধ্যক্ষ বলিলেন, দুঃসংবাদ বলে দুঃসংবাদ। এবারে আর বাঙালীর ছেলের করে খেতে হবে না।

হ্যাঁ শত্রু কলকাতা অধিকার ক'রে নিলে ছেলে বুড়ো সকলেরই সমান দশা হবে।

শত্রু? শত্রু কারা? অবশ্য এক হিসাবে ওরা শত্রু বই কি।

না, না, এখন ওরাই যে একমাত্র ভরসা।

কি বলছেন আপনারা?

পাশের রাষ্ট্র থেকে শত্রু ঢুকে পড়েছে শোনেন নি!

ও: এই কথা। ও খবর সত্য নয়। পাড়ার কয়েকটা ফাজিল ছোকরা রটিয়েছে। পুলিশ তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছে, স্বচক্ষে দেখে আসছি!

যাক, বাঁচা গেল! আমরা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মনে সন্দেহ ছিল। এদেশ প্রতাপাদিত্য, তিতু মীর, নন্দকুমার প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য বীরের দেশ। বাঙলায় ঢুকবে শত্রু! ছো:।

তা আপনি কোন্ দুঃসংবাদের কথা বলছেন?

আজকার কাগজে দেখেন নি। ইউনিয়ন কমপিটিটিভ পরীক্ষায় হিন্দি কমপালসরি সাবজেক্ট হতে চলেছে!

হিন্দি? ঐ ছাতুর ভাষা। মেড়োর ভাষা!

এ কেবল বাঙালীর ছেলেকে চাকুরি না দেবার ফন্দি!

ওরা যে বাংলার শত্রু।

ওরা যে বাঙালীর শত্রু।

ওরা থাকতে বাংলার কল্যাণ নাই।

বাংলার পাটে, বাংলার বুদ্ধিতে, বাংলার রক্তে ওরা ফেঁপে উঠছে—আর বাংলার গলাতেই দিচ্ছে পা।

না: ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে এক এক সময়ে মনে হয় ভগবানও বুঝি ওদের দলে।

ওদের সর্বনাশ হয় না !

ওদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় না !

হায় হায় ওরা থাকতে বাংলার নিস্তার নাই।

হাঁপানীর রুগী পোস্টাল স্থপার এতক্ষণে পুনরায় দম সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবারে বলিলেন—বাংলায় শত্রু ঢুকেছে সন্দেহ নেই, তবে পূর্বদিক থেকে নয়, পশ্চিম দিক থেকে ; বাংলার শত্রু ওরা·· ···

তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তব্য কাশির থক্ থক্ আওয়াজে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

নিন এবার সব ওঠা যাক।

গৃহ, ধন-সম্পত্তি ও D. A. হীন পেন্সন নিরাপদ জানিয়া ওদের অত্যাচার অনাচারের কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর দীর্ঘকালের প্রবাসী বাঙালী বিলাসবাবু একাকী বসিয়া অতলস্পর্শ বাঙালীচরিত্রের রহস্যোদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি এতদিনে বাঙালী চরিত্র কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু যাহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা ঐ ওরা কাহারা ? যাহাদের উপরে বাঙালীর যুগপৎ এত বিদ্বেষ ও ভরসা, এত ধিক্কার ও নির্ভর, এত ঘৃণা ও ভক্তি, দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত সেই ওরা কাহারা ?

ওলট পালট পুরাণ

দ্যূতপণে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনগমন করিলে সভারূঢ় সপার্ষদ দুর্যোধন পুরাণবাগীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পুরাণবাগীশ খুঙ্গীপুঁথি সহকারে উপস্থিত হইলে দুর্যোধন আদেশ করিলেন আজ পুরাণ পাঠ হইবে।

যে-আদেশ মহারাজ, বলিয়া পুরাণবাগীশ আরম্ভ করিলেন—পুরাকালে এই দেশে পুরু নামে মহা পরাক্রান্ত এক নৃপতি ছিলেন। বহুকাল পরে সেই বংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ—

দুর্যোধন বাধা দিয়া বলিলেন ,কিছুই জানো না দেখিতেছি। বাল্যকালে বিদ্যার্জন করো নাই, এখন কিম্বদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া পুরাণ লিখিয়াছ, তোমার মতো এমন অপদার্থ আমি দেখি নাই। তোমাকে প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি নিতান্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে।

এখন পুরাণবাগীশ বিদ্বান (!) না হইলেও নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। তিনি দুর্যোধনের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, মহারাজের অনুমান সর্বৈব সত্য। আমি ভুলক্রমে অন্য একখানা পুঁথি আনিয়াছি তাই এই দুর্দৈব। মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে আর এক দিবস সময় দান করুন।

দুর্যোধন বলিলেন, তথাস্তু। আগামী কল্য আমরা আবার পুরাণ শ্রবণ করিব।

২

পরদিন রাজসভায় পুনরায় পুরাণ পাঠ সুরু হইল।

"পুরাকালে পুরু নামে এক মহাপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন এই দেশে। সেই বংশে ধৃতরাষ্ট্র নামে তদধিক পরাক্রান্ত এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শারীরিক সৌন্দর্যে অসীম, কিন্তু অতুলনীয় তাঁর দুইটি চক্ষু, তাহা যেমন সুন্দর তেমনি জ্যোতির্ময়। কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের একশত তনয় জন্মগ্রহণ করিল, জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন বুদ্ধি প্রজ্ঞা প্রতিভা বীর্য রণনৈপুণ্য ও চতুঃষষ্টি কলা সমন্বিতা বিদ্যায় জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত। এমন সময় পাণ্ডু নামে নাম-গোত্রহীন ভবঘুরে এক দরিদ্র বিদেশী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কৃশকায়, মরকুটে, বীভৎসদর্শন পাঁচটি যুবক। পাণ্ডু বলিল—ওগুলি তাহার পুত্র, কিন্তু চেহারা দেখিলে বংশ সাম্য মনে উদয় হয় না, কাহার পুত্র কে জানে। কিন্তু বিশেষ

বিস্ময়ের এই যে উক্ত পাণ্ডু পৌরব সাম্রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রার্থনা করিল, বলিল, সে নাকি মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা। ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ মহারাজা এক চপেটাঘাতে পাণ্ডুকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, হস্তিনাপুরবাসী স্বচক্ষে দেখিল পাণ্ডুর প্রেতাত্মা নরকে নীত হইল। তখন পাণ্ডুতনয়গণ কাঁদিয়া মহারাজার পায়ে পড়িল। মহারাজ দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের রাজ্য মধ্যে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ভবঘুরে বিদেশীয় তথাকথিত পুত্রগণ পাঁচজনে মিলিয়া একটা কুৎসিত স্বৈরিনীকে বিবাহ করিল। ইহাতে স্বয়ং সুনীতির বিগ্রহ মহারাজ দুর্যোধন এমন আহত বোধ করিলেন যে তিনি অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়া তাহাদের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মনের দুঃখে তাহারা বনে গেল।”

পুরাণ শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া পুরাণবাগীশকে অর্পণ করিলেন। সভাস্থ সকলে বলিল, এ মহারাজার যোগ্য কাজ হইয়াছে বটে।

সভাভঙ্গের পূর্বে দুর্যোধন আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে অদ্য হইতে তাঁহার রাজ্য মধ্যে, বিদ্যালয়ে, দেবালয়ে, সভাস্থলে এই পুরাণ সর্বত্র পঠিত শ্রুত ও গীত হইবে। অন্য কোন বাজে পুরাণ পাঠ, শ্রবণ ও গান মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ।

সভাস্থ সকলে এক বাক্যে বলিল, অহো মহারাজার কি সত্যনিষ্ঠা।

৩

কুরুক্ষেত্র মহাহবে কৌরবগণ নিহত ও পরাজিত হইলে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পরদিবস সুপ্রভাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন, পুরাণবাগীশকে ডাকিয়া পাঠাও, পুণ্য পবিত্র পুরাণ কথা শ্রবণ করিব।

পুরাণবাগীশ খুঙ্গি পুঁথি লইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পুরাণ পাঠ করো। পুরাণবাগীশ পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে অনেক শিখিয়াছিলেন, তিনি আরম্ভ করিলেন—“পুরাকালে এই দেশে পুরু নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। সেই বংশে পাণ্ডু নামে এক সূর্যসম পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার দেবোপম পঞ্চ তনয়। এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র নামে এক বাউণ্ডুলে অন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে তাহার

একশত মূর্খ নীতিজ্ঞানহীন পুত্র। উক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের অর্দ্ধেক দাবী করিল, বলিল সে-ও নাকি পুরু বংশ উদ্ভূত। এই অদ্ভুত কথা শ্রবণে পাণ্ডব ও রাজ্যের অধিবাসীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মহাবীর্যশালী পাণ্ডবগণ তাহাদের অনায়াসে পরাজিত করিলেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির একাকী স্বহস্তে উক্ত ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রকে নিহত করিলেন। তথাকথিত কৌরবগণ যুদ্ধে অনেক প্রকার অন্যায় কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান সেনাপতি ভীষ্ম রথে শিখণ্ডীকে স্থাপন করিয়া অন্যায় সমর করিয়াছিল। অন্যতম সেনাপতি দ্রোণ 'অভিমন্যু হতো ইতি গজ' বলিয়া মহাবীর পার্থকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এ সব ছল কলা ব্যর্থ হইয়া অবশেষে ধর্মের জয় হইল—মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মের প্রতিমূর্তি।"

পুরাণ কথা শ্রবণে সভাস্থ সকলে সাধু, সাধু রব করিল এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া পুরাণবাগীশের হাতে অর্পণ করিলেন।

তারপরে তিনি রাজাদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে এখন হইতে এই পুরাণ রাজ্যের বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, সভাস্থলে, গৃহে গৃহে সর্বত্র পঠিত শ্রুত ও গীত হইবে। অন্য প্রকার পাঠ শ্রবণ ও গান নির্বাসন দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

রাজাদেশ শ্রবণে রাজ্যময় ধ্বনি উঠিল 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' সার্থক মহারাজার নাম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

পণ্ডিতগণ দেব-ভাষায় বলিয়া উঠিল—'সত্যমেব জয়তে'।

কৃষ্ণ-নারায়ণ সংবাদ

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল! ব্যাপার আর কিছুই নয়; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় গল্প করিবার জন্ত (আসল কথা চা পান করিবার জন্ত, যুদ্ধের জন্ত চিনির দাম যা বাড়িয়াছে!) দুই মাইল হাঁটিয়া (ঐ সঙ্গে সন্ধ্যা ভ্রমণও হয়) নারায়ণ বাবুর বাড়ীতে যাই। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখি ফরাসের উপরে নারায়ণ ও কৃষ্ণ বাবু মাথা নীচু করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। আর ছোটদা (নারায়ণ বাবুর ছোটদা—আমি তাঁহাদের চা পান করি, অতএব আমারও ছোটদা; পাঠক কমলাকান্তের গরু কাহার জেরার উত্তর স্মরণ করিয়া দেখুন) আরাম কেদারায় হেলান দিয়া কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া আছেন। এমন কখনো দেখি নাই—কাজেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

নিঃশব্দে ফরাসের একান্তে বসিয়া সাতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলাম—আশা করি কোন খারাপ খবর আসেনি।

কৃষ্ণ বাবু বোধ হয় মনে মনে কোন একটা হিসাব করিতেছিলেন, অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে বলিলেন—এখন ঠাট্টার সময় নয়।

তবে আর সন্দেহ নাই; দুঃসংবাদই আসিয়াছে। কিন্তু সংবাদটা কি?

এবারে নারায়ণ বাবুর দিকে তাকাইয়া শুধাইলাম—ব্যাপার কি?

নারায়ণ বাবু শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতের লোক; সাতটা প্রশ্নের পর একবার জবাব দেন; মুখের মধ্যে সর্ব্বদা চার পাঁচটা পান থাকে বলিয়া তার আবার অনেকটাই শোনা যায় না।

নারায়ণ বাবু বলিলেন—মুস্—

বুঝিলাম তিনি বলিতে চাহেন 'মুস্কিল।'

অগত্যা ছোটদার দিকে চাহিলাম—এতক্ষণে তাঁহার কড়িকাঠ গোনা শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি এবারে জানালার শিকগুলির দিকে নিবদ্ধ—বুঝিলাম এক্ষণে তিনি শিক গুনিতেছেন।

কিন্তু এত সময় লাগে কেন? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ! এই তো আমি গনিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম—পাঁচটা মাত্র শিক!

কৃষ্ণবাবু নারায়ণ বাবুকে বলিতেছেন—এক বছরের মধ্যে দশ হাজার জোগাড় কর'তে হবে নইলে আগাম টাকা—

পানের বাধা ঠেলিয়া নারায়ণ বাবুর মুখ হইতে বাহির হইল—ক্ষয়—

বুঝিলাম শব্দটির পূর্ণরূপ 'ফরফিট।'

এ আবার কি হাঙ্গামায় ইহারা জড়াইয়া পড়িলেন। চায়ের মজলিশ উঠিয়া যায় দেখিতেছি!

ছোটদার দিকে তাকাইলাম—তিনি বইয়ের আলমারির দিকে চাহিয়া আছেন; যাক্ অন্তত জানালার শিকগুলা গনিয়া শেষ করিয়াছেন! কিন্তু আলমারিতে যে বই অনেক।

পাঠক, আমি যে আশঙ্কা ও উদ্বেগ সহ্য করিয়াছি—তোমাকে তাহা দিতে চাহিনা; আমি অনেক ভুগিয়া যাহা জানিয়াছি তোমাকে সংক্ষেপে সে কথা বলিয়া ফেলি!

আজ দুপুর বেলা কৃষ্ণ বাবু ও নারায়ণ বাবু কলিকাতায় জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন—অর্থাৎ জমি পছন্দ করিয়া আসিয়া পাঁচশো টাকা করিয়া আগাম দিয়া আসিয়াছেন—এক্ষণে এক বছরের মধ্যে বাকি দশ হাজার টাকা শোধ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা আগাম টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। সম্প্রতি কিরূপে ওই টাকা সংগ্রহ করা যায় এবং সংসারের কোন্ কোন্ খরচ কমানো যায় সেই বিষয়ে রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি বসিয়াছে। পরিস্থিতি সঙ্কটজনক সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বাবুর সতর্ক বাণী মনে পড়িল এখন ঠাট্টার সময় নয়।

নিশ্চয় নয়—কারণ আমার নিজেরও স্বার্থ আছে। পাঠক, তোমাকে গোপনে বলিয়া রাখি—আমিও একখণ্ড জমি কিনিব স্থির করিয়াছি; আগাম টাকা দেওয়া উচিত কি না, আলোচনা করিবার জন্যই আজ আসিয়াছিলাম। অদৃষ্টগুণে দেখিলাম সেই আলোচনাই হইতেছে—অতএব জিজ্ঞাসুর মত বসিয়া কৃষ্ণ-নারায়ণ সংবাদ শুনিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণ বাবু বলিলেন—নারায়ণ তোমার opening কত।

Opening! নারায়ণ বাবু 'ক্রীভম অব্ স্পীচ্' আয়ত্ত করিবার জন্য মুখের পান ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

নারায়ণ বাবুর এ মূর্তি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই!

—opening! আপনার দশ দিক দিয়ে টাকা আসছে।

—ছাই আস্‌ছে! দশ দিক দিয়ে আস্‌ছে বিশ দিক দিয়ে খরচ, কি থাকে?

—কৃষ্ণ বাবুর দারিদ্র্য-বিলাস দেখিয়া কেন জানি আমার Diogenesকে মনে পড়িয়া যায়। চারতলা বাড়ীর—মাহিনা ও উপরি দিয়া মাসিক সাতশো

টাকার ও ব্যাঙ্কের একান্ন হাজার টাকার ভাঙা টবের মধ্যে তিনি যেন কায়ক্লেশে বসিয়া আছেন; মুখে অতি সকরুণ মিনতির একটি ভাব—'আমার রোদটুকু ছাড়িয়া দাঁড়াও।'

এ হেন কৃষ্ণবাবু বলিলেন—গেষ্টের জ্বালায় আমি মারা গেলাম। কুলোবে কি করে?

—গেষ্ট আসা বন্ধ করুন; যত সব—।

পান ফেলিয়া দেওয়াতে নারায়ণ বাবুর ফ্রীডম অব স্পীচ বেশ আয়ত্ত হইয়াছে।

হঠাৎ কৃষ্ণ বাবু ফরাসে কয়েকটা ঘুসি মারিয়া উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শাশুড়ী! শাশুড়ী!

আমরা তিনজনে চমকিয়া উঠিলাম। ছোটদার মুখ হইতে ফরসীর নল খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি আলমারির বই গণনা শেষ করিয়া কিছুক্ষণ আগে ধূমপান করিতে লাগিয়াছেন।

আমরা তিনজনে জিজ্ঞাসুভাবে বলিলাম—শাশুড়ী?

—শাশুড়ী নয় তো কি? আমার অতিথি ব্যাধির মূলে আছেন শাশুড়ী। আর তাঁর লোক!

নারায়ণ বাবু বলিলেন—তাড়ান্।

কৃষ্ণ বাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিলেন—একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষ্ণ বাবু অতি সদাশয় লোক কিন্তু হঠাৎ কোন একটা কাজকে কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান হইলে তিনি মরিয়া হইয়া ওঠেন। এইসব লোকেরাই পুরাকালে ভীষ্ম, কর্ণ, রামচন্দ্র হইয়াছেন।

বুঝিলাম শাশুড়ীর আজ সমূহ বিপদ।

কৃষ্ণ বাবুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া নারায়ণ বাবুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন: আমিও দেখছি—

কিন্তু মনে পড়িয়া গেল তাঁহার শাশুড়ী নাই, আবার তখনি মনে হইল শাশুড়ী না থাক্ মোটর আছে, অতএব ফরাসে ঘুষি মারিয়া বলিলেন—মোটর বেচ্‌বো আজই।

দেখিলাম ছোটদার মুখের উপর দিয়া শঙ্কিত গণনার একটা কালো ছায়া হুস্ করিয়া উড়িয়া গেল। বাসা হইতে কর্মস্থল পাঁচ মাইল পথ। তিনি খুক

করিয়া একটু কাশিলেন—প্রতিবাদ করিয়া নয়, কেবল নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপনার্থ।

মোটর বিক্রির কথায় কৃষ্ণ বাবু বলিলেন—সে কি হে? গাড়ীখানা করে আফিসে যেতাম। যেতে আসতে চারগণ্ডা পয়সা বাঁচতো! এতে যে খরচ আরও বাড়লো!

তারপরে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দেখলেন তো। কপাল! কপাল! কোথায় খরচ কমবে না বেড়েই গেল!

যেন মোটরখানা ইতিমধ্যেই বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

নারায়ণ বাবু বলিলেন—খরচ কমাতে চান তো ছোট বাসা নিন্—

—কিন্তু ফার্ণিচারগুলো—

—বিক্রি করে দিন্।

আমি বলিলাম—বিক্রি করবেন কেন, রেখে দিন; বাড়ী হলে তো লাগবে।

কৃষ্ণ বাবু এমনভাবে আমার দিকে তাকাইলেন যে আমি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলাম।

ঐ ফার্ণিচার যাবে আমার বাড়ীতে!

বুঝিলাম এসব অব্যাপারে কথা বলা আমার কত গর্হিত হইয়াছে।

নারায়ণ বাবু মুদিতচক্ষু; বুঝিলাম তিনি হিসাবের অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। সহজে বাহির হইবেন না; আর যখন হইবেন, না জানি কি অপূর্ব্ব রত্ন সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

হঠাৎ তিনি ফরাসের চৌকি চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—আসুন ছেলে মেয়েদের সব দেশে পাঠানো যাক্; এখানে কিছুদিন ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকা যাবে!

কৃষ্ণ বাবু ও নারায়ণ বাবু সোল্লাসে চৌকি চাপড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলাম পুরানো ফার্ণিচার চোরা বাজার পর্য্যন্ত ও পৌঁছিবে না।

একজন বলিলেন—দিনাজপুরে পাঠাবো।

আর একজন বলিলেন—মধুপুরে—

—দিনাজপুরে জিনিষপত্র সুলভ

—মধুপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা

—দিনাজপুরে বাসা ভাড়া লাগবে না।

—মধুপুরে ডাক্তারের খরচ নেই।

আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম—ছেলে মেয়েরা মফঃস্বলে যেতে আপত্তি করবে না?

উভয়ে কোরাসে বলিয়া উঠিলেন—ড্যাম্ ইট্!

ছোটদা অনেকক্ষণ ফরসীর নল ত্যাগ করিয়া মোজাইক-করা মেঝের বর্ণছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

অবশেষে কৃষ্ণ বাবু ও নারায়ণ বাবু উঠিয়া পড়িলেন, লাঠি ও ওভারকোট লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শুধাইলাম—কোথায় চল্লেন?

—কাজ!

একটিমাত্র কথার সুদর্শন অস্ত্রে আমার জিজ্ঞাসাকে ছেদন করিয়া তাঁহারা অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

তাকাইয়া দেখি ছোটদা নূতন শালখানা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখিতেছেন; বোধ হয় টানা-পোড়েনের দুই দিকেই পশম কিনা আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে!

উঠিয়া পড়িতে হইল!

বুঝিলাম জমি কেনাতে কত বিপদ্। স্থির করিলাম এমন কাজের মধ্যে আর যাইব না। পরদিন যখন জমির দালাল আসিল, টাকা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলাম।

কৃষ্ণবাবু ও নারায়ণবাবু ঠেকিয়া শিখিতেছেন, দেখিয়াই আমার শিক্ষা হইয়া গেল!

পকেটমারের প্রতিকার

ধর্ম্মতলা ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রামের জন্ম জন্ম অপেক্ষা করতেছি। প্রতি মূহুর্ত্তে অপেক্ষমান জনতার আয়তন বাড়িতেছে কিন্তু যার জন্ম এত আয়োজন সেই ট্রামের দেখা নাই।

না-আপ না-ডাউন।

ট্রামের চাকাগুলো অবস্থান ধর্ম্মঘট করিল নাকি? তাহা করুক বা না করুক বাস আসিয়া পড়িলেও তো চলে। বাসেরও দেখা নাই। এতগুলো লোক অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই এবারে মুখ চলিতে আরম্ভ করিল।

ধর্ম্মঘট হয়েছে মশাই।

না, না, তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

কিন্তু বাসের হ'ল কি?

এবারে ধর্ম্মঘট-প্রবক্তা সুযোগ পাইল, বলিল, তার কার ছেঁড়া নয়, ট্রামে ধর্ম্মঘট হ'য়েছে বাসও সেইসঙ্গে সিমপ্যাথেটিক ষ্ট্রাইক করেছে।"

ট্রাম ও বাস কিছুই যখন আসিবে না তবু প্রবক্তা কেন অপেক্ষা করিতেছে এই প্রশ্ন কাহারও মনে আসিলেও মুখে কেহ প্রকাশ করিল না।

যেমন হয়েছে গভর্ণমেণ্ট, দিক না আচ্ছা ক'রে ঠুকে।

কড়া হাতে শাসন চাই, বাপু বাছা করে কিছু হবে না। কথায় কথায় ধর্ম্মঘট।

একজন বলিয়া উঠিল,—আপনারাই কিন্তু ধর্ম্মঘট বাধলে চাঁদা দেন, প্রতিবাদ সভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন, এখন আবার—

নিশ্চয় দেবো চাঁদা—

নিশ্চয় যাবো সভায়, গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কি বুঝাইয়া দিতে হইবে জানিবার উৎসাহ না থাকায় ভিড়ের অন্ম প্রান্তে গেলাম। যাইবার কিছু কারণও ঘটিয়াছিল। অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম যে আড়াগোড়া এক ভদ্রলোক বক্তৃতার ভঙ্গীতে কি যেন বলিতেছেন! ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া আর কি হইবে?

ট্রাম ও বাসের আত্যন্তিক অনুপপত্তি, ক্লান্তশরীর ও অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের প্রশস্ত সময় এমন কোন শাস্ত্র বলে না, তবু উহা ছাড়া যখন

গত্যন্তর নাই কাজেই ঐদিকে চলিলাম। কাছে গিয়া যাহা শুনিলাম তজ্জন্ত আমি কেন, স্বয়ং শাস্ত্রকারও প্রস্তুত ছিলেন না।

মহাশয়গণ সাবধান, পকেট সামলে চলবেন, ধারে কাছে পকেটমার আছে। গতকল্য আমার পকেট থেকে দেড়শ টাকা তুলে নিয়েছে। আপনারা এখানে সাবধান হ'য়ে চলাফেরা করবেন।

বুঝিলাম এই বাণীই এতক্ষণ তিনি সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিতে-ছিলেন।

জনতার মন্তব্যও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল।

মাথা খারাপ হ'য়েছে।

ঠিক মাথা খারাপ নয়, পাগল।

তুমি বাপু সাধুমানুষ তোমার পকেটে এত টাকা কেন ?

টাকা পয়সা নিয়ে সাবধানে চলা ফেরা করতে হয়।

শেষোক্ত মন্তব্য সাধুর কানে গেল, তিনি বলিলেন—সেই জন্যই তো আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। সাবধানে চলাফেরা করবেন, এখানে পকেট-মারের বড় উপদ্রব।

সাধুর সতর্কবাণী ও অ-সাধুর অর্থাৎ জনতার মন্তব্য সমানে চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে অদূরে ট্রাম ও বাস দেখা দিল। সকলেই সাধুকে ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। ২।৪ খানি ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া একখানি ট্রামে উঠিয়া পড়িয়া ঝুলিতে ঝুলিতে আমি যাত্রা করিলাম। ট্রামে বাসে আমাদের নিত্য ঝুলন যাত্রা।

পরদিন ট্রামে ঐ জায়গা দিয়া যাইতে গেরুয়াধারী সাধুকে তেমনিভাবে বক্তৃতা করিতে দেখিতে পাইলাম। পরদিন......এবং তারপর দিন......এবং তারপর দিন।

পাঁচ সাত দিন পরে ঐ জায়গা দিয়া যাইতে সাধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম সাধুলোকের ধৈর্য্য গৃহীর চেয়ে অধিক হইলেও অনন্ত নয়। ক্রমে ব্যাপারটা ভুলিয়াই গেলাম।

২

দশ বারো দিনে পরে অন্য এক লাইনের ট্রামে সাধুটির সাক্ষাৎ পাইলাম। নমস্কারান্তে শুধাইলাম আপনি ধর্ম্মতলার মোড়ে পকেটমার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেন না ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ।

এখন আর করেন না বুঝি ?

না, আর তো প্রয়োজন নেই।

কেন ?

পাঁচ ছ দিন আগে দেড় শ টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাঠিয়ে দিয়েছে! হঠাৎ পাঠিয়ে দিতে গেল কেন ?

সাধু বলিলেন—ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল।

লোকটাকে গ্রেপ্তার করলেন না!

চিঠির মধ্যে এসে পৌঁচেছে। আচ্ছা, আসি নমস্কার।

সাধু নামিয়া গেলেন।

বুঝিলাম গেরুয়া পোষাক পুলিশের uniform-এর চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রদ।

হাতি

নূতন আইনের বলে সরকার যাবতীয় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। সদর হইতে হাকিম ভাঙাকলসী গ্রামের জমিদারবাবুর কাছারীতে আসিয়াছেন কাছারীবাড়ী দখল লইবার জন্ত। কাছারীর মধ্যে প্রকাণ্ড ফরাসের উপরে জমিদার দক্ষিণাবাবু, হাকিম সামন্ত সাহেব, নায়েব ও অন্যান্ত কর্ম্মচারিগণ উপবিষ্ট। দক্ষিণাবাবু বিমর্ষ, নায়েব প্রভৃতিও কর্ত্তব্য-বোধে বিমর্ষ, সামন্ত সাহেবের মুখে সমবেদনা প্রকাশের চেষ্টা।

সামন্ত সাহেব বলিলেন—দক্ষিণাবাবু, আপনার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমরাও তো ছোটখাটো একটা জমিদার ছিলাম, ঘুষখোর সরকার সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।

সরকারী চাকুরেগণ সুযোগ পাইলেই সরকারের নিন্দা করিয়া নিজের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর সামন্তের জমিদারী পৌরাণিক আমলে হয় তো ছিল, ঐতিহাসিক কালে কেহ তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, সরকারের দোষ দিয়ে লাভ নেই, দেশের লোকেই তো দাবী করেছিল। তবু মন্দর ভালো এই যে সরকার জমিদারী ও কাছারী বাড়ী প্রভৃতি নিয়ে ক্ষান্ত হ'য়েছে, বসতবাড়ীটা সুদ্ধ টান মারেনি।

সামন্ত একবার এদিক ওদিক দেখিয়া গলা নীচু করিয়া বলিলেন বসত-বাড়ীও বাদ যাবে না, সমস্ত ধ'রে টান মারবে, ঐ যে বল্‌লাম—আগাগোড়া ঘুষখোরের দরবার।

আগাগোড়ার মধ্যে সামন্তর মতো সরকারী কর্ম্মচারী পড়ে কিনা এ প্রশ্ন কাহারো মনে উঠিল না।

প্রসন্ন পাল নায়েব। জমিদারবাবু ও হাকিম সাহেব দু'জনকেই খুশি রাখিবার আশায় একবার নড়িয়া বসিয়া বলিল, নিশ্চয় নিশ্চয়! তাহার বিশ্বাস ঐ দুটি শব্দে লাঠি না ভাঙিয়া সে সাপ মারিয়াছে, জমিদার রাগ করেন নাই, হাকিম খুশী হইয়াছেন।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, আর দুঃখ ক'রে লাভ নেই। কাছারী সংক্রান্ত সব জিনিস—খাতা-পত্র, সিন্দুক, বন্দুক সব মিলিয়ে নিন। দাও প্রসন্ন, হাকিম সাহেবকে সব বুঝিয়ে দাও।

সামন্ত বলিলেন, ওর আর বোঝাবুঝি কি; আপনার মতো মহাশয় ব্যক্তি কি আর মিথ্যা হিসাব দাখিল করবেন। নায়েববাবু যা দেবেন আমি চোখ বুজে সই ক'রে দেবো।

সে আপনার দয়া। জমিদারবাবু বলিলেন, সামন্ত সাহেব মধ্যাহ্ন-ভোজনটা কিন্তু আর বাড়ীতেই—অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

বিলক্ষণ। আপত্তি? আপত্তি কিসের? আমি ওসব জাতভিৎ মানিনে, তা ছাড়া মহাশয় তো আমাদের স্বজাতি।

বিশেষ আপ্যায়িত হ'লাম। আমি তা হ'লে এবারে উঠি। বলিয়া দক্ষিণাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ও হাতিটা কার?

অদূরে নদীর ধারে একটা হাতি দেখা গেল।

এই গরীবেরই—

সামন্ত একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, প্রসন্নবাবু তবে ওটাও তালিকায় ধরুন।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, মাতুর সঙ্গে জমিদারীর সংস্রব নেই। ওটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিংবা আরো সত্য ক'রে বলতে গেলে বলা উচিত—ওটি আমার কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর সম্পত্তি। অন্নপ্রাশনের সময়ে তার মাতামহ তাকে ওটি দিয়েছিলেন।

হঠাৎ কর্তব্যভারে পীড়িত সামন্ত সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন, আরো সত্য ক'রে বললে কি দাঁড়াবে কে জানে।

আমার শ্বশুরের লিখিত চিঠি দেখাতে পারি।

বিচার করবার ভার আমার উপরে নেই, প্রয়োজন হ'লে আদালতে দেখাবেন।

কোন রকমেই কি ওটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না—?

সামন্ত হাসিয়া বলিলেন, সে রকম অফিসার তো আমি নই, আসতো বোস, আপনার কিছু ভাবনা ছিল না, কিছু খেয়ে ছেড়ে দিয়ে যেতো। হাজার হোক 'অনেষ্টি' বলে একটা কিছু আছে তো!

আগাগোড়া ঘুষখোর সরকারের একজন কর্মচারী অন্ততঃ নির্লোভ ও সাধু জানিয়া দক্ষিণাবাবুর যে পরিমাণ আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, তেমন আনন্দিত হইলেন বলিয়া মনে হইল না।

দক্ষিণাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—তা বটে। সবই যখন গেল ওটাকে রেখে আরকি করবো, তা ছাড়া এখন হাতির খোরাক জোগাবো কি ক'রে? নিয়ে যান, তবে একটা অনুরোধ, কয়েকটা দিন পরে নেবেন।

কৌতূহলী সামান্ত শুধাইলেন কেন বলুন তো?

সামনের পূর্ণিমায় বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়ে, সেই দিনটা পর্যান্ত থাকুক, তারপরে ছেড়ে যাবে আমাকে।

সামন্ত সরকারী কর্মচারী হইলেও অমানুষ নন, হয়তো দক্ষিণাবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতেন, কিন্তু জমিদার-দুহিতার কন্যার বিবাহ সংবাদে মনে পড়িয়া গেল সামনের পূর্ণিমাতে তাঁহার পুত্রেরও বিবাহ।

যে-কারণে দক্ষিণাবাবুর হাতিটি প্রয়োজন, তাঁহার নিজের ক্ষেত্রেও সেই কারণ উপস্থিত। বলা বাহুল্য এই দুই কারণের দ্বন্দ্বে সামন্ত বিজয়ী হইলেন, কারণ তিনি আগাগোড়া-ঘুষখোর সরকারের একমাত্র অনেষ্ট অফিসার, আর দক্ষিণাবাবু হৃত-সর্বস্ব সামান্য জমিদার।

মাপ করিবেন দক্ষিণাবাবু ওটি পারবো না। মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত কাছারী বাড়ী দখল নেওয়া বন্ধ রাখতে পারি, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে যেতে পারি না।

তবে নিয়ে যান। কিন্তু একটু সাবধানে রাখবেন, বড একগুঁয়ে জন্তু, ডানে যেতে বললে বাঁয়ে যাবে, আমরাই সময়ে সময়ে মুস্কিলে পড়ি, ওখানে তো পড়বে নূতন লোকের হাতে।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ভারত সরকার পঞ্চশীলের রশি দিয়ে রুশ-মার্কিনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, এতো সামান্য একটা হাতি।

আমার মাহুত বরঞ্চ গিয়ে সদরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

সেটা মন্দ নয়। বলিলেন সামন্ত সাহেব।

সরকার হাতি বাজেয়াপ্ত করিতেছে শুনিয়া দক্ষিণাবাবুর গৃহিণী সরকারের বাপান্ত করিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী কাঁদিল, কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির হিমালয় সামন্ত সাহেবের সঙ্কল্প টলিল না।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ও অপরাহ্ন-নিদ্রা সাঙ্গ করিয়া সামন্ত গ্রামবাসীর নীরব অভিশাপের মধ্যে হস্তী পৃষ্ঠারূঢ় বিজয়ী সামন্ত সাহেব ভাঙাকলসী গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

জমিদার পরিবার দুঃখে মুহ্যমান ও নীরব, হঠাৎ কোথা হইতে দক্ষিণাবাবুর শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপারটা কি যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, তারপরে দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, দিদির বিয়ের দিন মাতু আসবে।

সে মাঝে মাঝে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করে, লোকে খুব হাসে। কিন্তু আজ কেহ হাসিল না। আত্মীয়-স্বজনের রসবোধের অভাবে বিরক্ত হইয়া সে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

২

সামন্ত সাহেব বলিয়াছেন যে পক্ষীলের বাঁধন অতিশয় মজবুৎ, কুশ মার্কিন বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু হাতের কাছে সেরূপ দৃঢ় রজ্জু না থাকাতে মাতু ওরফে মাতঙ্গিনীকে লইয়া তিনি মুস্কিলে পড়িলেন। সরকার হাতি পোষেন না; কাজেই সদরে বা মহকুমায় বা রাজধানীতে পিলখানা কিংবা মাহুতের ব্যবস্থা নাই। তারপরে হাতির যে এমন অমিত ক্ষুধা তাহাই বা কে জানিত। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে মাতু দুবেলায় আধমণ চাল খায়—সঙ্গে ভাইটামিন হিসাবে পাঁচটি তাজা কলাগাছ।

সামন্ত সাহেব মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন, গৃহিণীর কাছে বলিলেন—দেখছ খোরাকের নমুনা।

গৃহিণী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিলেন, হাতির খোরাক বেশি তো হবেই। ও তো আর পেট-রোগা হাকিম নয়।

সামন্ত সাহেব বুঝিলেন, কথাটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া। তিনি পেট রোগা ও হাকিম দুই-ই সত্য।

সামন্ত সুর বদলাইলেন, বলিলেন, ভাবছি হাতিটা কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিই।

গৃহিণী রুষ্ট-কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া শুধাইলেন, কেন, কেন?

সরকারের জিনিস সরকারের কাছে চলে যাক্। নিজের বাড়ীতে রাখা উচিত নয়।

সামন্তের কথা শুনিয়া গৃহিণী স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন—কি আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! নিজের বাড়ীতে রাখা অন্যায়। ওসব ধর্ম্মের কথা আর যেখানে হয় শুনিয়ো—এখানে নয়।...হাতিটা থাকবে, আমার বাড়ীতেই থাকবে, আমার খুকু ঐ হাতি চেপে বিয়ে করতে যাবে, বিয়ে ক'রে

বউ নিয়ে হাতি চেপে ফিরবে। পাঁচ গাঁয়ের লোক দেখে বলবে—হাঁ একটা বিয়ে দেখলাম বটে।

সামন্ত নিজের ফাঁদে নিজে পড়িয়াছেন। হাতিটা লইয়া পৌঁছিয়া পুত্রের আসন্ন বিবাহে হস্তীপ্রয়োগের মৎলবটা তিনিই গৃহিণীকে জানাইয়াছিলেন। এখন আর 'না' বলেন কি উপায়ে? কাজেই হাতিটা সামন্তগৃহে থাকিয়া দৈনিক আধমণ চাল ও পাঁচটি তাজা কলাগাছ নিয়মিত আহার করিতে থাকিল। সামন্ত মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন বিবাহটা চুকিয়া গেলে হাতে পায়ে ধরিয়া দক্ষিণাবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন।

ইতিমধ্যে সামন্ত-গৃহিণী দু-একদিন হাতি চাপিয়া হাওয়া খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে হাতির ইচ্ছা অন্যরূপ। মাহুতের (সামন্ত একটা মাহুত জোগাড় করিয়াছেন) উপরোধ অনুরোধ তাড়ন পীড়ন সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী এক পা ও নড়ে নাই। তখন গৃহিণী ক্ষমায় স্বরে বলিয়াছিলেন, থাক, থাক, মাতু আমার বিয়ের বর ছাড়া আর কাউকে পিঠে তুলবে না।

তারপরে ব্যাখ্যার ছলে দর্শকদের বুঝাইয়া বলিলেন, এতো যে-সে হাতি নয়, পাটহাতি, ওদের রকম-সকমই আলাদা।

অতএব পাটহাতি আম্রবৃক্ষতলে অচল অটল দাঁড়াইয়া রহিল—আর উদ্বিগ্ন সামন্ত বিবাহের দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

তারপরে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীমান্ সুরেন্দ্র রেশমী ধুতি চাদর চন্দন ও টোপরে সুসজ্জিত হইয়া শঙ্খ ও সানাইয়ের ধ্বনির মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিল, সঙ্গে দু'চার জন বন্ধুবান্ধব চলিল। বরকর্তা ও অন্যান্য প্রবীণ বিজ্ঞজনেরা চলিলেন ঘোড়ার গাড়ীতে। নিকটেই একটি গ্রামে কন্যা পক্ষের বাস। মাহুতের সঙ্কেতমাত্রে সেদিন হাতিটি যাত্রা করিল, কোনপ্রকার অসম্মতি বা অশিষ্টতা জ্ঞাপন করিল না।

পুলকিত গৃহিণী সকলকে শোনাইয়া শোনাইয়া বলিলেন—কেমন বলে-ছিলাম না, এ আমার পাটহাতি, বিয়ের বর না নিয়ে নড়বে না। কেমন, এখন দেখলে তো!

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে দেখিল—কিন্তু তখনো কেহই জানিত না যে এখনো দেখিবার অনেক বাকি।

৩

দক্ষিণাবাবু নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, গৃহিণী তারস্বরে কাঁদিতেছেন, বিন্ধ্যবাসিনী পাথরের মতো নিশ্চল, অন্যান্য সকলে সময়োচিতভাব অবলম্বন করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। অদ্য বিবাহের দিন বিকাল বেলায় বরপক্ষ জানাইয়া দিয়াছে এ বিবাহে তাহাদের সম্মতি নাই, কারণ স্বরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছে বর আনিবার জন্য দক্ষিণাবাবুর হাতি পাঠাইবার কথা ছিল, তিনি হাতি পাঠান নাই। কিন্তু আসল কারণ অন্যরূপ। জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়াতে দক্ষিণাবাবুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকাল একসঙ্গে ডুবিয়াছে। এই স্থূল সত্যটিই বরপক্ষের আকস্মিক মতি পরিবর্তনের হেতু। যিনি 'আখেরে' জামাইকে দেখিতে পারিবেন না—তাঁহার কন্যাকে ঘরে লইয়া গিয়া লাভ কি? তা ছাড়া বর নিজে তৈরি ছেলে, ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে দু'চার বার বিদেশে যাইবার ফলে বিবাহ প্রথা সম্বন্ধেও সে ভিন্নমত পোষণ করিতে সুরু করিয়াছে। ফলে সপরিবারে দক্ষিণাবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথম সংবাদ শ্রবণের বজ্রচকিত অবস্থা কাটিলে সঙ্কট-উদ্ধারের সম্ভব অসম্ভব বহুপ্রকার উপায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সঙ্কট গোড়াতেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মামা বলিল—হতভাগাটাকে একবার হাতে পেলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিতাম।

দক্ষিণাবাবুর জ্ঞাতি ভাই বলিল—আরে হাতে পেলে আর মারতে যাবো কেন, কানে ধ'রে পিঁড়িতে বসিয়ে দিতাম না!

মামা কোট ছাড়িবার পাত্র নয়, অবশ্যই পিঁড়িতে বসাতাম কিন্তু তার আগে একবার ধোলাই দিয়ে নিয়ে।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন, নাও এখন চুপ করো। বাচালতা ভালো লাগছে না তারপর বলিলেন—এই কদিনের মধ্যে সাতপুরুষের জমিদারী গেল, কত সাধের মাতু মা গেল—সে সমস্তই সয়েছিলাম! এ যে অসহ্য! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

হিন্দু গৃহে যথা-নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিবাহ না হইলে সামাজিক ও মানসিক কিরূপ দুরাবস্থা যে ঘটিয়া থাকে তাহার বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক।

দক্ষিণাবাবু স্থির করিলেন আজ রাত্রেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করিবেন। তিনি ভাবিলেন ক'দিন পরে তো যেতেই হতো; কিন্তু না, এর পরে আর একটা দিন থাকাও অসম্ভব।

অবশ্য অন্য বর সংগ্রহের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল কিন্তু তাহার সুদূর মাত্র সম্ভাবনাও না থাকাতে অনেকক্ষণ সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দীপহীন বাদ্যহীন আনন্দহীন রাত্রির দণ্ডপলগুলি ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মতো সেই বিমূঢ় পরিবারটির মাথার উপর দিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।

৪

মাতঙ্গিনী দ্রুত চলিতেছে। যে-হাতি এতদিন এক পা নড়ে নাই, আজ যেন সে এতকালের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত। বর ও তাহার বন্ধুগণ হাতির চালে অনভ্যস্ত, কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তাহারা সেই ঢেউয়ের দোলা উপভোগ করিতে লাগিল।

আধঘণ্টাখানেক পরে তাহারা দেখিল যে হাতিতে ও মাহুতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়াছে। মাহুত ঘন ঘন অঙ্কুশের খোঁচা মারিতেছে আর হস্তীর অভিধানে যে-সব বোধগম্য শব্দ আছে তাহা ব্যবহার করিতেছে।

বর শুধাইল—ব্যাপার কি?

মাহুত বলিল—জানোয়ারটা বড় পাজি।

কেন, বেশ তো চলছে।

বাবু, চলছে বটে কিন্তু এ যে সুন্দরপুরের পথ ছেড়ে ভাঙাকলসীর পথ ধরলো।

সুন্দরপুর-কন্যা-পক্ষের গ্রাম।

বর এবার উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, ভাঙাকলসী আবার চল্‌ল কেন?

ঐ গ্রামে এতকাল ছিল কি না, হাতিটা ছিল ভাঙাকলসীর বাবুদের।

এখন উপায়?

ফেরাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু গাঁয়ের পথের গন্ধ পেয়ে বড় দামাল হ'য়ে উঠেছে।

মাতঙ্গিনী প্রমত্ত গতিতে ভাঙাকলসীর দিকে ছুটিল।

বরপক্ষের কেহ বলিল, লাফিয়ে পড়া যাক।

কেহ বলিল, ডাল ধ'রে ঝুলে পড়ো!

কেহ বলিল, যেমন আছ বসে থাকো, ওসব কাজের কথা নয়।

কার্যতঃ তাহাই।

মাতঙ্গিনী কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে ভাঙাকলসীর বাবুদের দেউড়িতে আসিয়া থামিল।

কে এলো, কে এলো রবে দক্ষিণাবাবুর বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিল।

সকলে বিস্মিত আনন্দে দেখিল মাতঙ্গিনী।

'পিঠে ও কারা ?' 'কোন্ গাঁয়ের বর গো ?' প্রভৃতি প্রশ্ন-বাণ ছুটিল। অবশেষে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর মামা বলিয়া উঠিল, হাতে পেয়েছি, এবারে ঘা কতক আচ্ছা ক'রে বসিয়ে দিই—সামন্তর জন্য আজ আমাদের এই হেনস্তা।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাকা বলিল, আহা-হা ঘা-কতক দিতে হয় সামন্তকে দিয়ো, আমি হাতে বর পেয়েছি, ছাড়ছি না।

তবে তুমি কি করতে চাও ?

একেবারে পিঁড়িতে নিয়ে বসাতে চাই।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যে এতখানি সম্ভাবনা নিহিত থাকিতে পারে কাহারো মনে আসে নাই। সকলে 'জয় মা আনন্দময়ী' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আনন্দময়ী দক্ষিণাবাবুদের কুলদেবী।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাকা বলিল, ঐ সঙ্গে একবার বলো 'জয় মা মাতঙ্গিনী'—ও না থাকলে বর পেতে কোথায় ?

তারপরে ভাঙাকলসীর সকলে এক প্রকার জোর করিয়াই বর ও বন্ধুদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

বর আপত্তি করিলে এক বন্ধু বলিল—তুমি তো আর 'লভে' প'ড়ে বিয়ে করছ না, এক জায়গায় না হ'য়ে অন্যত্র হ'লে ক্ষতি কি !

তাছাড়া, অন্য এক বন্ধু বলিল, এঁদের যা ভাবগতিক দেখছি এখন চুপ ক'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কাজেই বরপক্ষ বুদ্ধিমানের কাজ করিল। সত্য কথা বলিতে কি গতানুগতিক বিবাহের মধ্যে একটু এড্‌ভেঞ্চারের রস পাইয়া তাহারা কিঞ্চিৎ গর্ব্বও অনুভব করিতেছিল।

অতঃপর পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে সামন্তপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীর শুভ-বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহান্তে বিন্ধ্যবাসিনীর মাতা গলবস্ত্রে মাতঙ্গিনীর পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া এক কাঁদি কদলি নিবেদন করিলেন।

৫

পরদিন অতি প্রত্যূষে উদ্‌ভ্রান্ত সামন্ত সাহেব সদলবলে দক্ষিণাবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

সারারাত্রি বরের ব্যর্থ সন্ধান করিয়া, কন্যাপক্ষের কাছে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে কি ভাবে মাতঙ্গিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ গ্রামে আসিলেন সে বিস্তর কথা।

দক্ষিণাবাবুর তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সামন্তসাহেব প্রথমে রাগ, পরে মুখ ভার, অবশেষে পুত্রবধূ দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন, বলিলেন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে!

মেয়ে-জামাই বিদায়ের সময়ে দক্ষিণাবাবু সামন্তসাহেবকে বলিলেন, বেয়াই বিন্ধ্যবাসিনীর হাতিটা বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গেই যাক।

উদ্বিগ্ন সামন্তসাহেব বলিলেন—ঐটি মাপ করবেন, জমিদারের হাতি পুষবার ক্ষমতা আমার নাই। তারপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, অবশ্য হাতি পুষতে পারে অফিসারও আছে, বুঝলেন কি না—সব ঘুষখোরের দরবার।

যাত্রাকালে দেখা গেল মাতঙ্গিনী সর্ব্বাগ্রে গা ঝাড়া দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

দক্ষিণাবাবু বলিলেন—দেখলেন তো!

সামন্ত হতাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবে সঙ্গেই চলুক, কি আর করবো।

যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে কোথা হইতে দক্ষিণাবাবুর শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল—দেখো, আমি আগেই বলেছিলাম যে মাতু আবার ফিরে আসবে!

একশ চুয়াল্লিশ ধারা

সকাল বেলায় নিয়মিত সময়ে বাজারের থলেটি হাতে করিয়া বাজারে চলিয়াছি অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একটি ইলিশ মৎস্য ক্রয় করিতে হইবে, গৃহিণীর বিশেষ আদেশ, তাঁহার ভ্রাতৃ সমাগম হইয়াছে।

বাজারের কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম বেজায় ভিড়।

এ রকম ভিড় প্রায়ই হয়—কিন্তু আজ এমন এক প্রকার চাঞ্চল্য দেখিলাম, যেমনটি রাজনৈতিক সভা সমিতিতে দৃষ্ট হয়, বাজারে তেমন আন্দোলন দেখা যায় না। ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু যেহেতু আমি অভিমন্যু নই, ব্যর্থকাম হইলাম।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—আজ এখান থেকেই ফিরে চলুন!

—কেন?

—কেন কি দেখছেন না!

—কিন্তু ব্যাপার কি?

সেই লোকটি বলিল—কি জানি মশাই এসে অবধি দেখ্ছি।

ভিড়ের মধ্যস্থলে কি ঘটিতেছে দেখিবার উপায় নাই—তবে বিষম গণ্ডগোলে মনে হইতেছে জরুরি একটা কিছু ঘটিতেছে।

আধ ঘণ্টা পরে ঢুকিব স্থির করিয়া অদূরবর্ত্তী এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া দেখিলাম ভিড়ের সীমানা বাজারের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ঠেলাঠেলি, মারামারির চূড়ান্ত অবস্থা।

আরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম।

এবারে আসিয়া দেখি ভিড়তো কমেই নাই—তার উপরে খান কতক পুলিশের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শাদা পোষাক পরা একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার লাউড স্পীকার সহযোগে যাহা ঘোষণা করিল—শুনিয়া বুঝিলাম একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হইল।

এবারে বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু ভ্রাতৃসমাগতজনিত উল্লসিত গৃহিণীর সম্মুখে শূন্যহাতে গিয়া দাঁড়াইলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে—তাহার তুলনায় স্বাধীন দেশের পুলিশের লাঠিকেও পুষ্পাঘাত বলিয়া বোধ হইল।

—ভাবিলাম দেখাই যাক্। কি হয়।

একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হইল, তবু জনতার ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভিড় তেমনি নিশ্চল।

তখন কয়েকজন পুলিশ লাঠি দিয়া ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিতে সুরু করিল। গৃহিণীর সম্ভাবিত মুখ মণ্ডল স্মরণ করিয়া আমি তাহাদের পশ্চাতে 'সূত্রে মণি গণা ইব' চলিলাম।

পুলিশকে কেহ গ্রাহ্য করিতেছে কি! যতই ভিতরে ঢুকিতেছি কোনও মারামারি, কাটাকাটি, এসিডবাল্‌ব বা এটম বোমার চিহ্ন পাইতেছি না।

পুলিশের পিছু পিছু চলিয়া অনেকক্ষণ পরে ভিড়ের কেন্দ্র স্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

কই, তাহারা কোথায়?

কেহ কোথাও নাই।

কেবল একটি প্রকাণ্ড চুপড়িতে এক রাশ ইলিশ মৎস্য—আর চারিদিকে অসংখ্য লোক ও তাহাদের ক্রুদ্ধ গুঞ্জন।

এ অভিজ্ঞতা পুলিশের কাছেও নূতন।

উচ্চপদস্থ বিস্মিত পুলিশ অফিসারটি শুধাইল—তারা কোথায়?

লোকেরা বলিল—কারা?

—যারা মারামারি করছিল?

—মারামারি?

—তবে এত ভিড় কেন?

একজন লোক বলিল—ভিড় হবে না? ইলিশ মাছের দর যে আজ সাড়ে তিন টাকা থেকে আড়াই টাকায় নেমেছে।

কলপ

মালিক ক্ষেপিয়া খুন ?

স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া কি কাজ কর্ম করিতে হইবে না, কেবল বসিয়া বসিয়া গল্প করিলেই চলিবে! আর মুখ ব্যথা হইয়া গেলে নানারূপ দাবী জানাইয়া দরখাস্ত লিখিলেই চলিবে! তার পর মুখ ও হাত দুই-ই ব্যথা হইলে পায়ের ব্যবহার করিয়া যখন ইচ্ছা বাড়ী চলিয়া গেলেই চলিবে! তবে আফিসের কাজ চলিবে কি ভাবে!

আর দাবীর ও তো অন্ত নাই ? মৌলিক দুই দফা দাবী শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো বাড়িতে বাড়িতে এখন ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছে—একেবারে দাবীর পূর্ণচন্দ্র আর কি! তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে চাঁদে কলঙ্ক আছে—ইহাদের দাবিতে দায়িত্বের মসীচিহ্নটুকু অবধি নাই! নাঃ এমন করিয়া আর চলে না। ব্যবসা উঠাইয়া দিতে হইল দেখিতেছি।

মালিক ক্ষেপিয়া খুন।

মালিক সকলকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি ব্যবসা গুটাইবেন।

অনেক দিনের পুরাণো কর্মচারীরা ধরিয়া পড়িল, বলিল, আমাদের কিদোষ।

মালিক বলিলেন—আপনাদের একটা ব্যবস্থা করিব। সত্যই তো বৃদ্ধ বয়সে আপনারা কোথায় যাইবেন। মালিক জানাইয়া দিলেন যে বুড়োদের পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবেন।

পরদিন আফিসে পাকা চুলওয়ালা মাথার সংখ্যা বাড়িয়া গেল!

কালো চুল শাদা করিবার জন্য অনেক গুলি কলপের শিশি ব্যবহারে লাগিয়াছে।

এক বৎসর পরে!

মালিক ক্ষেপিয়া খুন। এমন করিয়া ব্যবসা চলে না। বুড়োর দল বসিয়া কেবল ঝিমায়, নস্য নেয় আর নাকে কাঠি দিয়া হাঁচে। এমন করিয়া ব্যবসা চলে না! নাঃ বুড়ো গুলাকে লইয়া আর চলিল না দেখিতেছি।

মালিক স্থির করিলেন যে বুড়াগুলাকে এবার ছাঁটিয়া দিয়া তাহাদের স্থলে যুবক লইবেন।

তিনি সকলকে ডাকিয়া আপন সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া দিলেন। পর দিন আফিসে কাঁচা চুলওয়ালা মাথার সংখ্যা বাড়িয়া গেল।

পাকা চুলকে কাঁচা করিবার জন্য অনেক গুলি কলপের শিশি ব্যবহারে লাগিয়াছে।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং

অভয় ও শমিতা বিবাহের পরেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ (Family Planning) বসিয়া গেল।

এ সব বিষয়ে নব বিবাহিতদের মধ্যে যে রহস্যময় মাধুর্য থাকে তাহার বাষ্পটুকুও তাহাদের মনে ছিল না, কারণ প্রথমতঃ তাহারা অর্থনীতি ও রাজনীতির ডবল এম-এ, তার পরে আবার Sociology বা সমাজতত্ব শাস্ত্রটাও পড়িয়া ফেলিয়াছে। তা ছাড়া দিল্লীতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে তাহারও সন্ধান লইয়া আসিয়াছে। প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত রোমান্স বিনাশের পক্ষে এগুলিই যথেষ্ট, কিন্তু না আরো আছে।

বিখ্যাত পরিসংখ্যান বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারা কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছে কাজেই চরাচর তাহাদের কাছে গণিতের খাতার মতো সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ছকে ছাঁটাই, কোথাও কিছু বাহুল্য বা বেহিসাবী থাকিবার উপায় কি ? আধুনিক প্রগতির তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইতে তাহারা প্রায় মনুসংহিতার আমল পর্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা', বিবাহ প্রজাবৃদ্ধির বিধিসঙ্গত উপায়, প্রেম, রোমান্স, হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই অলীক। তাই তাহারা বিবাহের ঠিক পরেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ বসিতে সক্ষম হইয়াছে। অভয় বলে লজ্জা ঘৃণা ভয় জ্ঞানের অন্তরায়।

শমিতা বলে সেই সঙ্গে রোমান্সটাও।

তাহারা পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উর্ধ্বতন তিন পুরুষের পুত্রকন্যার সংখ্যা উদ্ধার করিয়া, সাধারণের অজ্ঞাত কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের সুপরিজ্ঞাত নিয়মে তাহাকে যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ প্রভৃতি করিয়া তাহাদের সম্ভাবিত পুত্রকন্যার সংখ্যা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

দশ !

বিজ্ঞান আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেই ওর মধ্যে পুত্র ও কন্যার স্বতন্ত্র সংখ্যাটাও জানা সম্ভব হইবে। কিন্তু সম্প্রতি যাহা জানা গিয়াছে তাহাতেই দু'জনে হতবুদ্ধি হইয়াছে।

দশ জন ?

সর্বনাশ !

শমিতা বলিল—সেকালের কর্তাদের এ ছাড়া তো কাজ ছিল না।

অভয় বলিল—খাদ্য ও অবকাশ প্রচুর। কিন্তু বিষয়টা অন্য দৃষ্টিতে দেখো না কেন। সংখ্যাটা দশ না হ'য়ে তিন চার হ'লে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের স্থান থাকতো কোথায়? দশ বলেই তো প্রচুর সুযোগ। ওকে তিনে নামিয়ে আনতে হবে।

তাহাদের দেহমন, আর্থিক অবস্থা, ও দেশের ক্রম-বর্ধমান জন সংখ্যার চাপ যে তিনটির অধিক পুত্রকন্যার ভার বহনে অক্ষম এই অতিশয় বৈজ্ঞানিক সত্যটা বিবাহের পূর্বেই তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

তিন!

একজন পিতার স্থান লইবে, একজন মাতার স্থান আর একজন রিজার্ভ, অঙ্গহানি, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তো আছে।

সিদ্ধান্ত শুনিয়া এক বন্ধু শুধাইয়াছিল, ধরো, তিনটিই যদি কন্যা বা পুত্র হয়, তবে পিতা মাতার স্থান অধিকার কিরূপে সম্ভব!

প্রশ্ন শুনিয়া অভয় একবার মার্ক্সীয় ধরণে হাসিল, তার পরে বলিল, আজকাল স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ কোথায়? লিঙ্গভেদ একটা বুর্জোয়া সংস্কার।

বন্ধুটি মনে মনে বলিল তোমাদের দেখিয়া তাই মনে হয় বটে!

অতএব দশ তিনে নামিবে।

কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলিতে কেবল তো নিজের পুত্রকন্যার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বোঝায় না, সংসারে অপরের যে সব পুত্রকন্যা পিসিমাসি ভাই ভাইপো বা গ্রাম সম্পর্করূপে বিরাজ করে তাহাদেরও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

কিন্তু কাজটা তত সহজ নয়।

নিজের অজাত পুত্রকন্যা শাসন অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু অন্যেরা একে তো অপরের সন্তান তাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান জীব। অপরের সংসারে থাকিতে থাকিতে শাসন এড়াইবার বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। তবু চেষ্টা করিতে হইবে, বিজ্ঞানের পথ তো সুগম নয়।

অভয়ের সংসারে এমন কয়েকটি অবান্তর জীব ছিল, এ যা সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই, এবারে দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টায় সাফল্য লাভ হইবে আশায় তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাছাড়া ইহার একটা ব্যবহারিক সার্থকতাও আছে, ঝিকে মারিয়া বউকে শাসন করা হইবে।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সূত্রপাত ফ্যামিলির অবান্তর ভার অপসারণে।

যে শাস্ত্র পাঠে এই অত্যাবশ্যক জ্ঞানোদয় হয় সেই শাস্ত্রের জয় জয়কার হোক।

২

বিবাহের পরে অভয়ের চোখ অনেকগুলি অভাব লক্ষ্য করিল। টেলিফোন নাই, মোটর গাড়ী নাই, রেফ্রিজারেটার নাই, পুরাতন 'সেটি' এযুগে অচল, একটি মেহগিনির আলমারী অত্যাবশ্যক ইত্যাদি! এ সব বস্তুর অভাব আগেও ছিল কিন্তু যেহেতু পুরুষে এ সব অভাব স্ত্রীর চোখে আবিষ্কার করিয়া থাকে তাই আগে লক্ষ্য হয় নাই।

রেফ্রিজারেটারের অভাব, একটা কিনিলেই চলে, এ তো সোজা হিসাব। কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ অভ্যস্ত ব্যক্তির হিসাব অন্যরূপ। তাহারা আমদানী ও রপ্তানীতে তাল মিলাইয়া চলে।

অতএব অভয়ের সংসারে তাহার যে পিসি আজ কুড়ি বছর আছেন তিনি গ্রামে যাইবার নোটিশ পাইলেন। অভয় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইল যে সহরের চেয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ভালো, কাজেই তাঁহার গাঁয়ের বাড়ীতে যাওয়া শ্রেয়।

বিস্মিত পিসি বলিলেন, সে কি, তোদের অস্বাস্থ্যকর সহরে রেখে আমি স্বাস্থ্যকর গাঁয়ে গিয়ে কোন্ সুখে বেঁচে থাকবো?

কিন্তু পিসির অনুরাগ ও আশংকা আশানুরূপ ফল ফলাইল না।

পিসি গ্রামে গেলেন, রেফ্রিজারেটার বাড়ীতে আসিল।

ক্রমে তাহার অবিবাহিতা বোন কমুনিটি প্রোজেক্টে কাজ করিতে গেল, আসিল টেলিফোন।

'সেলফ্ হেলপ' মনুষ্যত্বের চরম প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অভয়ের ছোট ভাই চাকরির সন্ধানে উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হইল, আসিল মোটর গাড়ী।

পুরাতন চাকর অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে বিধায় বরখাস্ত হইয়া মেহগিনি আলমারির স্থান করিয়া দিল!

এইভাবে শনৈঃ শনৈঃ অভয় শমিতার সংসার প্ল্যানমাফিক গড়িয়া উঠিতে থাকিল!

বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাহাদের প্রার্থিত সন্তান সন্ততি সংখ্যা তিনে পৌছিল! আর বিস্ময়ের কথা এই যে (তাহারা বিস্মিত হয় নাই) তিনটির মধ্যে সত্যই দুইটি পুত্র, একটি কন্যা। ফ্যামিলি প্ল্যানিং পূর্ণতায় পৌছিয়াছে—

তাহারা যখন রিপোর্ট লিখিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক অভাবিত কাণ্ড (তাহাদের মতে) ঘটিল। শমিতার চতুর্থ সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল।

তার পরে যাবতীয় প্ল্যানিং বানচাল করিয়া পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে আরো ছয়টি সন্তান জন্মিয়া তাহাদের সাকুল্য সন্তান সংখ্যা দশে পৌঁছিল।

তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ কর্তৃক লব্ধ সেই দশ!

অভয় ও শমিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, ভাবিল, তবে কি গণিতে কোথাও ভুল হইয়া গিয়াছে!

কিন্তু সত্যই ভুল হয় নাই।

হিসাবের অতিরিক্ত এক একটি সন্তান আসিয়াছে আর এক একটি সাধের আসবাবপত্র বাড়ী হইতে বিদায় লইয়াছে। রেফ্রিজেরেটার, টেলিফোন, মোটর গাড়ী, মেহগিনির আলমারি, বৈদ্যুতিক চুল্লি, ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার যন্ত্র কত নাম করিব।

পিসি ভাইবোন পুরাতন চাকর প্রভৃতির শূন্যতা যে সব বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, হিসাবের অতিরিক্ত এক একটি সন্তান তাহাদের পুনরায় বাড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

হরণে পূরণে সংখ্যা সমান রহিয়া গেল।

অভয় ও শমিতা যাহাই মনে করুক, খুচরা হিসাব একটু এদিক ওদিক হইলেও গ্র্যাণ্ড টোটাল ঠিক থাকিয়া গিয়া ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীভগবানকে চাই

সর্বহারা সমিতির সম্পাদক ও জনকতক সদস্য বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে খানকতক গণ-চেয়ার, একখানা জনতা-টেবিল ছাড়া আর কিছু নাই!

কিছুক্ষণ পরে সম্পাদক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মৌন ভঙ্গ করিলেন, বলিলেন, কমরেডগণ, আজ আমরা সত্যই সর্বহারা! দেশে আজ এমন কোন সমস্যা নেই যাকে অবলম্বন ক'রে, গাছকে অবলম্বন ক'রে যেমন লতা ওঠে, আমরা উঠ্‌তে পারি। আমরা সমস্যাজীবী পার্টি, সমস্যা ছিল বলে আমরা ছিলাম, এখন সমস্যা নেই, পার্টিও তাই ভাঙোভাঙো! তাই বলছিলাম আজ আমরা সমস্যার সর্বহারা।

সদস্যদের মধ্যে একজন গণ-কবি, সে বলিয়া উঠিল—'ভাঙিলে যে তরুবর শুকায় রে লতা। হায় X, Y, Z!'

সাধারণ লোকে যখন পরিতাপবাচক 'হায় ভগবান' বলে, ইহারা বলে 'হায় X, Y, Z!'

কারণ ইহারা ভগবান মানে না, কিন্তু পরিতাপের পূর্ব সংস্কার যায় নাই, 'ভগবানের' স্থলে 'X, Y' Z' বলিয়া তিনকূল (পার্টি, পূর্ব সংস্কার মার্ক্সবাদ) রক্ষা করিয়া থাকে।

একজন সদস্য বলিল—আচ্ছা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে—

সম্পাদক বলিলেন, সবগুলো দলই ঐ প্রোগ্রাম নেবে। ভোট ভাগাভাগি হ'য়ে যাবে, আমাদের কি লাভ?

তবে খাদ্যাভাব।

আরে বাপু সত্যই তো আর খাদ্যাভাব ঘটেনি—I mean দুর্মূল্যতা।

ও নিয়ে বেশি ঘাটাঘাঁটি করা উচিত নয়। সত্যিকার চাপটা পড়বে বড় ব্যবসায়ীদের উপরে, তাদের donationটাই এখন শেষ ভরসা! সেটা বন্ধ হ'লে—

কি নিদারুণ পরিণাম ঘটিবে তাহা আর খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন হইল না। গণ-চেয়ারে অধিষ্ঠিত কমরেডগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল!

তবে শিক্ষার ত্রুটি।

সম্পাদক বলিলেন—শিক্ষার ত্রুটি আছে বলেই আমাদের পার্টি আছে। কাজেই ও নিয়ে বেশি গোলমাল করা উচিত নয়।

তবে সুয়েজ খাল।

হায় কপাল! নেহেরু কি কম ঠ্যাটা। আগে আমরা যে সব slogan এর মূলধনে আসর জমাতাম এখন নেহেরু তা ছাড়ছে। তাকে ছেড়ে আমাদের কথা কে শুনবে।

এমন কি পিতৃভূমির গুরুভ্রাতাগণ পর্যন্ত—

সাবধান কমরেড ধাপাদার, পিতৃভূমির সমালোচনা চলবে না।

তবে এখন উপায়?

নিরুপায়। তাই তো বলছি আজ আমরা সর্ব সমস্যাহারা অর্থে সর্বহারা!

তখন সকলে একযোগে সম্পাদক ও সদস্য মিলিত গণ-দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল 'হায় X, Y, Z!'

২

এমন সময়ে দীনবেশ একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল।

সম্পাদক শুধাইলেন—কাকে চাই?

আজ্ঞে আপনাদের চাই।

আজ্ঞে আমার একটা সমস্যা—

সমস্যা শুনিবা মাত্র সকলের মুখ আশায় উজ্জল হইয়া উঠিল।

সম্পাদক বলিলেন—আচ্ছা সমস্যা পরে শুনবো আগে নামধাম প্রভৃতি শুনি।

আমার নাম ভগবান।

ও: ভগবান প্রসাদ চনচনিয়া? সেই সুপুরির মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের বাবদ টাকাটা দিতে এসেছ বুঝি। তা দিয়ে যাও, হাজার টাকার কম হবে না।

আজ্ঞে ওসব কি বলছেন?

তবে কোন্ ভগবান খুলে বলো না।

আমি শ্রীভগবান, আদি, অকৃত্রিম ও একমাত্র, ইংরাজিতে যাকে God, সংস্কৃতে পরব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি বলা হয়।

একজন সদস্য কিঞ্চিৎ উষ্মা সহকারে বলিল—মস্করা করবার ঠাঁই পাও নি বুঝি।

আজ্ঞে তবে উঠি, শুনেছিলাম আপনাদের কাছে এলে সকলের সব সমস্যার

একটা হিল্লে হ'য়ে যায় তাই এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা দেখছি—এই বলিয়া লোকটি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

সম্পাদক তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, বলিল, বসুন, এত অল্পে রাগ করা উচিত নয়।

তারপরে বলিল—আচ্ছা, আপনাকে সেই পরব্রহ্ম বা God বলেই না হয় স্বীকার করে নিলাম কিন্তু আপনার—

বাধা দিয়া একজন সদস্য বলিল—স্বীকার করবেন কি ক'রে? আমরা তো ভগবান মানিনে।

বিরক্ত সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন—চালাকি রাখোতো বাপু। এদিকে সমস্যার অভাবে পার্টি উঠে যায় এমন সময় উনি এলেন বাজে Ideology-র কচ্‌কচি নিয়ে।

কিন্তু মার্ক্সবাদে যে—

এতদিন পরে এসেছ আমার কাছে মার্ক্সবাদ ব্যাখ্যা করতে। ও সব বকুনি আমি আমিও ঢের জানি, আমিও ঢের শুনিয়ে থাকি, ওসব বুর্জোয়াদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে আমরাই তো পাক করে থাকি। তা দিয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হলেই সর্বনাশ! তা ছাড়া মার্ক্সবাদ আজ কে মানছে শুনি? রাশিয়া মানে? তার চেয়ে দেখা যাক এর সমস্যাটি কি? সত্যি কিছু থাকলে এবারের মতো বেঁচে যাওয়া যাবে। আরে বাপু পার্টি উঠে গেলে খাবে কি! সামান্য Ideology-র জন্যে তো আর অনাহারে মরা যেতে পারে না। সাধে কি বুর্জোয়ারা আমাদের Fanatic বলে, সাধে কি নেহেরু আমাদের Counter Revolutionary বলে।

তারপর সম্পাদক আগন্তুকের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন—নিন, স্যার, আপনার সমস্যা কি তাই বলুন। ওসব চ্যাঙড়ার কথায় কিছু মনে করবেন না।

শ্রীভগবান আরম্ভ করিলেন—এক সময় আমার প্রবল প্রতাপ ছিল, লোকে মানিত, ভক্তি করিত, যথারীতি পূজার্চনা করিত, আমার নাম স্মরণ না করিয়া কোন শুভকার্য আরম্ভ করিত না। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, দিনে দিনে পূজা অর্চনা লোপ পাইতেছে, ভক্তি দূরের কথা, একবার নামটাও করে না। আবার শুনিতে পাই যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তানকেই লোকে আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেছে। এবারে আপনারা আমার অবস্থাটা

ভাবিয়া দেখুন। এইভাবে বেশিদিন চলিলে আমি যে শেষ পর্যন্ত সর্বহারা হইয়া পড়িব।

'সর্বহারা' শব্দটি শুনিবামাত্র সদস্যগণ নড়িয়া চড়িয়া বসিল, একজন বলিল —আমরাও তো সর্বহারা।

শ্রীভগবান বলিল—সর্বহারাগিরি আপনাদের পলিসি, ঐ পথেই আপনারা সার্থকতা লাভ করেছেন। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো।

সম্পাদক শুধাইলেন—এখন আমাদের কি করতে বলেন।

তোমরা তো বাপু যেখানে যত সমস্যা আছে তার জেনারেল এজেন্সি নিয়ে বসে আছ। তবে আমার উপর অকরুণ কেন?

একজন সদস্য শুধাইল—তোমার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করলে আমাদের ভোট পাওয়ার কিছু সুবিধে হবে কি?

হবে বলেই তো মনে হয়। এ ধর্মের দেশ, সবাই ধর্মপ্রাণ, বিশেষ প্রজা-সাধারণ যাদের তোমরা 'পীপল' বলো, মনে প্রাণে তারা আমাকে ভক্তি করে। কাজেই তোমরা এখন আমার পক্ষ নিলে তারা অবশ্যই তোমাদের ভোট দেবে।

সম্পাদক বলিলেন, তবে আর কথা নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এখন স্বস্থানে যান, আগামী কল্য প্রভাত থেকেই আমরা আপনার পক্ষ অবলম্বন ক'রে আওয়াজ তুলবো।

তখন শ্রীভগবান তাহাদের যথাশাস্ত্র আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩

পরদিন প্রভাতে সহরের লোকে সর্বহারা দলের শোভাযাত্রা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের কারণ শোভাযাত্রা নহে, যেহেতু উক্ত বস্তু নিত্যকার ব্যাপার, বিস্ময়ের আসল হেতু সর্বহারাগণের সাজ পোষাক ও আওয়াজ।

সম্মুখে একদল লোক খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছে, পতাকা-বাহীদের হাতে 'শ্রীভগবানকে চাই', 'শ্রীভগবানকে ফাঁকি দেওয়া চলবেনা', 'ভক্তি চাই, পূজা চাই' প্রভৃতি বাণী অঙ্কিত পতাকা। আবার একদল লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, তারা ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির পট লইয়া চলিয়াছে। তা ছাড়া সর্বাহারাদের সাজপোষাকও আজ অন্য রকম। ক্ষৌমবস্ত্র ও চাদর তাহাদের অঙ্গে, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ফোঁটা তিলক, সর্বাঙ্গে চন্দন পঙ্কে মুদ্রিত দেব দেবীর নাম, শিখায় (রাতারাতি উক্ত

বস্ত গজায় না, তাই চুল দাড়ির দোকান হইতে আমদানী) জবা ফুল ও নির্মাল্য বাঁধা। আর মুখে—সম্পাদক হাঁকিতেছেন—'শ্রীভগবানের দাবী'—

বাকি সকলে আওয়াজ তুলিতেছে—'মানতে হবে।'

সত্য কথা বলিতে কি এমন জোরদার শোভাযাত্রা স্বয়ং শ্রীভগবানেরও আশার অতীত। দর্শকগণ বলাবলি করিতে লাগিল—

একি হ'ল ভাই, ওদের তো এমন মতিগতি ছিল না।

অপরে বলিল—

আমরা তো চিরকাল জানতাম ওরা নাস্তিক।

আর একজন বলিল—

হয়তো এটাই ওদের নূতন Thesis.

অন্য একজন বলিল—

এটা আর বুঝতে পারলে না, সামনে ইলেকশন, ভারত সরকার ধর্ম-নিরপেক্ষ তাই তার বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে ওরা ভগবানের পক্ষ নিয়েছে।

ভগবান কি এতে খুশী হবেন ?

কি করে বলবো ভাই, ভগবান ও সর্বহারা দলটি দুয়েরই মতিগতি বিচিত্র।

'শ্রীভগবানের দাবী'—

'মানতে হবে, মানতে হবে।'

'শ্রীভগবানকে'—

'ভুলো মৎ, ভুলো মৎ।'

'পূজা আর্চা করতে হবে

ভগবানের তরে মরতে হবে,'

'জান কবুল, জান কবুল।'

সকলে অবাক্ হইয়া যায়। দর্শকদের একজন বিস্ময়ে এত বড় হাঁ করিল যে আর মুখ বন্ধ হয় না, তখন ডাক্তার ডাকিয়া হাতুড়ি ঠুকিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইল।

স্লোগানের আওয়াজ ও খোল করতালের আওয়াজে সহর মুখর হইয়া উঠিল।

শোভাযাত্রা চলিতেই থাকিল, সহরের বিস্ময় বাড়িতেই লাগিল, আর শ্রীভগবান খুশী হইলেন কিনা এখনো বুঝিবার সময় হয় নাই—আগামী নির্বাচনে বুঝিতে পারা যাইবে!

মরুভূমির প্রতিহিংসা

আমি দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি।

যতদূরে চাহিয়া দেখো—ধূ ধূ বালুরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না, মরীচিকা-মেখলার অনন্ত প্রসার আমাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে না, আমি এতই বিরাট। আমাকে অতিক্রম করিবার প্রয়াসে সংখ্যাহীন পথিকের শোভাযাত্রা কঙ্কালের শব যাত্রায় পরিণত হইয়াছে, তাহাদের কঙ্কালের রিক্ত শুভ্রতা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। সে বিরস ছায়াপথ অনুসরণ করিয়া যাও, যতদূর চলিবে—কোথাও তাহার অন্ত পাইবে না।

আমার বিস্তৃত বক্ষে পাগল হাওয়া বালুকারাশির কুজ্ঝটিকা তুলিয়া ধাবিত হয়, সে যেন প্রেতের শোভাযাত্রা! কোথাও একটুখানি ছায়ার প্রলেপমাত্র নাই। কোমল, শ্যামল, সরস আমার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। ধূর্জ্জটির শুষ্ক তপস্যার আসনের মতো আমি নীরব এবং রহস্যময় এবং মানব সম্পর্ক-ছিন্ন এবং স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়ার অধিকারের বহির্ভূত।

স্বয়ং বিধাতাও আমাকে বোধকরি ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে আমি সরস ছিলাম, সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা ছিলাম। আমার কোলে নদী বহিত, আমার ছায়াতরুতে পাখীর গান উঠিত, আমার পল্লীতে সুখ দুঃখময় মানব জীবন প্রবাহ বহিত, আমার শোভা-সৌন্দর্যে দৃষ্টি অতলে ডুবিয়া যাইত।

সেদিন আমি মাতৃভূমি ছিলাম, আজ আমি মরুভূমি!

আমার এ দশা কিরূপে হইল জান? কে আমার এ দশা করিল জান?

জান না—তোমরাই আমার এ দশা করিয়াছ! মানুষের অভিশাপে আজ আমি মরুভূমি!

সেই বিবরণ আজ তোমাদের শুনাইব।

একদিন মানুষ খন্তা কুড়ুল হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা যদি আমার বক্ষে বাস করিতে আসিত আপত্তি ছিল না, সুখে দুঃখে সকলে মিলিয়া থাকিতাম। তাহারা আসিল আমার সর্বনাশ করিবার আশায়। তাহারা গাছ-পালা কাটিতে লাগিল, খড়-কুটা ছাঁটিতে লাগিল, যেখানে যে রকম উদ্ভিদ দেখিল সব উপড়াইয়া লইল।

কেন জান ?

এই সব উপাদান দ্বারা মানুষে কাগজ প্রস্তুত করিবে। কাগজ প্রস্তুত করায় কাহার কি লাভ জানি না। কাগজ এমন একটা বস্তু, কাহারো ভোগে লাগে না, কেবল আমার দুর্ভোগ বাড়ায়। মানুষে বলিবে—কেন কাগজে পুস্তক তৈয়ারী হয়, পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় জ্ঞানের কথা, জ্ঞানে মানুষের শক্তি বাড়ে, মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায়।

এ সব তো কল্পনা!

মানুষের কাগজ প্রস্তুতির বাস্তবরূপ কী ভয়ানক! গাছপালা নষ্ট হইবার ফলে বৃষ্টিপাত কমিয়া আসিল, বৃষ্টিপাত কমিবার ফলে আমার বক্ষ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল—আমি ভাবি মরুভূমির দূরবর্তী পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

শ্যামল পাহাড়ের অরণ্য কাটিয়া ফেলিতে রাশি রাশি বালু গড়াইয়া আসিয়া নদীর খাত বুঁজাইয়া দিল। নদীর খাত বঁজিবার ফলে পাহাড় ধুইয়া বর্ষার স্রোত নামিয়া কালে কালে পাহাড় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল! যেখানে ছিল শ্যামলতা, সেখানে শুষ্কতার প্রমথকুল উষর নৃত্য শুরু করিল।

আমি মরুভূমি হইলাম।

তোমরা ভাবিওনা যে আমাকে মরুতে পরিণত করিয়া তোমরাই সুখে আছ—মোটেই নয়। তোমরা কাগজের চাপে, বইয়ের অত্যাচারে মরিতে বসিয়াছ। মানব সংসারে যত মানুষ, তার চেয়ে বই অধিক! মোটা বই, ছোট বই, চৌকা বই, লম্বা বই, কত আকারের বই, রাশি রাশি, ভারে ভারে, ঘরে ঘরে, কোথায় বই নাই!

তার উপরে আছে সংবাদপত্র! দেয়ালে দেয়ালে কাগজ আঁটা, গাড়ীতে কাগজ আঁটা, সংসারে এমন স্থান নাই যেখানে কাগজ নাই, এমন কাগজ নাই যাহাতে কিছু লিখিত নাই! তোমাকে পড়িতেই হইবে, না পড়িয়া তোমার উপায় নাই! ঐ পড়ার চাপে তোমার মন যে শুকাইয়া উঠিতেছে তাহা কি জানিতে পাও! কাগজের চাপে তোমার মগজ বিকৃত না হইয়া গেলে বুঝিতে যে তোমার মনের মধ্যে মরুসাধনের পালা চলিতেছে।

মানুষ আজ মরু মানুষ, মানে মরা মানুষ। তাহার চিত্ত-মরুর তুলনায় সাহারা, গোবি অতিশয় তুচ্ছ, অতিশয় অকিঞ্চিৎকর!

এমন এক সময় আসিবে যখন মানুষের মন আমার এই বুকের চেয়েও অধিকতর নীরস অধিকতর নির্জীব হইয়া পড়িবে!

সেই দিন—হাঁ, সেইদিন আমার প্রতিশোধ গ্রহণের সার্থকতা! আমাকে যে মরুভূমি করিল—সেওতো মরুভূমি হইল!

মরুভূমির প্রতিহিংসা মরুভূমি!

আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি। যখন মরুভূমির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া মানুষের মন আমার বুকের মতো নিরর্থক হইবে—সেদিন দু'জনে জোড়ে জোড় মিলাইয়া মৃত্যুর ডাকিনী যোগিনীর মতো সংসারক্ষেত্রে নৃত্য সুরু করিব!

সেদিন আসন্ন—আমি সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি, তোমাদের ভাবগতিক দেখিয়া আশা হয়—সেদিন আর বেশী দূরবর্তী নয়!

আসুক সেই দিন!

নূতন তীর্থ

প্রাচীনকালে তক্ষশীলার কাছে গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাহাকে ছোট-খাটো একজন ভূম্যধিকারীও বলা চলিত। স্নানে ধ্যানে ক্রিয়াকর্মে তাহার সুনামের অন্ত ছিল না!

পরিণত বয়সে ব্রাহ্মণ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়িল। পাকস্থলীতে অসহ্য যন্ত্রণা এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ।

প্রথমে গ্রামের চিকিৎসক চিকিৎসা করিল; কিন্তু ফলোদয় না হওয়ায় সে তক্ষশীলা নগরে গমন করিল এবং প্রবীণ বৈদ্যগণের চিকিৎসাধীন হইল— কিন্তু তাহাতেও সুফল হইল না।

দুই-চার দিন সুস্থ থাকিবার পরে আবার ব্যাধি উৎকটতররূপে দেখা দেয়। ক্রমে তাহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল এবং জীবনের আশা চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ভাবিল আর এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই, মরিতেই যদি হয় গ্রামে ফিরিয়া গিয়া মরাই শ্রেয়।

যখন সে গ্রামে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে, নগরের এক প্রাচীন ব্যক্তি বলিল, মহাশয়, রোগ ও রোগমুক্তি দুই-ই দৈবাধীন, মানুষে আর কতটুকু করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ বলিল, আপনার কথা সত্য কিন্তু দৈবকৃপা লাভের উপায় কি?

তখন সেই ব্যক্তি বলিল, নিকবর্তী পর্ব্বতের গুহায় মহাকাল শিবলিঙ্গ আছেন, সেখানে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকুন, বাবার দয়া হইলে আরোগ্য হইতে পারে।

কথাটা ব্রাহ্মণের মনে লাগিল। লোকটিকে ধন্যবাদ জানাইয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট পর্বতগুহার দিকে প্রস্থান করিল।

সেখানে ঝরণার জলে স্নান করিয়া, মহাকালের পূজা সারিয়া, পবিত্রভাবে রোগমুক্তির আশায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল।

২

সাতদিন, সাত রাত পরে মহাকাল স্বপ্নাদেশ করিলেন—ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণ করো তোমার ব্যাধি নিরাময় হইবে।

স্বপ্নাদেশ শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের তন্দ্রা দূর হইয়া গেল।

সে উঠিয়া যথাশাস্ত্র দেবপূজা করিয়া মহাকালকে প্রণামান্তে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

প্রায় বৎসরকাল দেশে দেশে ঘুরিয়া পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করিল, কিন্তু পীড়ার সাকুল্য আরোগ্য হইল না।

তখন সে মহাকাল মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় হত্যা দিল। সাত দিন, সাত রাত পরে আবার স্বপ্নে শুনিতে পাইল,—ব্রাহ্মণ এখনও সকল তীর্থ দর্শন সমাপ্ত হয় নাই—পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হও।

ব্রাহ্মণ পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইল।

৪

আবার বৎসরকাল তাহার তীর্থপর্যটনের পালা।

এবারে ব্যাধি আর একটু কমিল কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হইল না।

তখন সে পুনরায় মহাকালমন্দিরে আসিয়া হত্যা দিল, বলিল, বাবা আমার তীর্থ দর্শন কি এখনও শেষ হয় নাই? দেশে এমন তীর্থ নাই যেখানে যাই নাই যেখানে গিয়া পূজা দানধ্যান করি নাই, তবে আমার প্রতি অকৃপা কেন? আমার ব্যাধি সারিয়াও সারিতেছে না কেন? এখনও কি কোন তীর্থ আছে যাহা দর্শন করিতে ভুলিয়া গিয়াছি?

তখন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে শুনিতে পাইল মহাকাল বলিতেছেন,—বৎস, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, এখনও কিছু কিছু তীর্থ অদৃষ্ট রহিয়া গিয়াছে তাই ব্যাধির মূল যাইতেছে না।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নে শুধাইল,—বাবা, দয়া করিয়া নির্দেশ দিন কোথায় সেই সব তীর্থ, কোন দেবতার সেখানে বাস?

ব্রাহ্মণ স্বপ্নে শুনিল, দেশে যে সব মানব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান আছে এবং নিত্য নূতন গড়িয়া উঠিতেছে সেগুলি দেখিয়াছ কি?

মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বুঝিব বাবা?

আরোগ্যশালা, বিদ্যামন্দির, কলাকেন্দ্র, শিল্পনিকেতন, জলাশয়, পারথা, সেতু, আতুরশালা, শরণার্থীনিবাস প্রভৃতি মানব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান।

বাবা এগুলি কি তীর্থস্থান?

কেন তীর্থস্থান নয়?

এসব স্থানে কোন্ দেবতার বাস?

মন্দিরে যে দেবতা থাকেন তিনিই থাকেন এই সব প্রতিষ্ঠানে।

দেবতা থাকেন এই সব স্থানে! বুঝিতে পারিতেছি না বাবা, দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।

নির্বোধ ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে দেবতা আপনার জন্য নব নব বাসস্থান গড়িয়া লন, এক আবাসে তিনি দীর্ঘকাল থাকেন না।

কেন?

কেন কি!

মানুষের শক্তি ও কল্যাণপ্রবৃত্তিকে নব নব পথে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্যই তীর্থের প্রতিষ্ঠা। নতুবা দেবতার আবার গৃহের প্রয়োজন কি?

সে কি মন্দির গড়িয়া হয় না?

মন্দির আকর্ষণ করে মনের ভক্তিকে। কিন্তু মন তো কেবল ভক্তিসর্বস্ব নয়, জ্ঞান আছে কর্মপ্রবণতা আছে—তাহার সার্থকতা কোথায়?

তাহার সার্থকতা কি আরোগ্যশালায়, সেতুপথে, বন্যানিরোধক পরিখা-সমূহে?

নিশ্চয়, মানুষের কর্মপ্রেরণার ঐগুলি সাক্ষী।

আর বিদ্যালয়, শিল্পমন্দির প্রভৃতিতে?

ঐগুলি মানুষের জ্ঞানের তীর্থ।

বাবা অবোধ আমি, আমার কাছে এ তত্ত্ব নূতন।

তজ্জন্য আক্ষেপ করিওনা, নূতন যুগের নূতন দাবি। যুগদেবতা আর পুরাতন পাথরের মন্দিরে সন্তুষ্ট নন, তিনি নূতন নিকেতন সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, যেখানে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে সেখানে তিনি আসন পাতিতেছেন। ঐ দর্শনটুকুর অভাবেই তোমার ব্যাধির ক্লেশ যাইতেছে না। এবারে তুমি এই যুগতীর্থগুলি দর্শন করো—ব্যাধির মূল উৎপাটিত হইবে।

নিদ্রা ভাঙিয়া উঠিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল একি আশ্চর্য আদেশ পাইলাম! একি কেবলই স্বপ্ন না ততোধিক কিছু?

পরে স্থির করিল দেবতা স্বপ্নে কথা কহিয়াছেন, আগের আগের আদেশের মত এই বাক্যও তাঁহার স্বপ্নাদেশ।

তখন সে দেশের নূতন তীর্থ দর্শনে বাহির হইল।

বৎসরকাল নূতন তীর্থ দর্শনে সে অতিবাহিত করিল।

বৎসরান্তে মহাকাল মন্দিরে আসিয়া যখন সে প্রণত: হইল তখন ব্যাধির আর লেশমাত্র নাই তাহার দেহে।

অতঃপর সে গ্রামে ফিরিয়া আরোগ্যলাভের রহস্য জানাইলে সকলে বলিল, এবারে বাবার জন্য একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দাও।

ব্রাহ্মণের আদেশে মন্দির নির্মাণ শেষ হইল।

সকলে বিস্ময়ে শুধাইল এ কেমন মন্দির? আর বিগ্রহই বা কোথায়?

ব্রাহ্মণ বলিল, এ নূতন শিল্পরীতির মন্দির। আর দেবতা? কাল সকালে দেখিতে পাইবে।

পরদিন সকালে কৌতূহলী জনতা আসিয়া দেখিল সেই নূতন মন্দিরে কতক-গুলি অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ ও নিঃস্ব ব্যক্তি উপবিষ্ট।

ইহারা এখানে কেন?

ইহাদের জন্যই তো মন্দিরের নির্মাণ।

দেবতা?

দেবতা এ যুগে নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছেন—ইহারাই দেবতা।

দেবতা নানাদেশ ঘুরিয়া নাস্তিক হইয়া গিয়াছে ভাবিতে ভাবিতে সকলে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণের আদেশে অট্টালিকাশীর্ষে খোদিত হইল—শরণার্থী মন্দির।

সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ

পুরাকালে রাসভপত্তন নামে এক দেশ ছিল।

সে দেশের অধিবাসিগণ রাসভ। তাহারা পরম সুখে সেদেশে কালাতিপাত করিত।

দেশে অপর্যাপ্ত উদ্ভিদ, নদীতে নির্মল জল, আকাশে বায়ু, বৃক্ষতলে আশ্রয়, কাজেই গাধাগুলির কিছুরই অভাব ছিল না।

তাহারা মনের আনন্দে মাঠে চরিয়া বেড়াইত, সকলে সমবেত হইয়া গান করিত এবং জ্যোৎস্না উঠিলে নদীর তীরে সকলে মিলিয়া নাচিত। গাধাগুলি স্বভাবে শান্তশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে আবার যেগুলি একান্ত নিরীহ, যাহাদের আহার্য অপরে কাড়িয়া খায়, যাহাদের আশ্রয়স্থল অপরে আসিয়া জবর-দখল করে, সাত চড়ে যাহাদের মুখ হইতে রব বাহির হয় না, তাহাদের সবাই ভালো মানুষ বলিত।

তবে সৌভাগ্যের বিষয় এহেন ভালো মানুষের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

আর যে-সব গর্দভ ফাঁকি দিয়া অন্যের আহার্য ও আশ্রয় কাড়িয়া লইত, অপরের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করিত, তাহাদের সকলে বলিত 'ক্লেবর'।

ক্লেবর গর্দভদের সকলে সম্মান ও সমীহ করিত।

আর ক্লেবর ও ভালো মানুষ নির্বিশেষে সকলেরই ধারণা ছিল, সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার।

ক্ষীণকণ্ঠ নামে গর্দভটিকে রাসভ-পত্তনের অতএব সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া সবাই মনে করিত।

এইভাবে যখন পরম সম্প্রীতিতে তাহাদের দিন যাইতেছে, এমন সময়ে একটি খচ্চর রাসভ-পত্তনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গর্দভগণ অতিশয় অতিথিবৎসল, তাহারা খচ্চরটিকে পরম আদরে গ্রহণ করিল। খচ্চরটিও গর্দভদের আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অত্যল্পকালের মধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন ক্ষীণকণ্ঠ খচ্চরকে বলিল—আমাদের দেশ কেমন লাগিতেছে?

খচ্চরটি বলিল—চমৎকার। তোমাদের দেশের তুলনায় আমাদের খচ্চর দ্বীপ মরুভূমি সদৃশ। কেবল একটি বিষয়ে তোমাদের ন্যূনতা লক্ষ্য করিতেছি।

ক্ষীণকণ্ঠ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—আমাদের কি ত্রুটি তুমি লক্ষ্য করিলে?

খচ্চরটি বলিল—তোমরা সবাই একত্র বাস করো কেন? আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, তোমরা সকলে তো এক জাতির গর্দভ নহো।

ক্ষীণকণ্ঠ বলিল—একথা কখনো আমাদের মনেই হয় নাই। আমরা এক আদিম গর্দভ দম্পতির সন্তান, এক দেশে বাস, এক মাঠের উদ্ভিদ, এক নদীর জল, এক আকাশের বায়ুতে আমাদের জীবন; আমরা ভিন্ন জাতির হইতে যাইব কেন?

খচ্চরটি বলিল—ওই জন্যই তো তোমরা গর্দভ! আমাদের খচ্চর দ্বীপে, খচ্চর, অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি কত জাতি আছে। অশ্বের মধ্যে আবার কত জাতি। আরবী, ফারসী, মণিপুরী, সিকিমি! এক জাতি হইয়া একত্র বাস করা সভ্যতার লক্ষণ নহে! তোমাদের দেশে যে আশানুরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না, তাহার কারণ তোমাদের একজাত্য!

ক্ষীণকণ্ঠ শুধাইল—কিন্তু দুই জাতিতে বিভক্ত হইবার উপায় কি? আমরা তো কিছুই জানি না, আমরা যে নিতান্ত গর্দভ!

খচ্চর বলিল—তবে শোন—

"দুই জাতি দুই জাতি বলিতে বলিতে শুধু লবঙ্গ দেশের লোক হইল দু'জাতি ক্রমে।"

ক্ষীণকণ্ঠ শুধাইল—সে কিরূপ?"

খচ্চর বলিতে আরম্ভ করিল—লবঙ্গ দেশ নামে একটি দেশ আছে। সেখানে লবঙ্গী নামে এক জাতি বাস করিত। তাহারা তোমাদের মতোই মনের সুখে ছিল, কিন্তু তাহাদের না ছিল সভ্যতা, না ছিল কালচার, না ছিল উন্নতির প্রবৃত্তি। কালক্রমে সেখানে মহাশ্বেত নামে এক বানর আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাশ্বেত তাহাদের বুঝাইল যে তাহারা ভিন্ন জাতীয় লোক। বারংবার এই কথা শুনিতে শুনিতে লবঙ্গীদের বিশ্বাস হইয়া গেল যে তাহারা সকলে এক জাতির অন্তর্গত নয়। তাহারা মহাশ্বেতকে শুধাইল পৃথক জাতি হইবার উপায় কি? আমরা তো কোন উপায় দেখি না, চিহ্ন দেখি না—এমন কি প্রয়োজনও দেখি না।

মহাশ্বেত বলিল—প্রয়োজন যথা সময়ে দেখিবে, তবে উপায়টি আমি বলিয়া দিতে পারি। সে বলিতে লাগিল—তোমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সকালে সন্ধ্যায় যখন তখন যত্রতত্র 'আমরা দুই জাতীয়.আমরা দুই জাতীয়' আবৃত্তি করিতে থাকো—তবেই কালক্রমে তোমরা দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে।

মহাশ্বেতের উপদেশ অনুসারে লবঙ্গীগণ "আমরা দুই জাতি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং কি আশ্চর্য! চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল! অতএব, হে ক্ষীণকণ্ঠ, দেখো দুই জাতিতে পরিণত হইবার মতো সহজ আর কিছুই নহে। কেবল অন্তরে দ্বৈজাত্য নীতির উপরে গভীর বিশ্বাস থাকা দরকার আর কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড শক্তি থাকা আবশ্যক! তোমাদের তো তাহা আছে, তোমরা যে গর্দভ! আর তোমরা গর্দভ বলিয়াই চীৎকারের প্রবলতার অনুপাতে মনের বিশ্বাসও ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিবে।

ক্ষীণকণ্ঠ খচ্চরের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইল!

তখন ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষুদ্রপুচ্ছ নামক রাসভকে একান্তে ডাকিয়া খচ্চরের উপদেশ জানাইল।

ক্ষুদ্রপুচ্ছ একটি ক্লেবর গর্দভ। সে বলিল, ভাই খচ্চরের কথাগুলির মধ্যে সত্য ও অর্থ দুই-ই আছে। সংসারে সত্য ও অর্থযুক্ত বাক্য একান্ত দুর্লভ। আর মনের কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে স্বীকার করিব যে এক জাতি হইয়া থাকিয়া কোন সুখ নাই। অপরের কথা ছাড়িয়া দিই—যখন দেশী গরু ও বিলাতী গরুর আকৃতিতে ও মর্যাদায় প্রভেদ দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই দেশী কুকুরকে অবজ্ঞা করিয়া জীব শ্রেষ্ঠ মানুষগণ বিলাতী কুকুরের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া গৌরব বোধ করিতেছে, তখন গর্দভ জন্মের জন্য ধিক্কার অনুভব করি। তখন মনে হয়, লোকে আমাদের গাধা বলে—কই কেহ তো কখনো বিলাতী গাধা বলে না!

ক্ষুদ্রপুচ্ছ বলিল—চলো, অবিলম্বে খচ্চরের কাছে গিয়া দ্বৈজাত্য গ্রহণের পরামর্শ করিয়া আসি।

খচ্চর তাহাদের যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—যে-সমাজে তোমাদের মতো ক্লেবর জীব আছে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ক্ষুদ্রপুচ্ছ বলিল—দুই জাতিতে পরিণত হইতে গেলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ দুটি নামের আবশ্যক। আমরা তাহাই বা কোথায় পাইব?

খচ্চরটি নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিতে মানুষকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সে বলিল—কেন? নামের অভাব কি? রাসভ ও গর্দভ দুইটি ভিন্ন শব্দ। তোমরা একদল রাসভ নাম, অপর দল গর্দভ নাম গ্রহণ কর না কেন?

খচ্চরের বুদ্ধিতে গর্দভ দুইটি বিস্মিত হইল!

তাহাদের ভাব দেখিয়া সে বলিল—ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আমি যে খচ্চর আর তোমরা যে গর্দভ, আমাদের সমন্বয়েই পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লব ঘটিয়াছে।

এমন সময়ে ক্ষীণকণ্ঠ বলিল—কিন্তু একটি বিষয়ে মনে একটু ধোঁকা লাগিতেছে, রাসভ ও গর্দভ দুই ভিন্ন নাম গ্রহণ করিবার ফলে পৃথক জাতিতে পরিণত হইলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মৌলিক গর্দভত্ব লোপ পাইবে না তো?

তাহার কথা শুনিয়া খচ্চর হাসিতে হাসিতে বলিল—ভ্রাতঃ, গর্দভকে যে নামেই ডাকো না কেন—চিরকাল সে গাধাই থাকে। গাধাকে রাজপুত্র বলিলেও সে গাধা, বিপ্লবী বলিলেও সে গাধা, বামপন্থী, প্রেসিডেন্ট, মোহান্ত মহারাজ, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক প্রভৃতি যাহাই বলিয়া ডাকো না কেন—সে গাধা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাহার আশ্বাসে রাসভদ্বয় বিশেষ আনন্দিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং রাসভ সম্প্রদায়কে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া দুইজনে দুই অংশের নেতা হইয়া বসিল।

তারপরে একদিন শুভক্ষণ দেখিয়া তাহারা তারস্বরে "আমরা রাসভ" এবং "আমরা গর্দভ" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

ক্ষীণকণ্ঠ রাসভগণের ও ক্ষুদ্রপুচ্ছ গর্দভগণের দলপতি।

তাহাদের তারস্বরে ঘোষিত দ্বৈজাত্যবাদের ফলে চতুর্দিকে নানা শ্রেণীর জন্তু জানোয়ার জুটিতে লাগিল, গোরু, ভেড়া, বানর, শৃগাল কুকুর কত কি!

তাহারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বলাবলি করিতে লাগিল যে, সত্যই ইহারা ভিন্ন জাতীয়! দেখো না একদলের লেজ অন্য দলের লেজের চেয়ে অনেকটা ছোট!

আর একজন বলিল—রাসভগুলোর কান গর্দভগুলোর চেয়ে অনেকটা লম্বা।

অপর একজন বলিল—দুইদলের রঙে অনেক প্রভেদ।

চতুর্থ জন বলিল—কেন গলার স্বরেও তফাৎ আছে।

তখন সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে ইহারা দুইজাতীয় জীব।

তাহাদের সিদ্ধান্ত শুনিবামাত্র দুইদল গাধাই আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষীণকণ্ঠ বলিল—আমরা গর্দভই হই আর রাসভই হই মূলে আমরা গাধা।

সমবেত প্রাণীদের একজন বলিল—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি!

তখন ক্ষীণকণ্ঠ ও ক্ষুদ্রপুচ্ছ অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা দ্বৈজাত্য স্বীকৃত হইবার সংবাদ খচ্চরকে গিয়া নিবেদন করিল।

শুধাইল—এখন আমরা কি করিব?

খচ্চর কিছুক্ষণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া বলিল—এবার দুই জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিতে হইবে।

তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল—তবে দুই জাতি হইতে গেলাম কেন?

খচ্চর বলিল—দুই জাতি না হইলে এক জাতি হইবে কেমন করিয়া?

গর্দভদ্বয় তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া রহিল।

খচ্চর হাসিয়া বলিল—সাধে কি তোমরা গর্দভ!

ক্ষীণকণ্ঠ বলিল—আমি গর্দভ নই; রাসভ।

খচ্চর বলিল—এখন তোমাদের একজাতিতে পরিণত হইবার একমাত্র উপায় পরস্পরকে হত্যা করিয়া নিঃশেষ করা। হত্যার প্রতিযোগিতায় একটি-মাত্র জাতি শেষ পর্যন্ত টিকিবে।

গর্দভদ্বয় হতবুদ্ধি হইয়া শুধাইল—পরস্পরকে হত্যা করিব কেন?

খচ্চর বলিল—গাধা ছাড়া এমন প্রশ্ন কেহ করে না!

তখন দুইজনে প্রস্তুত হইয়া বলিল—বুঝিয়াছি।

খচ্চর পুনরায় বলিল—গাধা ছাড়া এমন উত্তর কেহ করে না!

তাহারা দুইজনে আবার বলিল—দ্বৈজাত্য আমাদের আসল জাতি মারিতে পারে নাই।

খচ্চর বলিল—সাধ্য কি!

দুইজনে হাসিল।

ক্ষীণকণ্ঠ ও ক্ষুদ্রপুচ্ছ খচ্চরকে শুধাইল—এবারে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক উপদেশ দান করুন।

খচ্চর বলিল—তবে শোন—

> "লবঙ্গ দেশের লোক অতীব ক্লেবর আহা,
> পরস্পরে বধি তারা বিষম গৌরব করে।"

ক্ষীণকণ্ঠ শুধাইল—গৌরব করিবে কেন?

খচ্চর বলিল—এভাবে প্রশ্ন করিতে থাকিলে লোকে আর তোমাদের গাধা বলিবে না।

লজ্জিত হইয়া সে বলিল—বুঝিয়াছি।

খচ্চর বলিল—বুঝিবেই তো। তোমরা যে গাধা! না বুঝিয়া নীরবে পালন করিয়া যাওয়া গাধার ধর্ম! এখন তোমরাও যাও পরস্পরকে হত্যা করিয়া গৌরব বোধ করিতে থাকো—লবঙ্গ দেশ তোমাদের আদর্শ হোক!

তখন গর্দভ ও রাসভ স্ব স্ব দলকে গিয়া সমস্ত বিষয় অবগত করাইল। রাসভ ও গর্দভ দল পরস্পরকে হত্যার প্রস্তাবে নাচিয়া খাড়া হইল—এবং অবিলম্বে ছোরা, ছুরি, লাটি, রামদা, গুপ্তি, তলোয়ার, কামান, বন্দুক, বোমা, বারুদ প্রভৃতি লইয়া স্বকর্মে নিযুক্ত হইল। এটম বোম নাই বলিয়া তাহাদের বড়ই আক্ষেপ!

রাসভপত্তনে তখন হানাহানি সুরু হইয়া গেল। রাসভগণ গর্দভগণকে এবং গর্দভগণ রাসভগণকে ছোরার আঘাতে, বন্দুক ছুঁড়িয়া হতাহত করিতে লাগিল।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ আমি কিছু অতিশয়োক্তি করিতেছি,—মোটেই না। তুমি ভাবিতেছ গাধা আবার ছুরি মারিবে কি প্রকারে? ইহা কি এতই অসম্ভব? আমি অনেক গাধাকে ছুরি মারিতে দেখিয়াছি—একটু কষ্ট স্বীকার করিলে বা অসাবধান হইলে তুমিও দেখিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, অনেক মানুষ গাধার ন্যায় ব্যবহার করে—তবে অনেক গাধাই বা মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারিবে কেন?

রাসভগণ বসিয়া থাকে—আর কোন গর্দভকে যাইতে দেখিলেই—ঐ একটা গর্দভ যায় বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ছোরা মারে। আবার গর্দভগণ তাহাদের পাড়ায় কোন রাসভ আসিয়া পড়িলে তাহাকে হতাহত না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

পাঠক, তুমি যদি শুধাও তাহারা কেন এমন করে? তবে তাহার উত্তর এই যে তাহারা যে গাধা! রাসভই বলো, আর গর্দভই বলো, কেহই জানে না কেন তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিতেছে, কেবল লবঙ্গ দেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা বিনা প্রশ্নে এই কাণ্ড করিয়া চলিয়াছে। কেন জিজ্ঞাসা করিলে বলে—উহারা যে গর্দভ, বলে উহারা যে রাসভ, বলে আমরা যে ভিন্ন জাতীয়, বলে দ্বৈজাত্যের ইহাই তো পরিণাম।

রাসভপত্তনে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অবশেষে এমন হইল যে রাসভ পত্তনে কাহারো পথে বাহির হওয়া দুষ্কর

হইয়া পড়িল; কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত বন্ধ হইবার মতো।

তখন সকলে আবার সেই খচ্চরটির কাছে গিয়া বলিল—এখন উপায় কি? পথে বাহির হই কি উপায়ে?

তখন খচ্চর বলিল—আবার তোমাদিগকে লবঙ্গ দেশের কথা বলিতে হইল। এহেন অবস্থায় তাহারা কি করিয়াছে শোনো। এই বলিয়া সে আবৃত্তি করিল—

"লবঙ্গ দেশের লোক এমন অবস্থা পাকে
রাজবেশ পরি সবে নির্ভয়ে বিহার করে।"

ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—লবঙ্গ দেশেও এইরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল—তখন তাহারা রাজবেশ পরিধান করিয়া নির্ভয়ে পথে চলিত। রাজবেশ পরিহিত পথচারীর উপরে কেহ আক্রমণ করিত না, কারণ প্রথমতঃ রাজবেশের উপরে আক্রমণ রাজাকে আক্রমণ, সে যে একপ্রকার রাজদ্রোহ! দ্বিতীয়তঃ, রাজবেশ পরিবার ফলে আক্রমণকারী বুঝিতে পারিত না লোকটা কোন্ জাতীয় লোক! সেই দ্বিধার অবকাশে পথিক বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত। অতএব হে রাসভ গর্দভকুল, তোমরা সেই আদর্শ গ্রহণ করো। তোমাদের রাজা সিংহ, তোমরা সিংহ চর্মের দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করিয়া পথে চলিতে আরম্ভ করো, বিপদ হইবে না।

সকলে খচ্চরের বুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া গেল।

খচ্চর বলিল—তোমাদের জন্য আমি কিছু সিংহচর্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি—এই লও।

এই বলিয়া সে এক রাশ সিংহচর্ম চতুর্গুণ মূল্যে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিল।

খচ্চর বলিল—এবারে তোমরা নির্বিপদ হইলে। লবঙ্গ দেশের লোকে মনুষ্য চর্মাবৃত গাধা, আর তোমরা হইবে সিংহ চর্মাবৃত গাধা! প্রভেদ কেবল চামড়ায়—ভিতরে উভয়েরই সমান।

গাধাগণ খুশী হইয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর রাসভপত্তনের সাধারণ পথচারীর সমস্যা দূর হইল না বটে, কিন্তু সিংহচর্মাবৃত গাধাদের অবস্থা অনেকটা সুসহ হইল। গাধাগুলি সিংহচর্ম দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া সদম্ভে, নির্ভয়ে পথে চলে—কেহ তাহাদের স্পর্শ করে না, কারণ সিংহচর্ম রাজচর্ম, তাহা ছাড়া ওই চর্মের অভ্যন্তরে রাসভ আছে, সঠিক

জানিবার উপায় নাই, কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিবে—তাই আক্রমণকারী অস্ত্র সম্বরণ করিয়া থাকে—ইত্যবসরে সিংহচর্মাবৃত গাধাটি দূরে চলিয়া যায়।

গাধার দল ভাবে সিংহচর্মের কি মহিমা!

কিন্তু সমগ্র রাসভপত্তনের অধিবাসীকে সিংহচর্মে আবৃত করা সম্ভব নয়—এত সিংহ কোথায়?

কাজেই স্ব-চর্মে আবৃত গাধাগণ পূর্ববৎ মরিতে লাগিল। এ-পাড়ায় একটি শিশু মরিলে, ও-পাড়ায় একটি শিশু মরে। একটি রাসভ-নারী হত্যার প্রত্যুত্তরে একটি গর্দভ-নারী প্রাণ হারায়। ভিক্ষুক গর্দভ নিহত হইলে ভিক্ষুক রাসভও নিহত হয়। এইরূপ মারাত্মক উত্তর-প্রত্যুত্তরের ফলে হতাহতের জমাখরচের ব্যালান্স-শীট প্রতিদিন প্রস্তুত হইতে থাকে।

গর্দভগণ ভাবে, আমরা কি বুদ্ধিমান, রাসভগণ ভাবে আমরা কি বুদ্ধিমান, আবার সিংহচর্মাবৃত গাধারা ভাবে আমরা কি বুদ্ধিমান। নিজের বুদ্ধির ঘাটতি আছে মনে করিতে পারিলে গাধা কি আর গাধা থাকিত? আর গাধাকে মনুষ্যচর্মেই আবৃত করো, আর সিংহচর্মেই আবৃত করো—গাধা গাধাই থাকিয়া যায়।

রাসভপত্তনে এইভাবে হত্যাচক্র আবর্তিত হইয়াই চলিল—থামে না, থামাইতে চায় না, থামাইতে গেলে সকলে তাহাকে জাতিদ্রোহী বলে, কেহ থামাইবার প্রস্তাব করিলে গাধারা ব্যঙ্গ করিয়া বলে—আহা দয়ার অবতার!

কেহ বলে গাধার নামে কলঙ্ক আরোপ করিল—কেহ বলে লোকটা গাধা নয়, মানুষ!

ভয়ে কেহ আর অগ্রসর হয় না এবং হত্যাচক্র শিশু, নারী, ভিক্ষুক, রুগ্ন, বৃদ্ধ অসহায়ের রক্ত-পিচ্ছিল পথে গড়গড় করিয়া গড়াইয়া চলে।

রাসভেরা বলে একটি গর্দভ জীবিত রাখিব না, গর্দভেরা বলে একটি রাসভকে জীবিত রাখিব না। আর সিংহচর্মাবৃত গাধারা বলে—আমরা বড়ই ক্লেবর।

ক্লেবর যে তাহাতে আর সন্দেহ কি! সবাই বুঝিতে পারে, ওটা সিংহ নয় গাধা। সেই রব, সেই চাল-চলন, সেই সব—কিন্তু চামড়ার মাহাত্ম্যে কেহ স্পর্শ করে না!

ক্লেবরের সর্বত্র জয়—আর ক্লেবর গাধার বিনাশ করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন শক্তি নাই।

পলাশীর শতবার্ষিকী

অনেক সমসাময়িক ইংরাজ সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কাহারো রচনা বা ইতিহাস পর্য্যায়ভুক্ত, কাহারো বা ডায়ারী ও পত্র পর্য্যায়ভুক্ত।

এখানে টম্‌সন্ নামে তৎকালীক এক ইংরাজের ডায়ারীতে লিখিত একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাকালে জেনারেল নীল মাদ্রাজে ছিল। সরকারী আদেশে একদল গোরা সৈন্য লইয়া জেনারেল নীল মাদ্রাজ হইতে সমুদ্র পথে কলিকাতা যাত্রা করিল। তাহার সঙ্গে টমসনও রওনা হইল। টমসন বে-সরকারী ইংরাজ ভদ্রলোক, ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিল।

যথা সময়ে নীলের জাহাজ কলিকাতার পুরাতন হাওড়া ষ্টেশনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। এখন যেখানে হাওড়া ষ্টেশনের মাল গুদাম তখন সেটাই ছিল পুরাতন হাওড়া ষ্টেশন।

নীল ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল গাড়ী ছাড়িবার মুখে। জেনারেল বুঝিল গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেলে তাহার পশ্চিম যাত্রার অযথা বিলম্ব হইয়া যাইবে: ষ্টেশন মাষ্টারকে গাড়ী স্থগিত রাখিতে নীল অনুরোধ করিল। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টারও তো ইংরাজ, ভারত সাম্রাজ্যের পতনের চেয়েও সময় স্খলনকে অধিকতর গুরুতর মনে করে।

সে ব্যক্তি ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া বলিল, অসম্ভব।

নীল পার্শ্ববর্ত্তী এডিকংকে বলিল—Arrest that impudent fellow.

ষ্টেশন মাষ্টার গ্রেপ্তার হইল, তাহার নাকের উপর দিয়া ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলেও গাড়ী ছাড়িল না। সেই অবসরে নীলের সৈন্য দল গাড়িতে চাপিল, নীল চাপিল, টমসন চাপিল তখন নীল পূর্ব্বোক্ত এডিকংকে হুকুম করিল—Release him.

ষ্টেশন মাষ্টার ছাড়া পাইলে নীল তাহার উদ্দেশ্যে বলিল—Now you may signal for starting!

গাড়ী ছাড়িল।

বিস্মিত ষ্টেশন মাষ্টার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ভাবিতে লাগিল, ইংরাজ চরিত্র হইতে সময় নিষ্ঠাই যদি অপসারিত হইল, তবে ভারত সাম্রাজ্য থাকিলেই বা কি লাভ!

তখন মাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হইয়াছে—সেই একশ কুড়ি মাইল পথ সসৈন্যে জেনারেল নীল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিরাপদে অতিক্রম করিল।

রাণীগঞ্জ হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পায়দল যাত্রা। তাহার উপরে হুকুম ছিল পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ হইয়া যত শীঘ্র সম্ভব কানপুরে পৌঁছিতে হইবে, সেখানে জেনারেল হুইলার ও বহু ইংরাজ নরনারী নানা সাহেবের নেতৃত্বে সিপাহীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে।

রাণীগঞ্জে একটি বৃহৎ মিলিটারী ডিপো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেখান হইতে খাদ্য, গুলী, বারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নীলের পদাতিক বাহিনী পাটনার দিকে রওনা হইল। টমসন ত্রিশ গিনিতে একটি ঘোড়া কিনিল। নীলের অধীনে যে অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, টমসন তাহাদের লইল। জেনারেল ও তাহার এডিকং চলিল সকলের পিছনে, সকলেই অশ্বারোহী।

রাণীগঞ্জ হইতে দানাপুর পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা শান্ত, বিদ্রোহ বা অশান্তির কোন চিহ্ন নাই, কেবল চার দিকে একটা থমথমে ভাব। জেনারেলের সৈন্য-বাহিনী বিনা প্রতিরোধে দানাপুর আসিয়া পৌঁছিল।

দানাপুরের পরে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কোম্পানীর আফিস, আদালত, ফাঁড়ি হয় পরিত্যক্ত নয় দগ্ধ, পথের পাশে বড় বড় গ্রাম বিধ্বস্ত, চারদিক নির্জ্জন, দিনের বেলাতেই নেকড়ে, চিতা বাঘ নির্ভয়ে বিচরণ করে।

তখন গ্রীষ্মকাল, দারুণ গরম। নীলের ফৌজ রাত্রে মার্চ্চ করিত, দিনে তাহাদের বিশ্রাম। রাত্রি দু'টার সময়ে মার্চ্চের হুকুম দেওয়া হইত, বেলা দশটা পর্য্যন্ত সকলে পথ চলিত। দশটার সময়ে ছাউনি পড়িত। বিকাল বেলা আবার মার্চ্চ। রাত্রি আটটায় আবার ছাউনি পড়িত, দুটা পর্য্যন্ত আবার বিশ্রাম।

টমসনের নিজের তাঁবু ছিল না, কোন এডিকং-এর তাঁবুতে সে আশ্রয় লইত। সৈন্যদল পথ ধরিয়া চলিত কিন্তু টমসন অশ্বারোহী, সম্মুখের গন্তব্যস্থল মানিয়া লইয়া সে আপন মনে চলিত, কখনো সোজা পথ, কখনো ঘুরপথ ধরিত, যথাসময়ে গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌঁছিত। তাহার কাছে একখানি মানচিত্র ছিল।

এবারে নীল জগদীশপুরের জমিদার কুঁয়র সিং-এর প্রভাবাধীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। কুঁয়র সিং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়াছে। যদিচ পাটনার কমিশনার ট্রেভর্স কর্তৃক স্বস্থান হইতে সে বিতাড়িত, তবু কোথায় যে আত্মগোপন করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে কেহ জানে না, তাই নীলকে সাবধানে চলিতে হইতেছে।

নীলের বিচার যেমন ক্ষিপ্র তেমনি নিষ্ঠুর। তাহার ধারণা বিদ্রোহী কুঁয়র সিং-এর জমিদারীর সকলেই বিদ্রোহী। অতএব হাতের কাছে যাহাকে পাইল নীল তাহাকে গাছে লটকাইয়া দিল। অন্য প্রমাণে যেখানে সম্পূর্ণ অভাব, দেহের বলিষ্ঠতাই সেখানে একমাত্র প্রমাণ; অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও বাদ পড়িল না। ইতস্ততঃ যে দু' দশ জন লোক ছিল তাহাদের অনেকেই বিচার বিভ্রাটে মরিল, অনেকে ফৌজের পথ ছাড়িয়া দূরবর্তী বনে পাহাড়ে চলিয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। শ্মশান হইতে শ্মশানে সঞ্চরণ করিতে করিতে নীলের ফৌজ কাশী অভিমুখে চলিল।

৩

একদিন সকাল বেলায় মার্চের পূর্ব্বে জেনারেল নীল টমসনকে সতর্ক করিয়া দিল, বলিল মিঃ টমসন আজকার দিনটা সাবধানে চলিবে।

টমসন বলিল—বিশেষ করে আজকার দিনটা কেন?

আজ পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী, আজ তেইশে জুন।

তাতে আশঙ্কার কিছু আছে কি?

খুব আছে। সিপাহীরা অত্যন্ত কুসংস্কার পরায়ণ। তাদের ধারণা কোম্পানীর রাজত্ব ঠিক একশ বছর স্থায়ী হবে। এই দিনটার জন্যই তারা এতদিন অপেক্ষা করছিল—আজ সেই দিন। আজ তারা Desperate হয়ে একটা কিছু করতে পারে।

টমসন বলিল—I sse! কিন্তু সিপাহীর তো কোন চিহ্ন এ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

নীল একটু ভাবিয়া বলিল—Hum! আমার বিশ্বাস আজকার দিনের জন্যই সমস্ত শক্তি ওরা conserve করে রেখেছে। আজকের দিন কেমন যায় বলা যায় না।

তারপরে সে নিজের মনেই যেন বলিল আজ এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে কি হয় বলা যায় না। বিশেষ করে কানপুরে! Poor fellows!

তখন টমসন বলিল—অনেক ধন্যবাদ জেনাবেন, আমি সাবধানেই চলবো, লক্ষ্য রাখবো আমার ঘোড়া আমাকে যাতে বিপথে নিয়ে না যায়।

৪

সন্ধ্যার সময়ে আবার ছাউনি ভঙ্গ হইল। অশ্বারোহী টমসন সতর্কভাবেই চলিল।

টমসন কিছুদূর চলিবার পরে দেখিল—একটা জায়গায় পথ ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে, মাঠ পার হইয়া গেলে অনেকটা পথ কম হয়, মাঠ শস্যহীন, চলিবার পথে বাধা নাই, আর পথের সবটা জুড়িয়া সৈন্যদল চলিয়াছে।

টমসন মাঠের দিকে ঘোড়াকে চালনা করিল। মাঠের মধ্যে কতক দূর অগ্রসর হইতেই ছোট একটি বনের মতো। খুব সম্ভব এক সময়ে বাগান ছিল, বহু দিনের অযত্নে এক বনে পরিণত হইয়াছে। টমসন সেই বনটাকে পাশ কাটাইবার জন্য আরও একটু ঘুর পথ ধরিল। কিন্তু দেখিল বন সেখানে আরও নিবিড়। এইভাবে বনটাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় পথ হইতে সে ক্রমে দূরে গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন নীলের সতর্ক বাণী মনে পড়িল, সে দেখিল যে সে সম্পূর্ণ একাকী! টমসন দেশলাই জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল রাত্রি দশটা। একবার ম্যাপখানা দেখিবার কথা তাহার মনে হইয়াছিল কিন্তু বুঝিল দেশলাইয়ের আলোতে ম্যাপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। তখন সে রাশ টানিয়া ঘোড়া দাঁড় করাইল এবং একবার স্থিরভাবে নিজের অবস্থা ভাবিল।

রাত্রি অন্ধকার এবং নির্জ্জন, চারিদিকে ঘন বন, দেশ বিদ্রোহীদের হস্তগত, সে সম্পূর্ণ একাকী আর আজ পলাশীর শতবার্ষিকী। এহেন অবস্থায় কি কর্ত্তব্য সে ভাবিয়া পাইল না। সে একবার ভাবিল যেখানে আছে সেখানেই রাত্রিটা অতিবাহিত করে। কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িল সিপাহী না আসুক বাঘ ভালুক আসিতে পারে—তাহাদের আচরণ বিদ্রোহীদের চেয়ে যে অন্য রকম হইবে এমন ধারণার কারণ নাই।

তখন সে স্থির করিল যে এমন অবস্থায় মানুষের বিচার বুদ্ধির চেয়ে ঘোড়ার সহজাত বুদ্ধির উপরে নির্ভর করাই অধিকতর ফলপ্রদ হইতে পারে। নিরুপায় হইয়া সে ঘোড়ার রাশ আল্‌গা করিয়া দিল—ঘোড়া আপন মনে চলিতে সুরু করিল। টমসন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল কি মুস্কিল। এমন সঙ্কটটা কি না আজকার দিনেই ঘটিল, আজ যে পলাশীর শতবার্ষিকী।

৫

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ বুঝিবার উপায় নাই, টমসন দেখিল বন আর নাই, তার বদলে অন্ধকারের পটে ধূসর ফিতার মতো একটা পথের চিহ্ন। টমসন ভাবিল বাঁচিলাম এতক্ষণ পরে পথের নিশানা পাওয়া গেল। সাগ্রহে সে পথের রেখা ধরিল।

কিন্তু কই সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন কোথায়? তখনো তাহার মনে হয় নাই যে—এ পথ সে পথ না হইতেও পারে। পথ জনপদ সূচী ভাবিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, ঘোড়াটাও বেশ হাল্কা চালে চলিতে সুরু করিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে অদূরে জনপদের আভাস ফুটিয়া উঠিল। সেখানে যাওয়া উচিত কিনা স্থির করিবার আগেই ঘোড়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল—তার দুই পাশে সারি সারি খাপরার ঘর, মাঝে মাঝে দু'চারটা কোঠাবাড়ী, এক তালা, দোতালা সব রকমই আছে, কিন্তু সব নিঃশব্দ নির্জ্জন, কোথাও একটিও আলোর রশ্মি পর্য্যন্ত নাই।

টমসন্ ভাবিল এ কোথায় আসিলাম? এ শহর সিপাহীর হাতে না কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত? টমসন্ যদি দেশের অবস্থা জানিত তবে বুঝিতে পারিত যে সব চেয়ে ভয়াবহ স্থানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে—এ সেই জগদীশপুর, যেখানকার জমিদার কুঁয়র সিং এ অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নেতা। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ ছিল না, কেননা জগদীশপুর সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কুঁয়র সিং দলবল লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছে—বাকি লোক কোম্পানীর ফৌজ আসিতেছে শুনিয়া পালাইয়াছে, কাজেই জগদীশপুর নিঃশব্দ, নির্জ্জন ও দীপরশ্মিহীন।

৬

এতক্ষণ পরে টমসন্ বুঝিতে পারিয়াছে যে লোকালয় যাহারই অধিকারভুক্ত হোক না কেন এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। সে স্থির করিল যা থাকে কপালে এখানেই সে রাত্রি অতিবাহিত করিবে। ভয়ের চরম তাহার মনে এক প্রকার সাহস আনিয়া দিয়াছিল, সেই সঙ্গে ছিল সারাদিনের ক্লান্তি।

সে ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়াটিকে একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া সোজা একটি পাকাবাড়ির দোতালায় গিয়া উঠিল দরজা খোলাই ছিল। টমসন দেখিল ধূলায় আচ্ছন্ন মেঝের উপর একখানা তক্তপোশ পড়িয়া আছে, তক্তপোশের উপরে খান দুই শতরঞ্চি বিন্যস্ত ইতস্ততঃ গৃহস্থের ব্যবহার সামগ্রী পড়িয়া আছে,

টমসন্ বুঝিল যে গৃহস্বামী অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া পালাইয়াছে, কিছুই সঙ্গে লইতে পারে নাই। সেই তক্তপোশ খানার উপরে সে শুইয়া পড়িল এবং অচিরকাল মধ্যে নিদ্রিত হইল।

হঠাৎ টমসন্ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল, ভাবিল একি দুঃস্বপ্ন! ঘুমের মধ্যে বিচিত্র শব্দের একটা বন্যার গর্জ্জন সে শুনিতেছিল। সে আবার ভাবিল একি দুঃস্বপ্ন! কিন্তু না, স্বপ্ন তো নয়, এখনো তো সেই শব্দের বন্যা চলিয়াছে। তবে কি সে জাগ্রত, না এখনো ঘুমাইয়া আছে। ঘুমাইয়া থাকিবে কেন, এই তো তক্তপোশের উপরে সোজা বসিয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল ঐ শব্দের বন্যা আর যাই হোক স্বপ্ন নয়।

নিদ্রার জড়তা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল একটা বৃহৎ সৈন্যদল চলিতে থাকিলে ঐ প্রকার শব্দ হইবার কথা। ঐ তো পদাতিকের ফৌজী বুট জুতার মচ মচ, কামানের গাড়ীর ঘড় ঘড়, অশ্বারোহীর খট্ খট্। এ শব্দ তাহার খুব পরিচিত, এ কয়দিন ঐ শব্দে সে খুব পরিচিত, এ কয়দিন ঐ শব্দে সে খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ নাই কেন? অশ্বের হ্রেষা নাই কেন? তারপরে বুঝিল এ শব্দ দূরবর্ত্তীও নয় ঐ পাশের রাস্তা দিয়াই শব্দের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার, নজর চলে না। কিন্তু তাদের অভ্যস্ত কান বুঝিল শব্দ শত গজের অধিক দূরবর্ত্তী নয়, শত গজ দূরেই পথটি বটে। তখন সে বুঝিল এ ফৌজ কোম্পানীর, কোম্পানীর ছাড়া আর কাহারও ফৌজ এত প্রচুর হওয়া সম্ভব নয়। তখন সে ভাবিল অজ্ঞাত দেশে পথের চক্রান্তে সে হয়তো জেনারেল নীলের ফৌজের পথে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে; সন্ধ্যাবেলায় ভাবিয়াছিল যে পিছাইয়া পড়িয়াছে, এখন দেখিতেছে আগাইয়া আছে, তাহার মন হইতে প্রকাণ্ড একটা ভার নামিয়া গেল, আনন্দে সে একটা ফৌজী সুর শিষ দিতে লাগিল।

কিন্তু তখনি আবার অননুভূত পূর্ব্ব এক ভাব তরঙ্গে তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কোম্পানীর ফৌজ তো? না, কোন বিদ্রোহী সামন্তের? সেই অপরিচিত স্থানে, সেই অন্ধকার নিশীথে সেই নির্জ্জন জনপদে এমন একটা কিছু ছিল যাহার উদ্যত তর্জ্জনী তাহার চপল উল্লাসকে ক্ষান্ত করিয়া দিল।

এতক্ষণে সে সত্যকার ভয় অনুভূত করিল। অনেকক্ষণ মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিল, তারপরে যা থাকে অদৃষ্টে বলিয়া কপাল ঠুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

তুম্ কোন্ হ্যায় ?

অন্ধকার শিহরিত করিয়া উত্তর আসিল—

'পল্টন হ্যায়'

টমসন্ পুনরায় শুধাইল—

'কি ধার যা রহা'

গভীর মন্দ্রে ধ্বনিত হইল—'দিল্লী চল্ রহা হ্যায়।'

তবু নিঃসংশয় না হইতে পারিয়া টমসন্ শুধাইল—

'তুম্ লোগ কিস্‌কা ফৌজ হ্যায়'।

অন্ধকার কম্পিত করিয়া সেই কণ্ঠ বলিল—

'নবাব কা-ফৌজ হ্যায়।'

টমসন্ বুঝিল যে কোম্পানীর মিত্র নবাবের ফৌজ, কিন্তু তখনি মনে হইল এতক্ষণ ইহারা কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিয়া লই নাই কেন, তাহাতে পথের রহস্য প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। টমসন্ প্রশ্ন করিল—'তুম্ লোগ এতনা বখৎ কাঁহা থা। অাভি চল্ রহা···'

রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া রব উঠিল—'হাম্ লোগ পলাশী ময়দান মে গিয়া থা। আভি চল্ রহা···'

বিদ্যুৎ চমকবৎ টমসনের মনে জাগিল আজ পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী ! তবে কি ইহারা—কিন্তু ইহা কি সম্ভব ?

তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

রাজা কি রাখাল

ভীমা নদীতীরে বাহাদুরগড়ে মোগল বাদশার ছাউনি পড়েছে। মোগল বাদশার ছাউনি এক শহর। ফাঁকা মাঠে ছাউনি পড়লে, আর ফাঁকা মাঠ ছাড়া অতবড় ছাউনি পড়বেই বা কোথায়, আস্ত মাঠখানা দেখতে দেখতে আস্ত একটা শহরে পরিণত হয়ে পড়ে। বাদশার ছাউনিগুলো আগ্রা, দিল্লীর ছোট ছোট সংস্করণ। মেথর, ভিস্তিওয়ালা, ঘেসেড়া থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে উঠতে সবার উপরে খোদ বাদশা। সেই বাদশার ছাউনি পড়ে বাহাদুরগড়ের মাঠ ছোট দিল্লীতে আজ পরিণত। দাক্ষিণাত্যে পঁচিশ বছর লড়াই চালিয়ে বৃদ্ধ আলমগীর উত্তরে ফিরছে। আহত সিংহ মাথা গুঁজবার গুহার সন্ধানে নিযুক্ত। ভালো করে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, সিংহ কেবল আহত নয়, বৃদ্ধও, বুঝি বা মুমূর্ষুও!

ভীমা নদী নামের অনুরূপ নয়, নিতান্তই ক্ষুদ্র, তায় আবার গ্রীষ্মকালে শুষ্ক। নদীর উত্তর দিকে ছাউনির শহর, ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের তাঁবুর শ্রেণী, দক্ষিণ দিকে যতদূর তাকানো যায় মাঠ, মাঝে মাঝে দৃষ্টিকে বাধা দেয় পাহাড়, দগ্ধ, অনুর্বর, নাতি উচ্চ।

নদীর ধারে জায়গাটা নির্জন, নানা আকারের কতকগুলো পাথর ছড়ানো। তারি একটা সমতল পাথরের উপরে একজন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ উপবিষ্ট। দূর থেকে দেখলে বৃদ্ধকে একটা পাথরের খণ্ড মনে হওয়া অসম্ভব নয়, এমনি সে নিশ্চল, নিঃসাড়। তবে পাথরের মূর্তি তো চিন্তা করে না, বৃদ্ধ চিন্তা করছিল—তাই এই তন্ময়তা। কি চিন্তা? হয়তো দীর্ঘ দিনাবসানের সঙ্গে নিজের দীর্ঘ জীবনাবসানের মিল দেখে চিন্তা করছিল, হয়তো দগ্ধ তাম্র অনুর্বর ভূখণ্ডের সঙ্গে নিজের কীর্তির মিল দেখে চিন্তা করছিল, হয়তো রাখাল বালকদের ঘরে ফেরার আনন্দ দেখে নিজের ঘরে ফেরার অমিল দেখে চিন্তা করছিল। চিন্তা যখন জীবনের রাশ কেড়ে নেয় তখন মানুষ বড় কৃপার পাত্র।

আল্লা হাকিম!

ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস বাহিত ক্ষীণ কণ্ঠের "আল্লা হাকিম" শব্দ সহসা প্রবেশ করে বৃদ্ধের কানে। সে চমকে পিছন ফিরে দেখতে পায়, অদূরে এক বুড়ী বসে পড়েছে, বসে পড়েছে না বলে ভেঙে পড়েছে বলাই উচিত, বুড়ীর আর যেন উঠবার শক্তি নেই।

রঙ্গমঞ্চে অভাবিত ভাবে বুড়ীর আবির্ভাবে বৃদ্ধ একটু বিস্মিত হল, কি যেন চিন্তা করে নিয়ে শুধাল, বুঢ়ী মাঈ, তুমি কোথা থেকে আসছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে বুড়ী বুঝলো যে, কাছাকাছি আরো একজন মানুষ আছে, এতক্ষণ দেখতে পায়নি, বুড়ী বুঝি চোখে কম দেখে। বুড়ীর উত্তর না পেয়ে বৃদ্ধ আবার শুধালো, বুঢ়ী মাঈ, কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে?

এবারে বুড়ী মুখ তুলে প্রশ্নকর্তাকে বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে বলল—ফকির সাহেব, সেলাম।

বুড়ী সত্যই চোখে কম দেখে নইলে বৃদ্ধকে সরাসরি ফকির মনে করত না। চোখের দৃষ্টি সজাগ থাকলে দেখতে পেত ফকিরের পোশাক এমন দামী হয় না, ফকিরের শিরপ্যাঁচে মুক্তোর হার দেখা যায় না, ফকিরের কটিবন্ধে রত্নখচিত ছোরা থাকে না। আর কোথায় বা এমন ফকির, যার চোখে বাজপাখীর দৃষ্টি।

বুড়ী এবারে উত্তর দিল, নসিব ফকির সাহেব, নসিব!

কি প্রশ্নের কি উত্তর! বৃদ্ধের শুষ্ক, কৃশ, বলি-চিহ্নিত, শ্মশ্রু-জটিল মুখে একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের রেখা ফুটে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখোশ টেনে দিল দীর্ঘকালের অভ্যাসে।

ওটা কি লকড়ির বোঝা?

বেশ ভারি একটা কাঠের বোঝা লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল ফকির সাহেব।

হ্যাঁ, বাবা।

অত ভারি তুমি বইতে পারবে কেন?

দরকার হলেই বইতে হয়, বাবা।

ওটা যে খুব ভারি।

ওর চেয়েও অনেক বেশি ভার চাপিয়ে দিয়েছেন আল্লা।

এবারে ফকির সমবেদনার সুরে বলল—তাই তুমি এমন ভেঙে পড়েছ?

হ্যাঁ, সাহেব।

কিন্তু তোমার কি কেউ নাই?

ছিল তো সবই।

তবে?

তবে আর কি ফকির সাহেব, এখন এই বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।

কেন?

তারা সবাই সব বোঝা আমার উপরে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

তারা বুরা আদমি।

বুরা নয় ফকির সাহেব, সাচ্চা, তারা সবাই সাচ্চা আদমি।

তবে তোমাকে দিয়ে তারা বোঝা বওয়ায় কেন?

যতদিন ছিল, তারাই বয়েছে।

এখন কোথায় তারা?

লড়াইয়ে গিয়েছে।

ফেরেনি?

লড়াইয়ে গেলে কে কবে ফেরে?

কে কে ছিল?

স্বামী, ছেলে, নাতি। লড়াই যে অনেকদিন ধরে চলছে বাবা।

বৃদ্ধ যে-ই হোক, ফকির বা আমীর যে-ই হোক, বেশ বোঝা গেল দাক্ষিণাত্যের লড়াইয়ের ইতিহাস তার পরিজ্ঞাত। সে হিসাব করে দেখল যে-লড়াই পঁচিশ বছর ধরে চলছে, তাতে বাপ-ছেলে-নাতি তিন পুরুষ যেতে পারে বইকি! সৈনিক জীবনের এই বিচিত্র অথচ অত্যন্ত সত্য হিসাবটি কখনো মনে হয়নি, এবার মনে হওয়ায় বিচলিত হল, দুলে উঠল তার শিরপ্যাচে মুক্তোর হার।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুধাল, তোমার বাড়ি কোন্ গাঁও?

ছিল তো বাবা এই বাহাদুরগড়েই—

ছাড়লে কেন?

বাদশার ছাউনি পড়েছে।

ক্ষতি কি?

সাহেব, তুমি ফকির, বাদশাকে তোমার ভয় নাই, আমরা যে গরীব।

তাতে কি হয়েছে?

বাদশা তো ভালোই বাবা, কিন্তু তার সেপাই-সান্ত্রী—

সেপাই-সান্ত্রীর আচরণ বলতে যে কি বোঝায়, বোধকরি তা ফকিরের অজ্ঞাত নয়। তাই আর বেশি না ঘাঁটিয়ে শুধাল—তা এখন যাচ্ছ কোথায়?

ঐ পাহাড়ের ধারে।

ওখানে গাঁও আছে?

না, কেবলই পাহাড়।

কাঠ নিয়ে চলেছ কেন ?

রাতে বাঘ-ভালুক আসে কিনা, আগুন জ্বেলে তাড়াব।

আর একটি সুপরিজ্ঞাত সত্য নূতন বিস্ময়ে দেখা দিল ফকিরের চোখে। সেপাই-সান্ত্রীর চেয়ে বনের বাঘ-ভালুক অনেক কম ভীতিকর !

বুড়ীকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফকির বলল—বুঢ়ী মাঈ, এ দুনিয়ায় কেউ সুখী নয়।

বুড়ী নির্বোধ নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলল, কেন বাবা, বাদশা আলমগীর।

এমনভাবে প্রশ্নটা ফিরে আসবে ভাবেনি ফকির। হঠাৎ জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, বাদশার মনের আসল অবস্থা জানা সহজ নয়। দুনিযার হীরা-জহরতের তলে চাপা পড়ে আছে দুনিয়ার মালিক।

তবে ?

তাইতো বলছি, বাদশা শাজাহানের নাম শুনেছ, রাজ্যের হীরে-মুক্তো-মানিক দিয়ে গড়েছেন তাজমহল—কিন্তু ভিতরে কি ? কবরের মধ্যে ক'খানা শুকনো হাড়, বাইরে থেকে লোকে বুঝবে কেমন করে ?

কথাগুলো বুড়ী বুঝল কিনা জানিনে—অবাক হয়ে তাকিয়ে বসে রইল।

তখন ফকির বলল—বাদশার কথা থাক, আমার কথা শোন। তার পরে বিচার করো তোমার আমার মধ্যে কে বেশি দুঃখী।

জমে-আসা অন্ধকারের মধ্যে ফকির তার গল্প জমিয়ে তুলল। সে আরম্ভ করল—বুঢ়ী মাঈ, তোমার মত আমারও মস্ত সংসার ছিল, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী···কি না ছিল, কে না ছিল।

বুড়ী শুধায়·· -বাপ, ভাই ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ফকির বলে, হ্যাঁ বহিন ছিল, ছেলের বউ ছিল, ফুলের বাগান নানান ফুলে ভর্তি ছিল।

তারপরে ?

তারপরে একদিন উত্তরে বাতাস বইতে শুরু করল, আরম্ভ হল ফুল ঝরে পড়া।

সাহেব ফুলের কথা ছেড়ে মানুষের কথা বল—তোমার সংসার ভেঙে গেল ?

ভেঙে যাওয়াই বলতে হয়।

কেন ?

নসিব।

নসিব ছাড়া আর কবে কি হয়েছে ? তবু আর একটু খুলে বল।

এক ছেলে পালিয়ে গিয়ে আমার দুশমনদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই শুরু করল আমার বিরুদ্ধে। এক মেয়েকে কয়েদ করতে হল। অন্য দুই ছেলে পারলে ছুরি মারে এ ওর বুকে।

সাহেব, তবে কি তুমি আমীর লোক ?

হঠাৎ এ কথা মনে হ'তে গেল কেন ?

আগে তো হয়নি, তোমার কথা শুনে মনে হল। আমীর লোকের ঘরে খুন বড় সস্তা।

তোমার কথা খুব ঠিক বুড়ো মাঈ, এত লোভ ছিল আমাদের বংশে আগে ভাবিনি।

তাই বুঝি তুমি ফকিরি নিয়েছ ?

ফকিরি আর নেওয়া হল কই ?

পোশাক তো সেই রকম।

তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বুড়ী বলল, তোমার এত দুঃখ! বাদশাকে জানাও না কেন ?

তোমারও তো দুঃখ কম নয়—তুমিই বা জানাও না কেন বাদশাকে ?

খবরদার ফকির সাহেব, ও কথা মুখে এনো না। খবরদার, খবরদার !

কেন, ভয়টা কিসের ?

শীতে যেমনভাবে মানুষ কাঁপে তেমনি কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী বলল—বাবা, আলমগীর জিন্দাপীর, দীন দুনিয়ার মালিক।

ফকিরের প্রস্তাবের অসমীচীনতা প্রমাণের পক্ষে ঐটুকুই যেন যথেষ্ট।

অন্ধকার যদি ঘনীভূত না হত, বুড়ীর চোখ যদি জ্যোতিহীন না হত, তবে সে দেখতে পেত যে ফকিরের খিন্ন মুখে একটা হাসির রেখা তরঙ্গিত হয়ে উঠল।

তুমিই বা জানাও না কেন বাদশাকে, দূর করে দেবেন তোমার দুঃখ।

ফকির বলে—টাকা দিয়ে দুঃখ দূর করা সম্ভব হলে পারেন বাদশা।

তবে ?

তবে আর কি। টাকায় দুঃখ দূর হলে বাদশা দুঃখী কেন। বুড়ী মাঈ, দুঃখ তো এক রকম নয়। বাদশাহের বাদশাহী দুঃখ, আমীরের আমীরী দুঃখ,

ফকিরের ফকিরি দুঃখ, গরীবের গরীবী দুঃখ। সবাই দুঃখী, কে কার দুঃখ দূর করবে ?

আল্লা, আল্লার কাছে সবাই সমান।

তাই তো তিনি সবাইকে সমানভাবে দুঃখ বেঁটে দিয়েছেন। কিন্তু ওসব কথা যাক। তোমার আমার মধ্যে কে বেশি দুঃখী তাই বল।

কেন বাবা, আমি।

তোমার স্বামী, ছেলে, নাতি লড়াইয়ে মারা গিয়েছে—কিন্তু তারা তো কেউ তোমাকে খুন করতে চায়নি।

বুড়ী জিব কেটে বলল—না বাবা, না, তারা খুব ভালোবাসত আমাকে।

আমার ছেলে আর নাতিরা পারলে আমাকে খুন করে।

এমন সংসারে থেকো না বাপ, মক্কা শরিফ চলে যাও '

দুঃখ তো মনের মধ্যে, মনটা কি এখানে পড়ে থাকবে।

কথাটা বুড়ী ঠিক বুঝল কিনা জানি না, বলল—তবে ফকিরি নিয়ে ভিক্ষা মেগে খাও, অমন দুশমনের সংসারে আর থেকো না।

ফকির বলল—ভিক্ষাই বা দেয় কে ?

ফকিরের কথায় বুড়ী এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল, তারপরে আঁচলের খুঁট খুলে গোটাকয়েক পয়সা বের করে বলল—এই নাও বাবা।

ফকির চমকে উঠে বলে—ও কি !

বুড়ী ভাবল ভিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতায় হয়তো ফকির আপত্তি করছে—বলল, আর তো নেই বাবা, বাদশার ছাউনিতে মউয়াফুল বিক্রি করে চার দামড়ি পেয়েছিলাম। এই নিয়ে ছাউনির বাজারে যাও, পেট ভরে খেতে পারবে।

এই বলে পয়সা ক'টা ফকিরকে দিতে উদ্যত হল।

ফকির আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারল না, গম্ভীর স্বরে বলল, এতক্ষণ যে ফকির কথা কইছিল এ স্বর যেন তার নয়, যেন অন্য একজন কার,—বুঢ়ী, কাকে কি ভিক্ষা দিতে যাচ্ছ—আমি তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা, আলমগীর জিন্দাপীর।

বুড়ী ভাবল দুঃখে-শোকে ফকির বাউরা হয়ে গিয়েছে—বলল, অমন কথা মুখে এনো না বাবা, বাদশা জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

এমন সময়ে অদূরে ঘোড়সওয়ারের পদধ্বনি শ্রুত হল।

বুড়ী বলল, শিগ্‌গির ধরো—বাদশার ঘোড়সোয়ার আসছে—আমি এবার পালাই।

এই বলে পয়সা ক'টা ফকিরের হাতে গুঁজে দিয়ে বুড়ী নদীর মধ্যে নেমে পড়লো।

ফকির বলে উঠল—বুঢ়ী, নদীর ওপারে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে—

দূর থেকে বুড়ীর ক্ষীণ কণ্ঠে ধ্বনিত হল—বাঘ-ভালুককে ভয় করি না, ভয় ঐ বাদশার ঘোড়সোয়ারকে—তুমি শিগ্‌গির পালাও।

ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ করে নিবেদন করল—শাহানশা, তাঞ্জাম হাজির, ছাউনিতে ফিরবার সময় হয়েছে।

পরী

বড়ে মিঞা প্রকাণ্ড একটা হাণ্ডায় গোস্ত চাপিয়েছে, উনুনের তাপে আর মাংসের খুশবুতে প্রখর শীত সত্ত্বেও ঘরের মধ্যেটা সরগরম. সকলে কাঁথা কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে বেশ জমে বসেছে।

একজন বলে উঠল, বড় মিঞা একটা কেচ্ছা বল।

বড়ে মিঞা উনুনের জ্বাল ঠেলে দিতেই আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, স্পষ্টতর হয়ে উঠল তার রূপোলী লম্বা দাড়ি, পাকা চুল, সারা মুখের অজস্র বলিচিহ্ন।

বলি, বড়ে মিঞা একটা কেচ্ছা বল।

এবারে গোস্তটা বেশ করে ঘেঁটে দিয়ে সে বলল, বাপজান, বড়ে মিঞা কেচ্ছা বলে না, যা বলে তাসব সাচ্চা: এই পর্যন্ত বলে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, জানালায় পাল্লা খড়খড়ির বালাই ছিল না, তাই দেখবার কোন অসুবিধা নাই। বড়ে মিঞার চোখে পড়ল দূরে জুমা মসজিদের মিনারের চূড়ার সঙ্গে আটকে রয়েছে, লখকাটা ঘুড়ির মত মস্ত পূর্ণিমার চাঁদখানা। আর ঐ হাতের কাছেই মোতি মসজিদের গম্বুজে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ক্ষয়ে যাওয়া পালিশের উপরে নূতন পালিশ ঘষে দিয়েছে। পুবের জানালা দিয়ে তাকাতেই, কোন দরজা জানলায় কপাট পাল্লার বালাই ছিল না. চোখে পড়ল মোতিমহল, হামাম, দেওয়ানী খাস, সাহী বুরুজ—সব যেন ঘুমিয়ে আর এক দিনের, সেই বাদশাহী সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখছে।

মিঞা জ্বালটা একটু ঠেলে দাও।

তাইতো, বলে দুখানা নূতন জ্বালানি দেয় উনুনে—আর খুঁচিয়ে দেয় আগুনটা। আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাকা দাড়ি পাকা চুল, গালের কপালের বলিচিহ্ন, সেই সঙ্গে চোখের কোণে জলের আভাস। কিন্তু ঐ শেষের চিহ্নটা চোখে পড়ে না শ্রোতাদের। শ্রোতারা সকলেই ছোকরা। যৌবন অনশ্রুদর্শী।

ছোকরাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, আরে আমিও তাই বলি, বড়ে মিঞা সাচ্চা ছাড়া ঝুটা বলে না।

কে ও? খিজির নাকি? ঠিক বলেছ বাপজান। আর ঠিক বলবেই বা না কেন? তোমার বাপ আর আমি সর্বদা থাকতাম বাদশাহী ফৌজের আগে আগে। আলমগীর বাদশা নিজ হাতে আমাদের মোহর বকশিশ করেছিলেন।

শ্রোতাদের সবাই জানে ইতিহাস হিসাবে কথাটা সত্য নয়। আলমগীর বাদশা মারা গিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর হল আর সে ঘটনাও নাকি ঘটেছে হিন্দুস্থানে নয়, দক্ষিণে। দেশ ও কাল দুয়ের বিচারেই কথাটা মিথ্যা। বড়ে মিঞার বয়স অবশ্য সত্তর পেরিয়েছে, কিন্তু সে ফৌজী নয়, কথনো ছিল না— সে হচ্ছে লালকেল্লার বাদশাহী আস্তাবলের হেড সহিস;—আর সে কথনো নর্মদা পেরিয়ে দক্ষিণে যাওয়া দূরে থাক্, চম্বল পেরিয়েছে কিনা গবেষণার বিষয়। তবু প্রকাশ্যে আপত্তি সম্ভব নয়, শ্রোতারা সবাই হচ্ছে আস্তাবলের সহিস, বড়ে মিঞার সাগরেদ। যদিচ আস্তাবল বলতে এখন পাঁচ-ছয়টা রোগা পটকা কানা খোঁড়া ঘোড়া—তবু তো বাদশাহী আস্তাবল। ঘটি না ডুবলেও তালপুকুরকে ডোবা বলা চলে না।

বড়ে মিঞার পিতৃদত্ত নাম অবশ্যই একটা কিছু ছিল, আর খুব সম্ভব সেটা ছিল জাঁকালো রকমের কিছু। কিন্তু অনেকদিন হল চাপা পড়ে গিয়ে বেরিয়ে আছে ঐ ক্ষুদ্র মিনারটি—"বড়ে মিঞা"। লাল কেল্লার ছোট বড় সবাই ডাকে বড়ে মিঞা, শহর শাজাহানাবাদে যারা তাকে চেনে ঐ নামেই ডাকে—বড়ে মিঞা। এখন শাজাহানাবাদের আর হিন্দুস্থানের সবাই জানে, দিল্লীর বাদশাহীর আর সেদিন নাই, আরো যারা বেশি খবর অর্থাৎ একেবারে হাঁড়ির খবর রাখে তারা জানে বাদশার হারেমে সব দিন খানা তৈয়ার হয় না। আর অনেক সময়ে গভীর রাত্রে দেউড়ি-ই-সালাতিনে অর্থাৎ যেখানে নাকি আগেকার বাদশাদের বেগম ও ছেলেমেয়ে নাতিরা থাকে, সেদিক থেকে আর্তকণ্ঠে চিৎকার শুনতে পাওয়া যায় "খানা বেগর মরে লেড়কা লক।" কিন্তু কই, বলুক দেখি ঘুণাক্ষরে এসব কথা বড়ে মিঞার কাছে—তখনি ঘোড়ার চাবুক হাতে তাড়া করবে, বলবে বেইমান।

ছোকরার দল জানে, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বুড়োর কাছ থেকে কেচ্ছা আদায় করতে হয়। তাই খিজির আবার বলল, তোরা সব চুপ কর্ তো। বড়ে মিঞা আগে সাচ্চা কথা বলুক, তারপরে সময় থাকলে না হয় কেচ্ছা শুনিস।

মিষ্ট বাক্যের ফল ফলল, মিঞা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল— খিজির লায়েকের মত কথা বলেছে।

আস্তাবল মহলে বড়ে মিঞার বুজরুক অর্থাৎ কিনা মন্ত্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে খ্যাতি ছিল। অনেকের বিশ্বাস, সে মন্ত্র পড়ে পরীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে। অনেকে নাকি দেখেছে। মিঞা নিজে কথনো অস্বীকার করেনি,

অনেকের মুখে নিজের কীর্তি শুনতে শুনতে এখন হয়তো বা নিজের গুণপনায় সত্যই বিশ্বাস করে। ছোকরার দল অনেক দিন ওর সাধ্যসাধনা করেছে, আজ ঠিক করেছে, যেমন করেই হোক বুড়োকে রাজী করিয়ে, কবে মরে যায় বুড়ো তার ঠিক কি, পরীর আবির্ভাব দেখে নেবে। তারা শুনেছে যে, পূর্ণিমা রাত পরী, জিন প্রভৃতির আবির্ভাবের অনুকূল, যেমন অনুকূল অমাবস্যা রাত ভূত পেত্নী মামদো ব্রহ্মদত্তি প্রভৃতির পক্ষে।

বুড়োকে আরো একটু তোয়াজ করবার উদ্দেশ্যে একজন বলে উঠল, বড়ে মিঞা, গোস্তর যা খুশবু বেরিয়েছে!

আর একজন বলল, তামাম শাজাহানাবাদে তোমার মত কেউ রসুই করতে পারে না।

প্রশংসা বাক্যগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে বুড়ো বলল--তবে!

এই তবে শব্দটার তাৎপর্য খুব স্পষ্ট নয়, ভাবটা যেন এই, তাছাড়া অন্য রকম আর কি সম্ভব।

কাদের বলে উঠল—তাই বলছি কিনা।

জানিস, আমার নানা বাদশা শাজাহাঁর খাস কাবাবচি ছিল। সকলেই বুঝল যে তা সম্ভব নয়, প্রায় একশ বছর শাজাহাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু পরীর গল্প আদায় করবার ইচ্ছা থাকলে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা চলে না।

এখনো বেগম সাহেবাদের হারেম থেকে বাঁদীরা এসে আমার কাছে রসুই শিখে যায়।

সবাই জানে এটি অসম্ভব। বেগম সাহেবাদের রসুইখানায় হাঁড়ি চড়ে না বললেই হয়। গোস্ত দূরে থাক, পোড়া রুটি কালেভদ্রে জোটে তো যথেষ্ট। এই তো সেদিন হারেম থেকে শাহাজাদীরা ক্ষুধার তাড়নায় শহরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষা মেগেছিল। উজীর সাহেব ফৌজ লাগিয়ে তাদের ভিতরে টেনে নিয়ে আসে। কে না জানে, কে না দেখেছে!

হ্যাঁ সবাই জানে, সবাই দেখেছে, এক ঐ বড়ে মিঞা বাদে। সে ঐ দেওয়ানী খাসের মত মোগল বাদশাহীর জৌলুসের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে।

খিজির বলল, বড়ে মিঞা গোস্ত হোক, ততক্ষণ তুমি একটা সাচ্চা গল্প বল, কেচ্ছায় আমার দরকার নাই।

হবে রে হবে, আগে পেট ভরে গোস্ত খেয়ে নে, তোদের জন্যেই তো পাকাচ্ছি, নইলে আমি কি একা এতখানি গোস্ত খাব?

বেশ তো, গোস্ত হতে থাকুক, গল্পও চলুক। তোমার হাতের গোস্ত খেলে কি আর জেগে থাকতে পারব—তখনই যে ঘুমিয়ে পড়ব।

বুড়ো এবারে খুব খুশি,বলল, আচ্ছা, তবে শোন্।

বুড়ো সাচ্চা গল্প শুরু করে, সবাই বেশ জমাট হয়ে বসে।

দুশমন নাদির শাকে দেখেছিলি তোরা? যখন তাকে আমরা বন্দী করে নিয়ে এসেছিলাম লাল কেল্লায়?

শ্রোতারা চুপ করে থাকে।

তা বটে, কি করে দেখবি তোরা, তখন তোদের জন্মই হয়নি যে। তা না দেখিস তো শুনেছিস দুশমন নাদির শা হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শার সঙ্গে লড়তে এসে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। তাকে সবাই মিলে বন্দী করে নিয়ে এলাম, মাসখানেক কয়েদ হয়ে থাকল লাহোরী দরজার উপরের ঘরটাতে। তারপরে আম-দরবারে বাদশার সামনে সাড়ে তিন হাত মেপে নাকে খৎ দিয়ে দেশে ফিরে যায়! কী ফুর্তিই না হয়েছিল তখন।

এই বলে বুড়ো হাঃ হাঃ শব্দে হেসে ওঠে। ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সে হাসির শব্দ বুকফাটা কান্নার মত শোনায়।

শ্রোতারা এ "সাচ্চা" গল্প হাজারবার শুনেছে, আজ নিয়ে হাজার একবার হল।

বড়ে, সে লড়াইয়ে তুমি গিয়েছিলে?

যাইনি! উজীর সাহেব ইতিমাদদ্দৌলা কোমারউদ্দিন খাঁ, ভকিল সাহেব নিজাম-উল-মূল্ক আসফ জা, আমীর উল উমরা মীর বকস সামসামউদ্দৌলা খাঁ দৌরান, হেদায়েতুল্লা মীর্জা আজিমাবাদী মেধ্রম খাঁ...

ছোকরার দল বাধা দিয়ে বলে, শেষের ও লোকটা কে?

কতক বিনয়, কতক লজ্জা, কতক গৌরবের সঙ্গে বলে—ঐ আমার আসল নাম কিনা। তোরা ভালবেসে বড়ে মিঞা বলিস বলিস, বলুক দেখি আর কেউ!

তাই বল বড়ে মিঞা, এতদিন ওরা আমাদের শুনিয়ে আসছে যে বাদশার হার হয়েছিল।

ওর সব হারামজাদা, ওদের কথা কেন শুনিস! আরে, বাদশাকে হারানো কি মুখের কথা। তোরা তো কেচ্ছায় একটা রুস্তমের নাম শুনেছিস, বাদশার ফৌজে এমন হাজার হাজার রুস্তম ছিল, অবশ্য তাদের মধ্যে আমি ছিলাম মাথায় সবচেয়ে উঁচু—আর গায়ে কি জোর ছিল, তলোয়ারের এক ঘায়ে হাতির গর্দান নামিয়ে দিতে পারতাম।

তারপরে একটু থেমে বলে, আজকের এই বুড়োটাকে দেখে সেদিনকার মেহের খাঁকে বিচার করিস না।

খিজির বলে, সেই রকমই শুনেছি চাচার কাছে।

বুড়ো বলে, খুব মনে আছে তোর চাচাকে, একদিন নিয়ে আয় না।

খিজিরের পক্ষে সে কাজটি একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ তার চাচা কোন কালেই ছিল না।

সবাই বলে, তারপরে কি হল বড়ে মিঞা ?

যে-যুদ্ধ সে কখনো করেনি, যে-যুদ্ধে বাদশার সম্পূর্ণ হার হয়েছিল, সেই "যুদ্ধ জয়ের" আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠে বড়ে মিঞা আবার বলতে শুরু করে— বন্দী নাদির শার ফৌজ আর হাতি ঘোড়ায় ভরে গেল শাহাজানাবাদ, রাস্তায় ভিড় ঠেলে চলে কার সাধ্য ! তা ছাড়া তারা এমনি ভয় পেয়েছিল যে, যাকে দেখে তাকেই কুর্নিশ করে। আর খোদ নাদির শা তো নকড়খানা থেকে কুর্নিশ করতে করতে দেওয়ানী-আমে বাদশার পায়ের তলায় গিয়ে মাথা রাখল, বলল, শাহেনশা, তামাম হিন্দুস্থানের মালিক, এখন এই গোলামকে রাখতে হয় রাখো, মারতে হয় মারো।

তখন বাদশা বুঝি তাকে কোতল করবার হুকুম দিল ?

আরে ছি ছি, আমাদের বাদশা তেমন নয়, তার দিলখানা যমুনা নদীর চেয়েও চওড়া।. বাদশা কি বলল জানিস, বলল, আরে ভাই এসো পাশে বসো, তুমি ভুল করেছ বলে কি আমিও ভুল করব !

তখন নাদির শা রুমাল দিয়ে দুই হাত বেঁধে সামনে দাঁড়াল। বাদশা মহম্মদ শা বাঁধন খুলে দিয়ে পাশে বসাল তাকে। নাদির শা তার আমীর ওমরাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখে নাও বাদশা কাকে বলে !

তারপরে, তারপরে ? সবাই কৃত্রিম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তারপরে ?

তারপরে মাসখানেক থাকবার পরে বাদশা বিদায় করে দিল নাদির শাকে। সঙ্গে দিল পথে চড়বার জন্যে হাতি ঘোড়া উট, পথ খরচের জন্যে বস্তা বোঝাই মোহর আর জহরৎ। আর তার ফৌজ তো একদম নিকেশ হয়ে গিয়েছিল, তাই দিল কিছু বাদশাহী ফৌজ। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হয়ে যায়, হেসে মরে তামাম হিন্দুস্থান।

ছোকরার দল গোস্তর সুগন্ধর সঙ্গে মিলিয়ে "সাচ্চা" কাহিনীটা পরিপাক করবার চেষ্টা করে এমন সময়ে মিঞা আবার বলে ওঠে, কিন্তু ওরা এমনি

বেইমান যে, দেশে ফিরে গিয়ে রটাল, লড়াই ফতে করে ফিরেছে—বাদশার দেওয়া হাতি ঘোড়া জহরৎ আর লোকজন দেখিয়ে বলল, এই দেখ, সব কেড়ে এনেছি।

কি নিমকহারাম!

আর শুধু কি তাই! মুন্সীদের ইনাম দিয়ে কেতাব লেখাল, মহম্মদ শার হার হয়েছে। আর বলব কি শরমের কথা বাপজান, এদেশের অনেক লোকেও এখন সেই কথা বিশ্বাস করে। তারা "সাচ্চা" আর "কেচ্ছায়" তফাৎ বুঝতে পারে না। বেওকুফ! বেওকুফ!

আচ্ছা বড়ে মিঞা, অনেকে যে বলে, মহম্মদ শাকে হারিয়ে নাদির শা তখ্‌ত-তাউশ নিয়ে গিয়েছে?

বলে অনেকে! না? কি বলিস, বলে তো ঠিক শুনেছিস?

শুনেছি বইকি।

আমরাও চাই যে লোকে ঐ কথা বিশ্বাস করুক।

"আমরা" বলতে কারা তা আর ছোকরার দল জিজ্ঞাসা করল না, কেননা বড়ে মিঞার মুখে "আমরা" বলতে যে আমীর উল ওমরা, মীর বক্সি, খানসামান প্রভৃতি তা ওরা এতদিনে বুঝে নিয়েছে।

তোরা তো আমার আপন লোক, তোদের বলতে আর বাধা কি, শুনবি তো কাছে আয়!

সকলে ঘেঁষে বসল, তখন চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে গলার স্বর যতদূর সম্ভব নিচু করে বুড়ো বলল—লুকিয়ে রাখা হয়েছে, দেওয়ানী খাসের নীচে যে তয়খানা আছে সেখানে তখ্‌ত-তাউশ আর বাদশাহী হীরে জহরৎ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

কেউ কেউ শুধায়, কেন?

সে কথা বড় হয়ে বুঝবি। কিন্তু আমার মুখ থেকে যা শুনলি তা যেন আর কাউকে বলিসনে, আল্লার কসম।

গল্প যতই "সাচ্চা" হোক তারও একটা শেষ আছে, কাজেই শেষ হল বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কথা, বাজে "কেচ্ছা" সে বলে না।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, নাদির শার আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাসের সঙ্গে বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কাহিনীর কিছু প্রভেদ আছে। তা থাক, ইতিহাস ও বড়ে মিঞা কাউকেই আমরা নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারব না—তাই

দুটোই মেনে নিলাম। তবু ইতিহাসের মর্যাদা যখন বড়ে মিঞার চেয়ে কিছু বেশি, ইতিহাসের অনুকূলে দুটো কথা সেরে নিই।

বড়ে মিঞার দুনিয়া লালকেল্লার আস্তাবল। ঐ মহল্লায় বাদশাহী ঘোড়া নিয়ে কেটেছে তার সারাজীবন, তার বাপ-নানাও জন্মেছে মরেছে এখানে। তাকে নিয়ে তিন পুরুষ কেটেছে লালকেল্লায় আস্তাবলে। ইতিমধ্যে যে বাদশাহীর গোধূলিবেলা এসেছে তা কি খোঁজ রাখে বড়ে মিঞা! সেদিন যখন বিজয়ী নাদির শা মহাসমারোহে লালকেল্লায় প্রবেশ করল, বাদশা মহম্মদ শা তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসাল পাশের আসনটিতে আম দরবারে, নাদির শার নামে জুমা মসজিদে খুৎবা উচ্চারিত হল, মুদ্রায় ছাপা হল তার নাম—নাদির শার হুকুমে দিল্লীর মাটি ভেসে গেল নিরীহের রক্তে, এ সবের প্রকৃত তাৎপর্য ঢোকেনি তার মনে। সে ধরে নিয়েছে যে বাদশাহী অচল অটল—ঐটুকু ধরে নিয়ে বাকি সব ঘটনাকে সাজিয়েছে, কাজেই নাদির শা যে বিজয়ী আর দিল্লীর বাদশা যে পরাজিত কেমন করে বুঝবে সে। বেশ একটি স্বপ্ন গড়ে নিয়ে বাস করছিল সে। সেই স্বপ্নজগতের উপরে প্রথম ধাক্কা এলে যখন তার আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর তলব হল। নাদির শার লুটের মাল বহনের জন্য তিনশ হাতি, দশ হাজার ঘোড়া আবশ্যক। এই হাতি ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে—যুদ্ধে মরেছে অনেক। তাই শেষ পর্যন্ত লালকেল্লার বাদশাহী আস্তাবলে হাত বাড়াতে হল। কিন্তু কাজটা অত সহজে হয়নি। বড়ে মিঞা তার সাগরেদদের নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। খবর শুনে উজীর বলল, এ-ও তো মন্দ মজা নয়, নাদির শার সঙ্গে লড়তে হবে, আবার ঘরের লোকের সঙ্গেও। অবশেষে দিতেই হল ঘোড়াগুলো। তখন সেই শূন্য আস্তাবলের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম তার মনে হল, কোথাও একটা গোল ঘটেছে। সেই থেকে শূন্য আস্তাবলের হেড সহিস সেজে বসে রয়েছে সে। বাদশাহীতে যেটুকু নাজাই হয়েছে সেটুকু পূরণ করে নিয়েছে স্বপ্ন দিয়ে।

বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কাহিনী শুনে ছোকরার দল কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করে উঠল, বলল, মিঞা তুমি ছিলে তাই "সাচ্চা" ঘটনা জানতে পারলাম, বেইমানরা কত কি ঝুটা কথা বলে!

বুড়োর মুখ খুশিতে ভরে ওঠে।

তখন ওরা বলে, বড়ে মিঞা আজ তো আসমান ভরা জোছনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মিঞা, পরী দেখাও।

আগেই বলেছি যে, ছোকরা মহলে বুজরুক বলে বা জ্ঞানী পুরুষ অর্থাৎ যারা মন্ত্রতন্ত্র জানে, আর মন্ত্রতন্ত্রযোগে নানা রকম অলৌকিক কাণ্ড করতে পারে— একটা খ্যাতি ছিল বুড়োর। সে নাকি জ্যোৎস্না রাতে মন্ত্র পড়ে পরী নামাতে পারে—কতদিন কতজনকে দেখিয়েছে। ছেলেরা তাই তাকে চেপে ধরল।

মিঞা প্রথমটা উড়িয়ে দিল, বলল, দূর পাগল, মানুষে কি পরী দেখাতে পারে?

মানুষে পারে কিনা জানি না, তবে তোমার মত বুজরুকের কি অসাধ্য।

তুমি কতজনকে দেখিয়েছ।

দূর, দূর, ওসব মিথ্যা কথা।

কিন্তু ছোকরার দল আজ নাছোড়বান্দা।

খোশামোদ মিথ্যা হলেও মধুর, আর মিথ্যা না হলে খোশামোদ বলছে কেন। অবশেষে জয় হল মধুর মিথ্যার।

বুড়ো পরী দেখাতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু শতবার শতজনের মুখে শুনতে শুনতে, পারে বলেই বিশ্বাস করে ফেলেছে। তাছাড়া অনেক রকম মন্তর-তন্তর শিখেছে সে, তার মধ্যে সত্যই একটা ছিল পরীর মন্তর। কখনো পরীক্ষা করে দেখেনি—ভাবল, আজ একবার পরীক্ষা করে দেখাই যাক না কি হয়।

আচ্ছা একটু সবুর কর, আগে গোস্তর হাঁড়িটা নামিয়ে নিই।

এই বলে গোস্তর হাঁড়ি নামিয়ে রেখে, হাত পা ধুয়ে শুচিশুদ্ধ হয়ে হাঁটু ভেঙে বসল সে—আর তারপর মুদ্রিত চক্ষুতে তন্ময় হয়ে বিড়বিড় করে শুরু করল মন্ত্রোচ্চারণ, ছেলের দল নিশ্বাস রোধ করে নির্বাক বসে রইল—কখন পরী দেখা দেয়।

মিনিট দশেক না যেতেই চমকে উঠল ছেলের দল। দরজার কাছে ওরা কে? সাত আট জন তরুণী, মাথার উপর থেকে পা পর্যন্ত ঝুলছে ওড়না, ঐগুলোই কি ডানা? ছোট্ট পায়ে জরির কাজ করা মখমলের ছোট্ট জুতো, ভুরুর কালোতে, ঠোঁটের লালে, গালের নবনী আভা সাদাতে, সে এক আশ্চর্য সঙ্গত। মানুষ কখনো এত সুন্দর হয় না—নিশ্চয় পরী।

ছোকরার দল বিস্মিত ভীত।

সবচেয়ে বিস্মিত আর ভীত বড়ে মিঞা।

তবে কি সত্যি সে পরী নামাতে পারে!

পরীর দল মুহূর্ত-কাল বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে পড়ল ঘরে, আর তারপরে ঘরের লোকজনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মাংসের হাঁড়িটা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, আগমন ও নির্গমন দুই-ই ভূমিকা-বর্জিত। ওদের কারো সাহস হল না, সাধ্য হল না যে নিষেধ করে, বাধা দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের সম্বিৎ হল। কোথায় গেল পরীর দল! খিড়ির দরজার কাছে বসেছিল, তার মনে হল ওরা যেন হারেমের দিকে গেল। মিঞা বলে উঠল, পরীর আসা যাওয়া লক্ষ্য করতে নেই, চোখ নষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাক্।

তারপর বলল, তোরা তো আজকালকার ছেলে, কিছু বিশ্বাস করতে চাস না, এখন নিজের চোখে দেখলি তো মন্ত্র পড়ে পরী নামানো যায়।

পরী যদি,গোস্তর হাঁড়ি নিয়ে গেল কেন?

যাবেই তো, জোর করে ওদের নামানোয় রাগ করেছে—সাজা দিয়ে গেল।

তারপরে বললে, যা এখন ঘরে গিয়ে খা গে।

ছেলেরা যার যার ঘরে রওনা হল, সকলেই জানে ব্যাপারটা কি ঘটল। ওরা পরীর মতই বটে তবে পরী নয়, বাদশার হারেমের বুভুক্ষু উপোসী শাহাজাদীর দল। কিন্তু কারো সাহস নাই কথাটা উচ্চারণ করে। বড়ে মিঞা তখনি ঘোড়ার চাবুক নিয়ে তাড়া করবে—নিমকহারাম, বেওকুফ, বাদশার হারেমে বুভুক্ষু শাহাজাদী। বলবে, কোথায় শিখলি এসব ঝুটা কথা বেইমানের দল। ওরা পরী, পরী, একশবার পরী।*

"Shakir Khan, the Diwan of Prince Ali Gauhar, narrates how when he took a mug of broth from the Pauper Charity Kitchen to the prince for official inspection, the prince asked him to give it to the palace ladies, as no fire had been kindled in the harem kitchen for three days! We read in the Court Chronicle of his reign, how one day the princesses could bear starvation no longer, and in frantic disregard of Parda rushed out of the Palace for the city, but the fort gates being closed they sat down in the men's quarters for a day and a night, after which they were persuaded to go back to their rooms" Fall of the Mughal Empire, page 26-27. Vol. 1, 1st. Ed, by Jadunath Sarkar.

কোতলে আম

চাঁদনীচকের যে দিকটায় সোনেরী মসজিদ তার মুখোমুখি একটা তেতালা বাড়ির চিলে কোঠার ধারে ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে নূরবাঈ তাকিয়ে আছে চাঁদনীচকের দিকে, চোখে পড়ে জহুরী বাজার, মেওয়া বাজার, জুমা মসজিদ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে চোখে পড়ে কিলা-ই মুবারক বা লালকেল্লা। কিন্তু ঘাড় ফিরোবার বা ছাদ থেকে নামবার কোন লক্ষণ নাই নূরবাঈ-এর—সে যেন কোন্ জাদুতে ছাদের আর একটি স্তম্ভে পরিণত হয়ে গিয়েছে। দিল্লীর চৈত্র মাসের সূর্য পায়ে পায়ে আকাশের মধ্যস্থলে উঠেছে, চিলেকোঠা, আলসে, থামগুলো প্রহরে প্রহরে ছায়া স্থানান্তর করেছে—কিন্তু সেই যে শীতের আমেজ লাগা ভোর বেলায় বাঁ হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে নূরবাঈ দাঁড়িয়েছিল—মধ্যাহ্ন গতে এখনো সেই অবস্থায় আছে। না চৈত্র মাসের রোদ, না হতাহতের আর্তনাদ, না আক্রান্তের আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা কিছুতেই তার সম্বিত ফেরেনি। ঐ যে লালটুপিওলা ইরানী কিজিলবাস সৈন্যের দল এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালিয়ে বিভ্রান্ত জনতাকে কচু-কাটা করছে, ঐ যে সামরিক পুলিস নশকচির দল বন্দুক চালিয়ে ধড়াধড় মানুষগুলোকে ফেলে দিচ্ছে—ঐ যে রক্তের স্রোতে চাঁদনীচকের নহর রাঙা হয়ে উঠেছে, এ সব দৃশ্য তার দেখবার কথা, কারণ চোখের মণিতে দৃশ্যমান বস্তুর ছায়া না পড়ে যায় না, কিন্তু তার অর্থ মগজে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিনা সন্দেহ, পৌঁছলে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে পারে না, সহ্য করা দূরে থাকুক।

বাঁদী বারে বারে গোসল আর খানার তাগিদ নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছে, মালিকার স্থাণু মূর্তি দেখে ডাকতে সাহস করেনি। শুধু স্থাণুতায় হয়তো সে ভয় পেত না কিন্তু মালিকার মুখে চোখে এমন একটা উৎকট উল্লাসের আভা মাখানো ছিল যে বাঁদী একেবারে হতবাক হয়ে গেল। মালিকার কাছে অনেক দিন আছে সে, মালিকা যে আর দশ জন মানুষের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর এমন তো কথনো মনে হয়নি, বরঞ্চ কোন কোন ঘটনায় বুঝতে পেরেছে তার মনটা বড়ই কোমল। একবার গুলতিতে আহত একটা কবুতর ছাদের উপরে এসে পড়ে, সেটাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে কি পরিশ্রম না করেছিল নূরবাঈ। তারপরে যতদিন জীবিত ছিল পাখীটা ছিল তার সবচেয়ে পেয়ারের। আর একদিনের কথা মনে পড়ল বাঁদীর, একটা বেগানা কুকুরকে প্রহার করবার অপরাধে কী না

তিরস্কৃত হয়েছিল মালিকার কাছে। মন তো তার কঠিন নয়—তবে এমন তন্ময়ভাবে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখাই বা কেন, আর মুখে চোখেই বা ফুটে ওঠে কেন এমন উৎকট আনন্দ! কিছু বুঝতে না পেরে হাত উল্টে দুর্বোধ্যতার একটা মুদ্রা করে নেমে যায় ছাদ থেকে সে। অনেকবার তার ইচ্ছা হয়েছে মালিকার মাথায় একটা ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—রোদ সহ্য করতে পারে না তার মালিকা, কতবার সামান্য একটু রোদে যাতায়াত করে সারাদিন মাথাধরায় ভুগেছে। কিন্তু ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে পথের দৃশ্য না দেখে উপায় নেই। এমনিতেই কান বিদীর্ণ হয়ে গেল, তার উপরে আবার চোখের দেখা! অনেকবার ভেবেছে পালিয়ে যাবে কিন্তু যাবে কোথায়; বাড়ির বাইরে পা দেওয়া মাত্র হয় বন্দুকের গুলীতে নয় তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারাতে হবে। আর প্রাণে যদি বা বেঁচে যায়, এমন দুর্দশাও হতে পারে যার চেয়ে প্রাণে মরা ভালো। সব দৃশ্যেরই খসড়া দেখতে পেয়েছে ছাদের উপর থেকে, জানলার ফাঁক দিয়ে। চার পাশের বাড়ির নারীর করুণ মিনতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে পুরুষের আর্তনাদ—মেয়েদের চোখের জল আর পুরুষের দেহের রক্ত মিশে প্রবাহিত হয়েছে, কোন্‌টার পরিমাণ বেশি অনুমান করা সহজ নয়। এবাড়িও বাদ যেত না, চাকর-বাকরদের রক্তের সঙ্গে মিশে বইত তার আর মালিকার চোখের জল। সে স্থির করে রেখেছিল ধরা পড়বে না ইরাণী খুনেদের হাতে।

তবে কি করবি শুধিয়েছিল নূরবাঈ!

কেন, অত বড় ইদারাটা আছে কেন?

লাফিয়ে পড়ে ডুবে মরবি?

আশ্চর্য হচ্ছ কেন মালিকা? খোঁজ নিয়ে দেখ বাড়িতে বাড়িতে এই ব্যাপার চলছে। পার তো একবার জল মেপে দেখ, চোখের জলে ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠেছে।

ধন্যি মেয়ে তুই।

আর তুমি কি করবে মালিকা?

নূরবাঈ ছোট একখানি ইস্পাহানি ছোরা দেখিয়ে বলল, চোখের জল এত সস্তা নয় বাঁদী।

তুমি কি লড়াই করবে নাকি খুনেগুলোর সঙ্গে?

যদিই বা করতাম ক্ষতি কি?

তার চেয়ে সহজ ইদারায় লাফিয়ে পড়া।

তারও চেয়ে সহজ নিজের বুকে বসিয়ে দেওয়া।

বিস্মিত বাঁদী বলে ওঠে, সে সাহস আছে তোমার মালিকা?

সাহস কি তোর একচেটিয়া না কি?

আনন্দিত বাঁদী নত হয়ে তার জরির কাজকরা জুতো জোড়া চুম্বন করে।

কিন্তু ওদের সঙ্কল্প কাযে পরিণত করবার প্রয়োজন হল না। সকাল বেলাতেই একদল ইরাণী নশকচি পাহারা বসল দরজার সম্মুখে। এ ক'দিনের মধ্যেই সবাই বুঝতে পেরেছিল যে নূরবাঈ ইরাণের বাদশার মুহব্বতী পিয়ারী।

২

এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবারে একটু পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

১৭৩৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী কর্ণালের যুদ্ধে নাদির শা দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহকে পরাজিত করে। তারপরে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিজ শিবিরে নিয়ে এসে বন্দী করে ফেলে অভীষ্টমত সন্ধিপত্র লিখিয়ে নেয়। বাদশার সঙ্গে উজীর, ভকিল, আমীর ওমরাহ সকলে বন্দী হয়েছিল, বাদশার হয়ে কথা বলতে পারে এমন কোন লোক বাইরে ছিল না। তারপরে বাদশার নিমন্ত্রণে নাদির শা সসৈন্যে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হয়ে লালকেল্লায় আতিথ্য গ্রহণ করে। এই ঘটনা থেকে কূটনীতিক সৌজন্যটুকু বাদ দিলে দাঁড়ায় যে নাদির শা দিল্লীর বাদশাকে বন্দী করে নিয়ে এসে দিল্লী ও লালকেল্লা অধিকার করল। নাদির শা লালকেল্লায় অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে হিন্দুস্থানের শাহান শাহ বলে ঘোষণা করল, মসজিদে তার নামে খুৎবা পড়া হল, মুদ্রায় তার নাম ছাপা হল—আর তার ইরাণী, তুরাণী, কুর্দ, মঙ্গোল, আফগান সৈন্যদল শাজাহানাবাদের নানা স্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসল। পুরাতন বাদশাহী কর্মচারীরাই শাসন চালাতে লাগল নূতন শাহান শার নামে।

মহম্মদ শা ও নাদির শার দিল্লী প্রবেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যা লিখেছেন তার ভাবার্থ অনুবাদ করে দিচ্ছি, পড়লেই তৎকালীন অবস্থাটি বেশ বুঝতে পারা যাবে।

বাবর ও আকবরের অধঃপতিত উত্তরপুরুষ তখৎ-ই-রবানে বাহিত হয়ে নীরবে, গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করল; না বাজল নৌবৎ, না উড়ল নিশান; ইশাক খাঁ, বহরজ খাঁ, জাবিদ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন ওমরাহ ছিল তাঁর সঙ্গে। পরদিন প্রাতে বিজয়ী শাহ ধূসর রঙের অশ্বে প্রবেশ করল দিল্লীতে।

শালিমারবাগ থেকে লালকেল্লার দরবাজা পর্যন্ত পথের দুইদিকে মোতায়েন তার সৈন্যশ্রেণী। বাদশা বিজয়ী বীরকে অভার্থনা করে নিল, তার পা রাখবার জন্যে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল সোনা জহরতে কাজ করা মহামূল্য মসলন্দ। নাদির শা দেওয়ানী খাসের নিকটবর্তী শাজাহানের প্রাসাদ কক্ষ অধিকার করল—আর হিন্দুস্থানের বাদশা আসাদ বুরুজের দেউড়ীর নিকটে একটি কক্ষে আশ্রয় নিল। শাহ হল বাদশার অতিথি, স্বহস্তে খানা পরিবেশন করল বাদশা। শাহের সৈন্যদলের কতক লালকেল্লার চারদিকে বেষ্টন করে রইল, কতক রইল যমুনার চরে—আর কতক রইল শহরের নানা স্থানে।

৩

দিল্লী অধিকার করে বাদশার আতিথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাদির শা এতটা পথ আসেনি। হিন্দুস্থানের বাদশার ঐশ্বর্যের অলৌকিক খ্যাতি তাকে টেনে এনেছে এই দীর্ঘ পথ। এবারে লালকেল্লায় বেশ কায়েম হয়ে বসে সেই ঐশ্বর্যের কতটা কি ভাবে করায়ত্ত করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেল ইরাণের শাহ। এখন হিন্দুস্থানের বাদশা, আমীর ওমরাহ থেকে সাধারণ প্রজা সকলের ধনদৌলতের উপরেই তার বিজয়ীর অধিকার। নাদির শা তার উজীর আর ওমরাহদের ধনদৌলতখানা স্বমারী করবার নির্দেশ দিল, বাদশা দেবে এত, আমীর ওমরাহগণ দেবে এত, আর দিল্লীর নাগরিকগণ দেবে এত—অর্থাৎ মোট এত টাকা চাই তার। শাহের পরওয়ানা নিয়ে দিকে দিকে কোটাল বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে রাতের বেলা তার মনোরঞ্জন করবার জন্যে দেওয়ানী খাসে জলসার ব্যবস্থা করে খোদ বাদশাহ। এ না করে উপায় নেই, কতকটা প্রথা রক্ষা, কতকটা সৌজন্য। বাদশাহের নিজের মনোরঞ্জনের জন্য যে-সব নর্তকী আছে তাদের উপরেই ভার।

নাদির শার বড় ভাল লেগে যায় নূরবাঈ নামে একটি নর্তকীকে। নূর-বাঈয়ের তেমন কোন নামডাক ছিল না, দলের আর পাঁচজনের মত একজন মাত্র। কিন্তু এখন নাদির শার চোখে পড়ে যেতেই মুখে মুখে তার নাম পড়ল ছড়িয়ে, সবাই বলতে শুরু করল নূরবাঈ নূরবাঈ। তার বয়স অল্পই, রূপ যৌবন শিক্ষা সহবৎ সমস্তই আছে—এ সব তো আরো অনেকের আছে, আসলে যে গুণে শাহকে মুগ্ধ করল তা হচ্ছে তার বাকচাতুর্য। কথার পিঠে লাগসই কথা বলতে তার জুড়ি নেই। যে বিজয়ী বীরের সম্মুখে কেউ কথা বলতে সাহস পায়

না, যার আধখানি কথায় লোকের মুণ্ড খসে পড়ে, কথার লীলা থেকে সে হতভাগা বঞ্চিত। ক্ষুধা থাকে খাদ্য জুটতে চায় না। এমন একটি সুন্দরী তরুণীর সুর্মা-কালো চোখ আর তাম্বুল-রাঙা ওষ্ঠাধর লালে কালোয় সুধা বিষে মিশিয়ে যদি সেই সুধা নির্ভয়ে বর্ষণ করে—তবে তৃপ্ত হয় সেই কথার ক্ষুধা। হাসির রূপোর তবকে মুড়ে রাঙা রাঙা ঠোঁটের প্রবালের মিনে করা কথাগুলো যখন শাহের দিকে নিক্ষেপ করে তখন দিগ্বিজয়ী বীর একদম মস্তানা হয়ে যায়—বলে পিয়ারী তুমি তো ইরাণের বুলবুল, এখানে এলে কেন?

সে মুখে চোখে বিদ্যুৎ চূর্ণ ছড়িয়ে বলে—একদিন ইরাণের সিংহ আসবে এদেশে, আমি এসেছি তারই নকীব হবে।

এ কেমন কথা পিয়ারী! সিংহের নকীব বুলবুল!

ঝঙ্কৃত বলয়ের উপর হাজার ঝাড়ের রোশনাই কুড়িয়ে নিয়ে সেলাম করে সে বলে, শাহান শাহ হিন্দুস্থানী থাকলে দেখতে পাবেন সিংহগর্জন মেঘের নকীব এখানে চাতক।

বাহা, বাহা বলে ওঠে নাদির শা, শুধায় এমন কথা শিখলে কোথা থেকে মেরা জান।

প্রশ্নটা উল্টে দিয়ে সে বলে, ইরাণের বুলবুল গান শেখে কোথা থেকে খোদাবন্দ!

গান আছে ইরাণের বাতাসে।

কথা ভাসে হিন্দুস্থানের আকাশে।

তবে তো ইরাণের জিত, কথার চেয়ে গান বড়।

তবে হিন্দুস্থানের বুলবুলকে ইরাণে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কেন খোদাবন্দ!

নাদির শা দেখল কথা চালনার চেয়ে অস্ত্র চালনা সহজ। তাই সে কথা কাটাকাটির পথ পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী উজীরকে বলল—নূর বিবি কো চার হাজার মোহর ইনাম দেনা।

নূরবাঈ আজানুনত হয়ে সেলাম করা উপলক্ষে রূপ যৌবনে দেহকান্তিতে মুঠো মুঠো হীরে জহরৎ ছড়িয়ে বলল, খোদাবন্দ—দুনিয়া কা মালিক।

এখন রাতের বেলা জলসা না হলে আর নাদির শার চলে না, আর জলসা মানেই নূরবাঈ-এর নাচ আর মধুবর্ষী কথা।

দ্বিতীয় দিনে শাহ হুকুম দিল নূরবাঈকে তৌল করে মোহর দিতে হবে। আদেশটা অন্য সব নর্তকীদের কানে বিষ বর্ষণ করল, তবে তারা দেখাল যে সান্ত্বনাও আছে—ছুকরির ওজন খুব বেশী নয়।

অবশেষে একদিন নাদির শা আদেশ করল যে বিবি তোমাকে আমার হারেমভুক্ত হয়ে ইরাণে যেতে হবে।

আদেশ শুনে ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেলেও মুখ শুকাল না, হেসে উত্তর দিল, খোদাবন্দ আপনি খোদারও উপরে, মরবার আগেই আমার বেহস্তবাসের হুকুম দিলেন।

নূরবাঈ বাসায় ফিরে এসে বাঁদীকে হুকুম করল—আমিনা তুই এখনি গিয়ে নাসের খাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমিনা অনেকদিন আছে, হাসি ঠাট্টা করবার অধিকার অর্জন করেছে, বলল, আবার তাকে কেন, ইরাণে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বুঝি!

নূরবাঈ বিরক্ত হয়ে বলল, সে তুই বুঝবিনে, বেয়াদপি করিসনে, শিগ্‌গির যা।

শিগ্‌গির না হয় গেলাম, কিন্তু পাহাড়গঞ্জ তো কাছে নয়, ফিরতে দেরি হবে।

দেরি হলে চলবে না, তাঞ্জামে করে যা।

আজ যে বড় তাড়া দেখছি মালিকা, কিন্তু সে এলে হয়!

নিশ্চয়ই আসবে, বলিস বড় বিপদ।

আমিনা বিদায় হয়ে গেলে গালে হাত দিয়ে সে বসে রইল জানলার ধারে—ওখান দিয়ে দেখা যায় পাহাড়গঞ্জে যাতায়াতের পথ।

৪

বাঁদী বিদায় হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে চমকে উঠে নিজেকে জিজ্ঞাসা করল নূরবাঈ—হঠাৎ নাসির খাঁকে ডাকতে পাঠাল কেন? এ কি নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরবার চেষ্টা? কাষ্ঠখণ্ড হলেও বা চলত। তখনি তার মনে পড়ল কাষ্ঠখণ্ড কেন, নাসির খাঁ তো ছিল লাল পান্‌সী, কতকাল অপেক্ষা করেছে তার ঘাটে, নূরবাঈ চড়বে আশায়। এতকাল যাকে উপেক্ষা করেছে হঠাৎ আজ তাকে মনে পড়তে গেল? নাদির শার প্রসারিত বাহু থেকে যদি তাকে উদ্ধার করতে পারে! তখনি আবার পান্‌সীর উপমা সূত্রে মনে পড়ল সংসারের অভ্যস্ত নদীপ্রবাহে পান্‌সীর অমিত কার্যকারিতা আছে সত্য কিন্তু এ যে নাদির শাহী খেয়ালের উন্মত্ত দরিয়া! শুধুই কি খেয়াল! দিগ্বিজয়ীর চোখে মুখে যে লোভের ছটা দেখেছে তার অর্থ বুঝতে ভুল হয়নি তার, দিগ্বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণে তার যে নৈতিক আপত্তি ছিল তা নয়, আদৌ নয়, কারণ স্ত্রীপুরুষের

সম্বন্ধটাকে নৈতিক মানে বিচার করতে কখনো শেখেনি সে, ও বস্তু যে নৈতিক মানে বিচারের যোগ্য সে ধারণাই তার ছিল না। না, তা নয়, কেমন যেন জুগুপ্‌সা জমে গিয়েছে ঐ দিগ্বিজয়ী লোকটার উপরে। তার প্রতি নাদির শার স্নেহ অনুকম্পা অনুগ্রহ বদান্যতার অন্ত নেই, কিন্তু যতই দিন গিয়েছে লোকটার বীভৎস ভিতরটা বাইরের কুৎসিত রূপে চোখে পড়েছে নূরবাঈ-এর। সে ভেবেছে লোকটার বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু বীর নয় সে। কী বীভৎস হাসি—সমস্তটা মাঢ়ি বেরিয়ে পড়ে। হাত দুখানা কী রোমশ আর দেহের তুলনায় স্থূল! নাঃ, এ বীরের বাহু নয়। ওর হারেমে যাওয়া মানে ঐ বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দেওয়া! ভাববামাত্র গা ঘিন ঘিন করে ওঠে তার। কিন্তু ভেবে পায় না হিন্দুস্থান-জয়ী ঐ বাহুর আলিঙ্গনপাশ থেকে উদ্ধার পাবে কি করে? তার পরে ভাবে—সে ভাবনা তো আমার নয়, নাসির খাঁর।

কি বাঈজী, আজ অসময়ে হঠাৎ গোলামকে মনে পড়ল কেন? ইরাণে যাওয়ার জন্যে তাঞ্জাম গড়তে হবে, না হাতীর ফরমাশ দিতে হবে?

আরে, খাঁ সাহেব যে, এসো এসো। তা ভাই তাঞ্জাম কি হাতীর দরকার হলে কি আর তোমাকে স্মরণ করতাম—শাহান শা নিজেই জোগাতেন।

তাই তো ভাবছি আমাকে আবার কেন!

পরিহাসের সুর পরিত্যাগ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে নূরবাঈ বলল, খাঁ সাহেব, ঐ ইরাণী দস্যুটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

আরে চুপ, চুপ! কে কোথা শুনবে, আমাদের দুজনেরই শির যাবে।

সে-ও ভাল।

তা বটে, তবে তোমার জন্যে আমার শির যাবে কেন?

তুমি কি আমাকে ভালবাস না?

সেই রকমই তো ভাবতাম—কিন্তু তোমার মনের ভাব যে অন্য রকম।

আসল কথা তো আজ জানতে পারলে।

বিপদে পড়ে?

বিপদেই তো ভালবাসার পরীক্ষা।

বেশ, খোদার শপথ করে বল।

তাই বলছি।

এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলল নূরবাঈ। নাসির খাঁর প্রতি তার মনোভাব যেমনি হোক তাকে ভালবাসা বলা যায় না। কাউকে সে কখনো যথার্থ

ভালবাসেনি, ভালবাসবার ধাতুতে সে গঠিত হয়নি। কিন্তু আজ বিপদে পড়ে ভালবাসা কবুল করল—এ কবুল নিতান্তই সঙ্কটের, মনের নয়।

এবারে নাসির খাঁ বলল—এ যে ঘোরতর সঙ্কটে ফেললে বাঈজী, নাদির শার কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করি কি উপায়ে?

চল না কেন বাইরে পালিয়ে যাই!

হিন্দুস্থানের বাইরে কোথায় যাব?

চল না কেন নেপালে চলে যাই।

তা যেতে হলেও তো অর্ধেক হিন্দুস্থান পেরিয়ে যেতে হবে—ইরাণী ফৌজের পাহারা এড়াবে কেমন করে?

নূরবাঈ এ প্রস্তাবের দুরূহতা জানত, জানত যে কোথাও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সে কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়ল। অবলা নারীর চোখের জল নাসির খাঁর বীর হৃদয় বিচলিত করে তুলল—সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—নূরবাঈ, একদিকে হিন্দুস্থান-জয়ী শাহান শা নাদির শা—আর একদিকে পাহাড়গঞ্জ এলাকার কোটাল নাসির খাঁ পঞ্চাশ ঘোড়ার মনসবদার। খুব সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা! কি বলো?

কেন তোমার দিকে কি আল্লা নাই?

যার তলোয়ারের জোর বেশী মনে হয় আল্লা তার দিকে।

কেন তোমার দিকে কি ভালবাসা নাই?

যার টাকার থলি বেশী লম্বা মনে হয় ভালবাসা তার দিকে।

কেন তোমার দিকে আমি নাই?

পিয়ারী তুমি যে কার দিকে তা যদি সত্যি বুঝতাম!

তবে এই প্রমাণ নাও—বলে ভূলুণ্ঠিতা বিদ্যুল্লতা উঠে নাসির খাঁর গলা জড়িয়ে ধরে দুই গালে চুম্বন করল।

এই কি সব? শুধাল নাসির খাঁ।

না—এ শুধু আগাম।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বলল—যথা লাভ।

আবার দীর্ঘ নিশ্বাস কেন!

পরিণাম চিন্তা করে।

উদ্বিগ্ন নূরবাঈ শুধাল, তুমি কি করতে চাও? লড়াই নাকি?

লড়াই তো হয় ফৌজে ফৌজে। আমার ফৌজ কোথায়?

তবে?

আমি করতে চাই বিদ্রোহ।

তারই বা ফৌজ কোথায়?

বিদ্রোহের একদিকে ফৌজ আর একদিকে—

নিশ্বাস রোধ করে নূরবাঈ জিজ্ঞাসা করে, আর এক দিকে?

রাজ্যের তামাম আদমি—রহিম, খলিল, হরবক্স, মাধো সিং, তুমি, আমি সবাই।

এ যে কচুকাটা হবে।

কত কাটবে! বিবি, হিসাব করে প্রেম আর বিদ্রোহ হয় না। কোনটাই তুমি বুঝবে না, যাক, এখন আমি চললাম।

আবার কবে আসবে?

বেঁচে থাকলে দুই-চার দিনের মধ্যে দেখা হবে।

মরবার আশঙ্কা আছে নাকি?

আছে বইকি! ঐ যে বললে কচুকাটা!

তবে না হয় থাক।

তাঞ্জাম গড়বার ফরমাশ দিই।

তাহলে এসো—কিন্তু একটু সাবধানে থেকো।

নাসির খাঁ চলে গেলে অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। এ আবার কি হতে চলল? না হয় যেতই সে ইরাণে। সে তো শুনেছে যে তিন পুরুষ আগে ইরাণ থেকেই তারা এসেছিল হিন্দুস্থানে। সেখানে ফিরে গেলে এমন কি ক্ষতি হত? আর শাহান শার হারেম? কারো না কারো হারেমে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ যখন অনিবার্য, যেতই বা নাদির শার হারেমে। কিন্তু তখনি মনে পড়ে যায় নাদির শার চেহারা, কথা বলতে বেরিয়ে পড়ে মাঢ়ি, চোখ দুটো ছোট, নাকটা বাজপাখী, ঠোঁট দুটো স্থূল, বাহু রোমশ আর কর্কশ। না না, তা হতেই পারে না। তুলনায় নাসির খাঁর কী বীর বপু। বুকটা বাদশাহী সড়কের মত চওড়া, গর্দান শাহীবুরুজের মত বলিষ্ঠ, হাত দুখানা লালকেল্লার লাহোরী দরজার মত সবল—আর সবশুদ্ধ মানুষটা নকড়খানার মত উন্নত। তখনি নিজেকে প্রশ্ন করে সত্যি কি ভালবাসে নাসির খাঁকে সে? না, না, না। মনে পড়ল তার মা বলত বাঈজীদের ভালবাসতে নেই—যে ব্যবসার যা রেওয়াজ। এ ব্যবসায়

ভালোবাসার ভান চলে—কিন্তু আসলি চিজ অচল। আর অচল কি সচল কেমন করে জানবে নূরবাঈ। ওর মনে এখন পর্যন্ত ভালবাসা জাগবার সুযোগটাই যে পায়নি। সারা জীবন ভালবাসার ভান করেই কাটালে সে। কিন্তু নাদির শার সঙ্গে ভালবাসার ভান করতেও সে প্রস্তুত নয়—ভানের পথে নাসির খাঁ পর্যন্ত চলতে পারে। সে ভাবে নাসির খাঁ বলে গেল একটা কিছু করবে। কিন্তু কি করবে? বিদ্রোহ, সেটা আবার কি? বিদ্রোহ বলতে কি বোঝায় ঠিক জানে না সে। সে কি হাঙ্গামা না তার চেয়েও কিছু বেশী যাকে বলে 'গদর'। তার স্মৃতিতে অনেকগুলো 'গদরের' ছাপ আছে। হয়তো বা সেই রকম একটা কিছু ঘটাবে নাসির খাঁ। কিন্তু তাতে কি সে মুক্তি পাবে দস্যুটার কবল থেকে? হয়তো ওরই মধ্যে কেউ ছুরি বসিয়ে দেবে শয়তানটার বুকে! ঠিক ঠিক, তাই ঠিক। তখনি মনে পড়ে নাসির খাঁর কোমরবন্ধের ছুরিটাকে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে রত্ন-খচিত ছুরিখানার দীপ্তি অভয় রশ্মি বিতরণ করে তার মনে। মনটা একটু হাল্কা হতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

৫

কাণ্ডটা কখন কোথায় কাদের দ্বারা কেন শুরু হল আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা তার কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। হঠাৎ দেখা গেল যে শাজাহানাবাদের লোকেরা ক্ষেপে উঠে ইরাণী সৈন্যদের আক্রমণ আরম্ভ করেছে। কেউ বলে এর মূলে আছে একটা গুজব। শহরের মধ্যে রটে গেল যে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময়ে নাকি নাদির শা খুন হয়েছে। অনেকেই বলল, অসম্ভব নয়, বাদশার সঙ্গে শাহের সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল বটে। আবার অনেকে বলে, স্থানীয় আমীর ওমরাদের কাছ থেকে টাকা-কড়ি আদায়ের উদ্দেশ্যে ইরাণী সৈন্যরা যে জুলুম শুরু করেছিল তাতেই ক্ষেপে গিয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত। আবার অনেকের মতে হাঙ্গামার সূচনা পাহাড়গঞ্জ এলাকায়। সেখানে যত বড় বড় গমের আড়ৎ। গমের দর নিয়ে আড়ৎদারদের সঙ্গে ইরাণী সৈন্যের বচসা শুরু হয়ে যায়—সেই বচসা ক্রমে দাঙ্গায় হয় পরিণত। এখন কারণ যাই হোক, দাঙ্গা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল মহল্লা থেকে মহল্লায়—চাঁদনীচক থেকে জামা মসজিদের কাছে, ভকিলপুরা থেকে মোগলপুরায়—অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ব্যাপক আর ভীষণ আকার ধারণ করল। শত শত ইরাণী সৈন্য জখম হতে লাগল। তারা না জানে দেশী ভাষা, না জানে শহরের পথ-ঘাটের অন্ধি সন্ধি; তাছাড়া প্রস্তুতও ছিল না কাণ্ডটার জন্যে। সব বড় শহরেই একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক

থাকে, দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠতরাজের সুযোগ পেলে তারা ছাড়ে না। শহরের শাসন ব্যবস্থা আগেই ভেঙে পড়েছিল, কেউ তাদের থামাতে চেষ্টা করল না, ইচ্ছা করলেও থামানো আর সম্ভব ছিল না। এ হচ্ছে বিকালবেলার ব্যাপার। ক্রমে শাহের কানে খবরটা উঠল—সে বিশ্বাস করলে না, ভাবল ইরাণী সৈন্য লুঠতরাজের হুকুম আদায় করবার উদ্দেশ্যে একটা অজুহাত খাড়া করেছে। মাঝ রাতে দাঙ্গা কমে গিয়ে শেষ রাতে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হল। প্রকৃত ব্যাপার কি জানবার জন্যে নাদির শা কয়েকজন নশকচি প্রেরণ করল, লালকেল্লা থেকে বের হওয়া মাত্র তারা নিহত হল, তখন খোদ নাদির শা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে শতাধিক দেহরক্ষী নিয়ে লালকেল্লা থেকে বের হল। তখন ভোরবেলা। সসৈন্যে শাহ চাঁদনীচকের সোনেরী মসজিদের কাছে এসে উপস্থিত হল। তার কিছু আগে থেকেই নূরবাঈ ছাদের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সারা রাত্রি তার কেটেছে বিনিদ্র—শহরের কোলাহলে ঘুম সম্ভব ছিল না। এখন সে দেখতে পেল অস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারূঢ় সসৈন্য নাদির শাকে। নাদির শা শহরের অবস্থা দেখে বুঝল যা শুনেছিল তা মিথ্যা নয়। তখন শাহ তলোয়ার খুলে কি যেন আদেশ প্রচার করল—সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষী সৈন্যদল তলোয়ার খুলে শাহের অনুকরণে চীৎকার করে উঠল—"কোতলে আম।" সেই ভয়াবহ ধ্বনি প্রবেশ করল নূরবাঈ-এর কানে—কোতলে আম কিনা কোতলের আম-হুকুম। জনতার মধ্যে যাদের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা ছিল তাদের মনে পড়ল অনেককাল আগে আর এক বিজয়ী বিদেশী কোতলে আম হুকুম দিয়েছিল—তৈমুরলঙ। ঐ সর্বনাশা হুকুম শুনবামাত্র যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে শুরু করল—কিন্তু বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কোতলে আম হুকুম শুনবামাত্র নাদিরশাহী সৈন্যদল ঘোড়া ছুটিয়ে, তলোয়ার খুলে, বর্শা বাগিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে পড়ল গিয়ে জনতার উপরে। আর সমস্ত তদারক করবার উদ্দেশ্যে নাদির শা সোনেরী মসজিদের ছাদের উপরে উঠে খোলা তলোয়ার হাতে রইল দাঁড়িয়ে। আর অদূরে ছাদের উপরে চিলে কোঠার ধারে কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে রইল নূরবাঈ। আর নীচে চাঁদনীচক, মেওয়া বাজার, জহুরী বাজারে ছিন্নমর্দিত, পিণ্ডীকৃত নরদেহের স্তূপ ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগল। রক্তোন্মাদ ইরাণী সৈন্যের কোতলে আম গর্জনের তলে চাপা পড়ে গেল মুমূর্ষুর আর্তনাদ।

আর দশজন লোকের চেয়ে নূরবাঈ যে বেশী নিষ্ঠুর তা নয়, খুন জখম দর্শনে তার যে আর দশজনের চেয়ে বেশী আনন্দ তা নয়। তবু কেন সে এমনভাবে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল ঐ নারকীয় কাণ্ড নিশ্চয় বলতে পারিনে। যখন আর

সকলে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল, কিংবা ঘটনার বীভৎসতায় মর্মাহত হয়ে আত্মগোপন করছিল, সেই সময়ে সেই দৃশ্যে কেন তার এমন তন্ময়তা ? হয়তো এর মধ্যে মনের কোন গূঢ় গোপন লীলা আছে। দু-একটা খুন জখম, কিছু রক্তপাত যেমন করুণ তেমনি বীভৎস; কিন্তু সেই হত্যার আবর্তে যখন হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারায়, রক্তে যখন কোটালের বান ডাকে, তখন ঐ অতিকায়িক আত্মবিস্তারে তা বুঝি একটা মহিমা লাভ করে। খুনী নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, দুর্বৃত্ত গর্হণীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু জগতের সমস্ত পাপ যার মধ্যে ঘনীভূত, সেই শয়তানও কি সেই অর্থে, সেইভাবে নিন্দনীয় ! সে যে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ যে লোকটা, আসরে বসলে যাকে কত ক্ষুদ্র, কত বীভৎস, জুগুপসাযোগ্য মনে হয়—সে যখন কোতলে আম গর্জন করে সোনেরী মসজিদের উপরে দাঁড়াল, তার অঙ্গুলি হেলনে, আদেশের কটাক্ষে নরকের সমস্তগুলো দ্বার দরবাজা খুলে গিয়ে সহস্র মূর্তিতে মহা হত্যা বেরিয়ে এলো, ছিন্ন নরদেহে আততায়ী অশ্বোরোহী পদে পদে ব্যাহত হতে লাগল, রক্তপিচ্ছিল পথে আততায়ী পদাতিক ক্ষণে ক্ষণে স্খলিত হতে থাকল, চাঁদনীচকের নহরের জলের ধারা রক্তে স্ফীত হয়ে দুই কূল ভাসিয়ে দিল, মুমূর্ষু ও পলায়নপরের আর্ত রবের সঙ্গে হত্যাকারীর প্রতিশোধাত্মক কণ্ঠস্বর মিলে গিয়ে আকাশটাকে কণ্টকিত করে তুলল, আর সর্বোপরি ঐ মসজিদের স্বর্ণচূড়ায় উজ্জ্বল পটকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে নরকাগ্নি শিখায় দেদীপ্যমান ঐ বীরমূর্তি অতিকায়িক মহিমায় আকাশের তুঙ্গ স্পর্শ করল, তখন এক প্রকার উৎকট উল্লাস অনুভব না করে পারল না নূরবাঈ। সূর্যোদয়ের বিভায় যেমন ধীরে ধীরে দিগ্‌মণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি উৎকট উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ চোখ। এই ভাবটি দেখেই ভীত হয়ে হয়ে উঠেছিল বাঁদী, ভেবেছিল এমনিতে তো হুঁশ হল না মালিকার, একবার নাসির খাঁকে ডাকলে কেমন হয়। কিন্তু কোথায় নাসির খাঁ এই ডামাডোলের মধ্যে ? সে জানত বাড়ি থেকে বের হলেই নিহত হবে, বাড়ির মধ্যে বসেও যে প্রাণরক্ষা পেল তা নাদির শার কৃপায়—নূরবাঈ-এর বাড়ি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে পাহারা মোতায়েন হয়েছিল।

দুপুর গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্ণ হয়ে এলো, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল নূরবাঈ।

বিকাল বেলায় বাদশার সনির্বন্ধ-অনুনয়ে নাদির শা হত্যার হুকুম প্রত্যাহার করল। ইরাণী সৈন্য শিবিরে ফিরল—মৃত ও মুমূর্ষুর স্তূপ পড়ে রইল যেখানে ছিল।

সেই উৎকট উল্লাসে বিভোর হয়ে বিনিদ্র রাত কেটে গেল নূরবাঈ-এর। সে স্থির করল আত্মসমর্পণ করতে যদি হয়ই তবে এমনি বীরের কাছে করতে হয়—সমস্ত প্রবৃত্তিতে মানুষের স্বভাবের সীমা যে ছাড়িয়ে গিয়েছে, মনে হল সে মানুষ নয়, আরব্যোপন্যাসের দৈত্য, মনে হল তার কাছে আত্মদান করলে যেন ঐ মহিমার অংশীদার হওয়া যায়। যে অনুপাতে তার মনকে আকর্ষণ করল নাদির শা—সেই অনুপাতে বিদ্বেষমিশ্রিত ক্রোধ গিয়ে পড়ল নাসির খাঁর উপরে। কিসে আর কিসে, কোথায় রুস্তম আর পথের কুত্তা!

৬

পরদিন সন্ধ্যায় নূরবাঈকে সাজ-পোশাক পরতে দেখে বাঁদী—বলল—কোথায় যাবে মালিকা?

কেন, দেওয়ানী আমে, শাহান শা তাঞ্জাম পাঠিয়েছে।

হতবুদ্ধি বাঁদী বলল—কাল যা ঘটে গিয়েছে তার পরেও! কেউ যাচ্ছে না। তবিয়ৎ খারাপ বলে শুয়ে থাক, আমি গিয়ে বলেছি।

নূরবাঈ গর্জে উঠল। চুপ কর হারামজাদি, ফের মুখ খুলবি তো কুকুর দিয়ে খাওয়াব। দে আমার ওড়না দে।

নীচে কে চিল্লায়'রে?

উঁকি মেরে দেখে বাঁদী বলল—নাসির খাঁ।

নূরবাঈ বলে ওঠে—এতলোক মরল, শয়তানটা মরেনি? তখনি জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নশকচিদের উদ্দেশ্যে বলল—সিপাহী ঐ লোকটা কাল শাহান শাকে খুন করতে চেয়েছিল।

তার কথা শেষ না হতেই তলোয়ারের ঘায়ে নাসির খাঁর মুণ্ড খসে পড়ল।

তাঞ্জামে চেপে রওনা হয় নূরবাঈ লালকেল্লায়।

শাহান শা বলল—নূরবাঈ তো আমার উপরে গোঁসা করেছে।

নূরবাঈ বারে বারে কুর্নিশ করে বলল—দুনিয়ার মালিক আমার কসুর আর বাড়াবেন না। (ইস্ লোকটা কি অকিঞ্চিৎকর, বীভৎস, প্রকট-মাঢ়ি, স্থূল ওষ্ঠ রোমশ বাহু!)

তবে ইরাণে না যাওয়ার কারণ কি পিয়ারী?

খোদাবন্দ, আমার মা বৃদ্ধা তাতে অসুস্থ, না পারি রেখে যেতে, না পারি নিয়ে যেতে

(কোথায় গেল কালকার সেই মহিমময় জ্যোতিষ্মান বীর রুস্তম !)

এ ঠিক কথা, এমন অবস্থায় তোমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

নূরবাঈ মাথা নত করে থাকে।

শাহান শা গলা থেকে এক ছড়া হার খুলে নিয়ে ইঙ্গিত করে। নূরবাঈ কুর্ণিশ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে নতজানু নতমস্তকে অবস্থান করে। শাহান শা হার পরিয়ে দেয় ওর গলায়।

নূরবাঈ কুর্ণিশ করবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হাঁ, হাঁ, কি হল, কি হল !

নাদির শার ইঙ্গিতে কয়েকজন ওর হতচৈতন্য দেহ বহন করে বাইরে নিয়ে যায়।

আমীর ওমরাহর দল কানাকানি করতে থাকে ইরানে না যেতে পারবার দুঃখেই বাঈজী মূর্ছা গিয়েছে।

দর্শনী

লালকেল্লার তিরপলিয়া দেউড়ির দোতালার একটি অন্ধকার কারাকক্ষে অন্ধ ফারুকশিয়র বাহুর উপাধানে মাথা রেখে শায়িত। অন্ধকার কারাগারে অন্ধীকৃত ভূতপূর্ব বাদশা। পাশের কক্ষে প্রহরারত সান্ত্রীর পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়; কখনো শুনতে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গতায় বিরক্ত সান্ত্রীর আপন মনে ফার্সী বয়েত আওড়ানোর শব্দ; দুই কক্ষের মাঝেকার প্রাচীরে মানুষ প্রমাণ উঁচুতে ছোট্ট যে ঘুলঘুলিটা আছে তাই দিয়ে কখনো কখনো একটা আলোর অঞ্জলি এসে পৌঁছয় ঘরের মধ্যে, কিন্তু তা কি দেখতে পায় অন্ধের চোখ! নিয়মিত সময়ে দিনে রাতে একবার শান্ত্রীর পাহারায় খুলে যায় লোহার দরজার কুলুপ, একজন কেউ ছুঁড়ে দেয় খানকতক পোড়া রুটি, রেখে দেয় এক ভাঁড় জল। বাস্, বহিঃ পৃথিবীর সঙ্গে ঐ তার একমাত্র যোগাযোগ। ঘরে কোন আসবাব নাই, না একটা চারপাই—না একখানা কুর্শি। সবছিল থেকে কিছু-নাই'র অতল গহ্বরে যে পতিত—এই কয় দিনেই সে আবিষ্কার করে ফেলেছে মানুষের প্রয়োজন কত সামান্য। আর আয়োজন! ঐ লালকেল্লা, শাজাহানাবাদ, হিন্দুস্থান। তাতেও প্রয়োজন মেটে না, তখন লাঠালাঠি কাটাকাটি, পরিণাম কবর নয় কারা! এর চেয়ে কবর ভাল। লাফিয়ে ওঠে অন্ধ সিংহ, সদর্পে পদক্ষেপ করে, কিন্তু কয়েক ধাপ না যেতেই বাধা দেয় দেয়ালগুলো। এ কয়দিনেই ঘরের সীমা সরহদ্দ সে বুঝে নিয়েছে। বুঝে নিয়েছে—তবু বিশ্বাস হতে চায় না। বন্দী পাখি খাঁচার শলাকাগুলোকে বিশ্বাস করে না বলেই বেঁচে থাকে। পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, শুয়ে পড়বার আগে আকণ্ঠ জলপান করে নেয়, জল যে সরাবের চেয়ে সরবতের চেয়ে বেশি মিষ্টি হতে পারে—এই প্রথম সে বুঝতে পারল।

শ্বাস যায় তবু আশা যায় না। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে আব্দুল্লা খাঁ আফগানকে—মানে কিনা ঐ সান্ত্রীকে হাত করবার চেষ্টা করেছে সে, লোভ দেখিয়েছে একখানা চিঠি রাজা জয়সিংহের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে সাত হাজারী মনসবদার করে দেবে তাকে। আব্দুল্লা খাঁ আফগান সব কথা জানিয়ে দেয় হুসেন আলি খাঁকে। আরো কঠোর হয় কারাগারের অবরোধ। অবশ্য তার আরো কারণ আছে। শাজাহানাবাদের লোকের সহানুভূতি ফারুকশিয়রের দিকে, বাজারে বাজারে গুজব রটে যায় যে বড় বড় সব ওমরাহ

তহব্বর খাঁ, রুহুল্লা খাঁ প্রভৃতি রাজা জয়সিংহের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রকাণ্ড সৈন্যদল নিয়ে এগোচ্ছে। আর সর্বোপরি ফারুকশিয়র একেবারে অন্ধ হয়নি, এখনো দেখতে পায়। সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ আর সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ স্থির করে—আর নয়, এবারে কারার বন্দীকে কবরে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। সিদি জাসিন খাঁকে পুরস্কারের লোভ দেখায় তারা, লোকটা এমন বেয়াকুব অস্বীকার করে বসে। বন্দী হলেও এক সময়ে তো বাদশা ছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ভাবে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বন্দী জানতে পায় না এসব পরামর্শ, জানবার কথাও নয়। এক মাসের মধ্যে জনপ্রাণীর মুখ দেখতে পায়নি, তখনি শুধরে নিয়ে ভাবে কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি। কি হল ফকরুন্নিসা বেগমের, কি হল যোধপুরী বেগমের—আর কি হল জুলেখার। সে জানে বেগম দুইজন স্বাধীন নয়, কিন্তু জুলেখা তো বেগম নয়, বেগম নয় বলেই স্বাধীন—সে-ও কি ভুলে গেল নাকি! অবশ্য একেবারে ভোলোনি নূতন বাদশা রফি-উদ-দারজাৎ। কেমন আছে খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে লোক পাঠিয়েছিল, বুঝতে পারেনি সেটা বাদশাহী বিদ্রূপ, না বাদশাহী ধিক্কার। উত্তর চাইলে পাঠিয়ে দিয়েছিল একটা ফার্সী বয়েত—

"মালীর পরে ওগো কোকিল
রেখো না বেশি আশা।
ওই বাগানে ক'দিন আগে
আমারো ছিল বাসা।"

বয়েতটা পাঠিয়ে দিয়ে এত দুঃখের মধ্যেও মনে মনে হেসেছিল। ক'দিনের বাদশার উদ্দেশ্যে ক'দিন আগেকার বাদশার পরামর্শ।

ঐ বয়েতটা পাঠিয়ে দিয়ে সে আবিষ্কার করল যে তেমন তেমন করে চেপে ধরলে দেখা যায় যে, দুঃখের মুঠোর মধ্যেও দু-একটা মুক্তো পাওয়া যায়। আর একটু চেপে ধরলে তার অন্য হাতের মুঠো খুলে গিয়ে কি জুলেখা বেরিয়ে পড়বে না! যে গিয়েছে সে কি একেবারেই গিয়েছে? সেদিন সে-ই তো লড়েছিল সবচেয়ে বেশি, সবাই যখন ক্ষান্ত হল, ক্লান্ত হয়ে হার মানল, তখনো লড়ছিল সে! তনু দেহে এত শক্তি? নয় কেন? বিদ্যুল্লতার মজ্জাতেই থাকে বজ্রের আগুন। মুরিদ খাঁ এক ধাক্কায় ওকে ফেলে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মাথা ফেটে বের হল রক্ত। ঐ তার শেষ চিহ্ন, সূর্য অস্ত যাওয়া আকাশে রঙীন মেঘ।

এতক্ষণ আমরা চলেছি কাহিনীর পায়ের উপরে ভর দিয়ে, এবারে ভর

দিতে হবে ইতিহাসের পায়ের উপরে, তবে চলাটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

আলমগীরের মৃত্যুর পরে যে কথাটা লোকে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে বাদশাহী অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহের হাতে বাদশাহের পরাজয়ে সেই কথাটা দুনিয়াময় প্রচারিত হয়ে গেল; অন্তসারশূন্য বাদশাহী ভেঙে পড়ল। যা কোন মতে নড়বড়ে অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে রইল তা হচ্ছে জীর্ণ কাঠামোখানা। অথচ এই দুই ঘটনার মধ্যে ব্যবধান মাত্র বত্রিশটি বছরের।

আলমগীরের পরে একের পরে এক বাদশাহের দল তখৎ-এ-তাউসে বসতে শুরু করল, জীর্ণ কাঠামোখানা মেরামত করা দূরে থাক্, তাকে খাড়া রাখবার সাধ্যও ছিল না এদের। হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় এরাই ঠাট বজায় রেখে রাজত্ব করতে পারত—কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে দুঃসময়ের যোগ্য একজন বাদশাও বসল না সিংহাসনে। অথচ বাদশাহীর প্রতি লোভ কারো কম নয়, নূতন বাদশাহের সিংহাসন আরোহণ মানেই একটা করে গৃহযুদ্ধের রক্তনদী উত্তরণ। বাহাদুর শাহ, জাহান্দর শাহ, ফারুকশিয়র। এই ফারুকশিয়রের কথা আমরা বলছি। রাজার চেয়ে মন্ত্রীর প্রতাপ যখন বেশি হয়—বুঝতে হবে রাজ্যের দুঃসময়। এই সময়ে হুসেন আলি খাঁ আর আব্দুল্লা খাঁ নামে দুই ভাই, ইতিহাসে এরা "সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল" নামে পরিচিত, King-makerএর পদবী গ্রহণ করেছিল। নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি মত যখন খুশি এরা বাদশাহী দিয়েছে —আবার সরিয়েছে। ফারুকশিয়রকে এরাই বসিয়েছিল সিংহাসনে, আবার সরাল এরাই। কেন? একদিকে অকর্মণ্য দুর্বল বাদশা, অপরদিকে স্বার্থান্ধ প্রবল রাজপুরুষ—আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ফারুকশিয়রের অপসারণ স্থির হয়ে গেলে লালকেল্লার যে রাজকারাগারে বাদশার বংশধরদের এই চরম প্রয়োজনের জন্য জীইয়ে রাখা হত সেখান থেকে রফি-উদ্-দারজাৎ নামে একজনকে টেনে বের করে এনে দেওয়ানী আমে তখৎ-এ-তাউসের উপরে বসিয়ে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হল। এখন আর ফারুকশিয়রকে বন্দী করতে কোন বাধা রইল না। তখন সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের আদেশে নিজামউদ্দিন আলি খাঁ, রাজা রতন চাঁদ, রাজা ভকতমাল প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল আফগান সৈন্য রঙমহলে ঢুকে পড়ল ফারুকশিয়রকে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে। তারপরে, না, এবারে ঐতিহাসিকের নিজ কণ্ঠস্বরে শোনা যাক, নিরাবরণ সত্য নিরাভরণ পালোয়ানের দেহের মত কঠিন, সাহিত্যিকের কলমের স্পর্শে রসহানির আশঙ্কা।

"এই সব লোক, সংখ্যায় পুরা চার শ, সবেগে ঢুকে পড়ল বাদশার অন্তঃপুরে। অন্তঃপুরের মেয়েদের অনেকে অস্ত্র গ্রহণ করে বাধা দিতে অগ্রসর হল, কতক আহত হল, কতক নিহত। মেয়েদের কান্নাকাটি ও বিলাপের প্রতি কেউ কর্ণপাত করল না। যে ছোট ঘরটায় ফারুকশিয়র লুকিয়েছিল তার দরজা ভেঙে ফেললে হতভাগ্য বাদশা ঢাল-তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলো—আর আঘাত করতে শুরু করলে দুর্বৃত্তদের। এ হেন কোণঠাসা অবস্থায় আক্রমণে কোন ফলোদয় হল না। তার মা, স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য মেয়েরা তাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করল। বিলাপ-পরায়ণ মেয়েদের প্রতি কেউ কোন সম্ভ্রম দেখাল না, তাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। তখন আক্রমণকারিগণ তাকে ঘিরে ফেলল; ধরল তার হাত আর গর্দান, খসে পড়ল তার পাগড়ী, এইভাবে তাকে টেনে বের করে নিয়ে এলো অন্তঃপুর থেকে।... সবল সুপুরুষ এই মানুষটিকে, বাবরের বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সুগঠিত দেহ এই যুবককে ঘন ঘন আঘাত ও ভর্ৎসনা করতে করতে হিড হিড করে টেনে নিয়ে আসা হল, দওয়ানী-খাসে হুসেন আলি খাঁর সম্মুখে। হুসেন আলি খাঁ কলমদানির বাক্সটি থেকে সুর্মা পরাবার সূঁচটি বের করে একজনের হাতে দিয়ে বলল, এবারে বন্দীকে শুইয়ে ফেলে দিয়ে চোখ দুটো অন্ধ কর দাও। তারপরে অন্তঃপুরে আর ভাণ্ডারে কিংবা অন্তঃপুরিকদের দেহে যা পাওয়া গেল, নগদ, কাপড়-চোপড়, সোনা-দানা, তৈজসপত্র সমস্ত লুণ্ঠিত হল, এমন কি দাসী বাঁদী আর নাচওয়ালী-গুলোকেও যে যেমন পারল আত্মসাৎ করল। চোখে সূঁচ চালিয়ে দেওয়ার পরে ফারুকশিয়রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ত্রিপলিয়া দেউড়ীর কারাকক্ষে।"*

২

কারাগারের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। তবু শব্দের আভাসটুকু ধরা পড়ল অন্ধের প্রখরতর শ্রবণেন্দ্রিয়ে। দৃকপাত করল না সে, করবারও আছেই বা কি! নিয়মিত পোড়া রুটি আর জলের ভাঁড় রাখবার লোকটা বই তো নয়। ক্ষুধায় ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যটুকুর অভাব পূরণ করে নেয় সে অমৃতরসে, তাই তখন পান করছিল হতভাগ্য বন্দী। জুলেখাকে প্রথমে তার নজরে পড়েনি, মিশে ছিল সে আর দশজন সুন্দরী বাঁদীর দলে। তারপরে মানসিক কোন গ্রহোদয়ের

*The Later mughals, Part I.—Irvine, ইসলামী আইন অনুসারে অন্ধ রাজত্ব করবার অধিকার হারায়।

নিয়মে দিগন্তের ধারে দেখা দিল ছোট্ট সুকুমার-গজমোতির মত মুখখানি। দিগ্‌বলয় অনুসরণ করে কিছুদিন সে প্রদক্ষিণ করল বাদশাকে, তারপরে দেখা দিল ঢেউয়ের মাতামাতি। প্রথমে ফারুকশিয়র ভেবেছিল ও আর কিছু নয়, পরিচিত চাঁদের অভ্যস্ত লীলা। না, না, তা নয়। জুলেখা সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, তনুভঙ্গে কুর্নিশ করলে ঢেউগুলো কূল ছাপিয়ে যায় কেন, ঢেউকে এতখানি উদ্বেল করতে আর তো পারে না কেউ। জুলেখাই তার হৃদয়ের নূতন গ্রহ। সে বুঝল, কিন্তু তার আগেই বুঝে নিয়েছিল রংমহলের আর সকলে। এখন ফকরুন্নিসা বেগম আর রাঠোর বেগমের পরেই তার মর্যাদা। বাদশা স্থির করেছিল তাকে সাদি করে বেগমের পদ দান করবে। এমন সময়ে এলো বিপর্যয়। তা নাই হল। বাঁদী বলেই সে স্বাধীন, স্বাধীন বলেই সে আসতে পারে। কিন্তু আজো কেন এলো না। এমন কত কি চিন্তা দিয়ে বন্দী বুনে চলে আলোকলতার জাল।

কারাগারে সে প্রবেশ করল, নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল দরজাটা। ঘর অন্ধকার কিছুই চোখে পড়ে না, কোথায় বন্দী—কোথায় জিনিসপত্র। অন্ধকারে পায়ে লেগে গড়িয়ে পড়ল জলের ভাঁড়, ঢেলে পড়ে গেল জলটা।

জলটা ফেলে দিলে, আজ আবার এ কি নূতন উপদ্রব!

এই তো বাদশার কণ্ঠস্বর—ঐ তো ওখানে বাদশা। হায় হায়, একেবারে মেঝের উপরে, নাই একখানা গাল্‌চে, নাই একখানা কুর্শি, এমন কি একখানা চারপাই পর্যন্ত নাই। খালি মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দিয়ে খালি গায়ে বসে আছে বাদশা।

আগন্তুক সম্মুখে গিয়ে অভ্যাস মত কুর্নিশ করে, তখনি বুঝতে পারে ঐ চোখে যে দৃষ্টি নাই।

পায়ের শব্দ কাছিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে বন্দী বলে ওঠে, আজ আবার কি হুকুম। খুন করবে নাকি?

কেউ উত্তর দেয় না। আগন্তুক হয়তো ভাবে—কি প্রসঙ্গ দিয়ে কথা শুরু করবে।

যে অবস্থায় আছি কোতল হতে ভয় পাই না, কারার চেয়ে কবর ভাল! কিন্তু তার আগে একবার শেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে না নূতন বাদশা? একবার জুলেখাকে দেখলে সহস্রবার মরতে রাজী আছি। যাও, যাও, বাদশাকে বহুৎ বহুৎ কুর্নিশ জানিয়ে আরজি পেশ করগে।

তার চোখে জল গড়ায়, আগন্তুকের চোখেও জলের ধারা। দুই ধারায় রাখীবন্ধন হয়ে যায়। চোখের জলের বিচিত্র প্রকৃতি।

কি, এটুকু দয়া করবার হুকুমও নেই বুঝি! তবে নিয়ে এসো কি আছে, তলোয়ার—না কিরিচ—না গুপ্তি—না পিস্তল! জুলেখা আছে মনের মধ্যে—তোমার হিন্দুস্থানের বাদশার সাধ্য নেই কেড়ে নেয় সেই মন!

আগন্তুক আর মৌনতা রক্ষা করতে পারে না, ডুকরে কেঁদে উঠে বলে—বাদশা! বাদশা! এই যে বাঁদী হাজির।

মত্তমাতঙ্গের বলে ফারুকশিয়র লাফিয়ে ওঠে, বলে, জুলেখা, জুলেখা, দিল পিয়ারী জুলেখা, জড়িয়ে ধরে তাকে সবলে, সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করে দেয় চুম্বনে। তারপরে নিজে বসে তাকে বসিয়ে নেয় কোলের উপরে।

তার গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—পিয়ারী, তোমার চোখে জল কেন?

বাদশা—

আমি তো আর বাদশা নই।

তুমি চিরকালই বাদশা, তুমি যেখানে বসবে সেখানেই তখৎ-এ-তাউস।

চোখের জলের উত্তর তো পেলাম না।

বাঁদীর চোখ তো জল পড়বার জন্যেই। তোমার চোখে জল দেখছি কেন বাদশা?

চোখের জলের কাছেও কি বাঁদী বাদশা ভেদ আছে?

এতদিন তো আমার চোখে জল পড়েনি বাদশা।

তবে আজ পড়ছে কেন?

সুখে।

আমার বন্দীদশায় তোমার সুখ?

হঠাৎ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না জুলেখা। সে জানে বাদশার বন্দীদশায় তার সুখ নয়—অথচ বন্দী না হলে কি প্রেমের এমন নিঃসপত্ন স্বীকৃতি পেত বাদশার মুখে।

প্রেম বড় নিষ্ঠুর।

জুলেখা বলে, আবার তুমি বসবে তখৎ-এ-তাউসে।

তাহলে পশ্চিমে উঠবে সূর্য।

দু-হাজার বৎসর সূর্য পূর্বদিকে উঠেছে, না হয় এবার উঠবে পশ্চিম দিকে!

না পিয়ারী, সে আশা করো না। তার চেয়ে বলো এ কদিনের খবর।

তখন দাড়িম থেকে দানা খসিয়ে নেবার মত একে একে খসিয়ে নেয় তার মুখ থেকে এক মাসের সংবাদ, দাড়িমের দানার মতই চোখের জলে শুভ্র রক্তের আভাসে রঙীন দুঃসহ সংবাদ।

তুমি এতদিন আসনি কেন পিয়ারী ?

প্রথম ক'দিন তো মাথার চোট লেগে বেহুঁশ ছিলাম। তারপরে হুঁশ হলে দেখলাম যে দিলদার খাঁর হারেমে বন্দী।

শয়তান! বেইজ্জত করেছিল তোমাকে ?

না, সে সুযোগ পায়নি। তার মেয়ে আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

কোথায় গেলে পালিয়ে ?

তালকাটোরায় গিয়ে ক'দিন লুকিয়ে রইলাম।

তার পরে ?

ধীরে ধীরে ফিরলাম শহরে, কাগজী মহল্লার চাচীর কাছে। সেখানে সব খবর পেলাম।

কি কি খবর ?

ফকরুন্নিসা বেগম সাহেবা বাপের ঘরে গিয়েছে, আর যোধপুরী বেগম সাহেবা চলে গিয়েছে দেশে।

তুমিই বা চলে গেলে না কেন ?

কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার বাপের ঘর ?

থাকলে আসতে না নিশ্চয় !

যাদের ওসব নেই তারা কি সবাই এসেছে নাকি ?

গোঁসা করলে পিয়ারী ? তুমি ছাড়া আমার কেই বা আছে !

এই বলে কাছে টেনে নেয় তাকে।

তারপরে শুধায়, চাচীর ঘরে আসবার পরেও তো অনেক দিন হল—এতদিন আসনি কেন ?

বাদশা, পাহারাওলা কি ঢুকতে দেয় !

কি বলে ?

বলে ধরে নিয়ে যাবে উজীর সাহেবের কাছে।

তার পরে ?

আজ দশ দিন ধরে কাঁদাকাটি করছি, বলছি, সাহেব একবার চোখের দেখা বই তো নয়, কে-ই বা জানছে ? শেষে বলে টাকা-কড়ি দাও। বলি যে,

থাকলে কি না দিতাম সাহেব! তখন বলে—এখনি ভাগো। উজীর সাহেব খবর পেলে আমার গর্দান যাবে।

তারপরে সে বলে যায়, এই ভাবে দশদিন কাঁদাকাটি হাঁটাহাঁটি করবার পরে আজকে হুকুম পেয়েছি।

কিসের বদলে?

কিসের বদলে শুনে জুলেখার মুখ শুকিয়ে যায়, গা কাঁপতে থাকে; তবু থামে না—বলে যায়।

এতক্ষণ যা বলছিল সত্য, এবারে যা বলতে শুরু করল সর্বৈব মিথ্যা।

বাদশা নওরোজের দিনে আমাকে একটা জড়োয়া হার দিয়েছিলে, সেটা এত দুঃখের মধ্যেও হাতছাড়া করিনি। সেটা দিয়েছি আফগান সর্দারকে। সে খুব খুশি হয়ে দরজা খুলে দিতে রাজী হল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো বাদশার যোগ্য দর্শনী বটে! বলল, এটি আমার বিবিকে খুব মানাবে। তখনি সেটা জেবের মধ্যে পুরে দরজার কুলুপ খুলে দিল।

বন্দী বলে, লোকটাকে আমি দোহাজারী মনসবদার করে দেব—একবার তখৎ-এ-তাউসে বসি না!

তারপরে বলে, পিয়ারী, তোমার বোধ হয় বিশ্বাস হল না যে আমি আবার বাদশাহী পাব! পাব, পাব, নিশ্চয়ই জেনো পাব। কেমন করে পাব সেই গোপন কথাই আজ বলব তোমাকে, বলব বলেই প্রত্যেক দিন আশা করছিলাম তোমার আগমনের।

তার কথায় বিশ্বাস হল কিনা জানি না, খুব সম্ভব তার কথা কানেই ঢুকল না জুলেখার। তখন মনে পড়ছে—আফগান পাহারাওলার সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল, আর মনে পড়ছে যে দর্শনীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি সে লাভ করেছে। কি হঠকারিতাই না সে করে ফেলেছে—এতখানি না করলে কি এমন ক্ষতি হত। না হয় নাই হত দেখা বাদশার সঙ্গে।

অনেক তত্ত্ব-তালাসের পরে জুলেখা জানতে পারে যে ফারুকশিয়র বন্দী আছে তিরপলিয়া দেউড়ীর কারাকক্ষে। বুঝতে পারে কড়া পাহারা। তবু একদিন গিয়ে উপস্থিত হয়, দূর থেকে দেখবামাত্র ভাগিয়ে দেয় পাহারাওলা। আবার যায় আবার তাড়া খায়, দুটো মিনতি করবার সুযোগটুকুও পায় না। এই

ভাবে পাঁচ-ছয় দিন তাড়া খাওয়ার পরে একদিন কথা বলবার সুযোগ পায়, পাহারাওলা শুধায়, কি চাই ?

একবারটি দেখা করতে চাই বাদশার-সঙ্গে।

ভাগো হিঁয়াসে—গর্জন করে ওঠে পাহারাদার।

আবার পরদিন যায় জুলেখা। এবার পাহারাদারের হাতে একটি হীরার আংটি দিয়ে বলে, খাঁ সাহেব একবার দেখা করতে দাও।

আংটিটা দিতে তার দুঃখ হয়, বাদশার এই উপহারটিকে এত কষ্টের মধ্যেও রক্ষা করেছিল, তখন ভাবে সেই শেষ উপহার যদি সাক্ষাৎকারের সুযোগ জুটিয়ে দেয়, তবে তার চেয়ে সদ্ব্যবহার আর কি হতে পারে !

খাঁ সাহেব সেটি জেবের মধ্যে পুরে বলে, আভি ভাগো।

মধুর হাসি হেসে জুলেখা বলে, সে কি খাঁ সাহেব, তোমাকে যে ভেট দিলাম !

খাঁ সাহেব হাসিতে কালো গুম্ফশ্মশ্রু আলোকিত করে তুলে বলে, আমিও তো কথা বলেছি তোমার সঙ্গে।

তবে এবার দরজাটা খুলে দাও।

ঐটুকুতে ফাটকের দরজা খোলে না।

আর যে কিছু নাই !

যোগাড় করো গে।

জুলেখা ফিরে আসে, কি যোগাড় করবে, কোথায় যোগাড় করবে, কে করবে তাকে সাহায্য। শেষ সম্বল তার অকারণে তলিয়ে গেল অতলে। তবু না গিয়ে উপায় নাই, আবার যায়।

এবারে খাঁ সাহেবের চোখে বীভৎস লোলুপতা ঝলক দিয়ে ওঠে। ভয় পায় জুলেখা। পুরুষের ঐ দৃষ্টি খুব চেনে সে। জীবনে যে পথ সে অবলম্বন করেছে তার মোড়ে মোড়ে ঐ দৃষ্টির জলসা। তবু না বুঝবার ভান করে বলে—দরজাটা খুলে দাও খাঁ সাহেব।

ভেট আনো।

বলেছি তো মূল্যবান্ আর কিছু নেই আমার।

এবারে মৃদু হেসে বলে, আরে তুমি তো আছ !

না বুঝবার ভান করে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে জুলেখা।

কি পিয়ারী বুঝলে না ! তবে শোন, বলে আওড়ায় এক ফার্সী বয়েত—

"দরিয়ায় মুক্তা থাকে,
খনিতে হীরক,
সুন্দরীর সর্ব অঙ্গে
রত্নের চমক।"

ব্যাখ্যা করে বলে, তোমার হীরা জহরতের অভাব কি বিবি, মনে করলেই হারুন-অল-রসিদের ভাণ্ডার খুলে দিতে পার।

রাগ করে চলে যায় জুলেখা।

খাঁ সাহেব হেসে বলে, ফিন আনে হোগা। তারপরে হাতে তাল দিতে দিতে গুনগুন স্বরে গান ধরে।

"যা যা রে ভোমরা দূর দূর যা।"

দুদিন আসে না জুলেখা, ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবে। খাঁ সাহেবের দাবি মেটালে দেখা হয়, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা করাও যে দরকার! তার জন্যে নয়, বাদশার জন্যে, যদি কিছু উপকার করা সম্ভব হয়। বাজারে তো অনেক রকম গুজব রটেছে, আম্বেরের রাজা জয়সিং আসছেন, আসছে শশুর অজিৎ সিং, সঙ্গে স্বয়ং নিজাম-উল-মুল্‌ক। নিশ্চয় এখন চিঠি চালাচালি আবশ্যক। কে আর করবে সে কাজ জুলেখা ছাড়া! সে স্থির করে আবার যাবে—কিন্তু না, না, ও দাবি মেটাবার পথে নয়, মনসবদারীর লোভ দেখিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আদায় করবে হুকুমটা।

সন্ধ্যাবেলায় রুহুল্লা খাঁর ভাই এসে হাজির।

জুলেখা বিবি অনেক খুঁজে তোমার দেখা পেয়েছি।

জুলেখা শুধায়, হঠাৎ আমাকে কিসের প্রয়োজন?

মুরুদ্দিন খাঁ তাকে নিভৃতে নিয়ে যা জানাল তার মর্ম হচ্ছে যে তহব্বর খাঁ, রুহুল্লা খাঁ, রাজা জয়সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, সকলে মিলে সৈন্য সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। ওদিকে দক্ষিণ থেকে নিজাম-উল-মুল্‌ক রওনা হয়েছে। সে আর একটু কাছে এলেই সকলে মিলে লড়াই করে ফারুকশিয়রকে উদ্ধার করে আবার সিংহাসনে বসাবে।

জুলেখা বলে, লড়াই তো মরদের কাজ, আমি কি করব?

বিবি, জেনানার মত কাজও আছে, তোমাকে তাই করতে হবে! একটা গুজব রটেছে যে ফারুকশিয়র সম্পূর্ণ অন্ধ হয়নি, এখনো একটু দেখতে পায়। কথাটা সত্য হলে ঐ গুজবের হাতিয়ারেই আমরা লড়াই ফতে করে দেব।

এখন তোমাকে তিরপলিয়া দেউড়ীতে গিয়ে বাদশার কাছ থেকে জানতে হবে কথাটা সত্য কিনা।

আমি যে নিতান্ত ছোট!

আরে বিবি, তুমি ছোট বলেই তো এসেছি তোমার কাছে। যে খাঁচায় ঈগল পাখী ঢুকতে পারে না তাতে চড়াই পাখী অনায়াসে ঢুকে যায়।

না হয় ঢুকলাম, কিন্তু বাদশা আমাকে এমন গোপন কথাটা জানাবে কেন?

নুরুল্লা খাঁ বলে উঠল, এবারে হাসালে বিবি, তোমাকে জানাবে কেন! শাজাহানাবাদের কোন লোকটা না জানে যে বাদশার দিল তোমার ওড়নার খুঁটে বাঁধা। শোন বিবি, পিরীতের চেয়ে গোপন কিছু তো নেই—তা যখন বাদশা তোমাকে জানাতে পেরেছে—একথাটাও জানাবে।

কথাগুলো শুনে জুলেখা এত দুঃখের মধ্যেও একটু গৌরব বোধ করল, সেই সঙ্গে একটুখানি আনন্দও। বলল, আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি।

আর দেখাদেখি নয়, কালই যাবে।

জুলেখার একবার ইচ্ছা হল যে পাহারাদারের ঘুষের টাকাটা চেয়ে নেয়—কিন্তু চাইতে পারল না। তামাম শাজাহানাবাদে জানিত বাদশার প্রণয়িনীর পক্ষে সামান্য একটা লোকের কাছে হাত পাতা চলে না।

কি বিবি পারবে তো? আরে ফারুকশিয়র বাদশা হলে তুমিই তো হবে বেগম।

আচ্ছা যাও, যাব কাল।

লোকটা চলে গেলে সারাদিনের চিন্তা সঙ্কটের উপরে যবনিকা টেনে দিয়ে সিদ্ধান্ত করল প্রহরীর প্রার্থিত দর্শনীর বিনিময়েই প্রবেশাধিকার অর্জন করবে সে ফারুকশিয়রের কারাগারে। এখন প্রয়োজন ফারুকশিয়রের, যখন মন রাজী হয়নি তখন প্রয়োজন ছিল নিজের। পরাভিমুখী প্রেম সর্বত্যাগী।

জুলেখাকে দেখে পাহারাওয়ালা বলে উঠল—কি বিবি, মিছামিছি ঘোরাঘুরি করছ কেন, দর্শনী মিটিয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ো, বলতে বলতে তার দুই চোখে নির্লজ্জ কামনা উঁকি দিতে থাকে।

জুলেখা বলে, সেই মনে করেই তো এলাম।

বাহবা বাহবা! ভয় কিসের, কাক-পক্ষীটিতে জানতে পাবে না।

আগে দেখা করে বের হয়ে আসি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, মাল নিয়ে তবে তো দাম দেবে।

এসো—বলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে কারাগারের দরজা খুলে দেয়; মৃদু স্বরে বলে—যতক্ষণ খুশি থাক কেউ তাগিদ দেবে না।

এই সব কথা মনে পড়ছিল জুলেখার, মনে পড়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল, বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর কোলের উপর বসেও তার শান্তি ছিল না, দাম চুকোবার পর্বটা মনে পড়ছিল। কিন্তু আসল কথাটা এখনো পাড়তে পারেনি, কি করে পাড়বে বুঝতে পারছিল না, এমন সময়ে ফারুকশিয়র নিজেই পথ করে দিল। বলল—জুলেখা, দিল, তোমাকে সেই সবচেয়ে গোপন কথাটা বলব, যে কথার অপপ্রয়োগ হলে আমার মৃত্যু, সুপ্রয়োগ হলে আমার সিংহাসন লাভ।

জুলেখা বলল, তেমন কথা বিশ্বাস করে নাই বললে আমাকে বাদশা, অপপ্রয়োগ তো হতে পারে।

পারে নাকি পিয়ারী! তাই যদি হবে—তবে প্রাণ হাতে করে এখানে আসতে গেলে কেন? পাহারাওলা না হয় ভাল, ছেড়ে দিয়েছে—সৈয়দরা জানতে পারলে তোমাকে আস্ত রাখবে না!

পাহারাওলা ভাল! মাথা ঘুরতে থাকে জুলেখার। অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলে—কি কথা বাদশা!

আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হইনি, এখনো একটু দেখতে পাই এই চোখটাতে। কি বিশ্বাস হল না? এই দেখ, চুমো খাচ্ছি তোমার ডান গালের তিলটির উপরে। কি এবারে বিশ্বাস হল তো? অন্ধের চোখ কি তিল দেখতে পায়!

ওটা তুমি আন্দাজে করলে।

আন্দাজে! বেশ, এবারে বাম গালের টোলের মাঝখানটিতে?

ওটাও আন্দাজ।

এটাও আন্দাজ! আচ্ছা এবার তোমার কণ্ঠের ত্রিবলীর মাঝখানকার চিহ্নটিতে।

ওটাও আন্দাজ, জানা জায়গা।

জুলেখা, তোমার দেহের কোন্ জায়গা আমার আজানা, তাহলে কিছুতেই তোমার বিশ্বাস হবে না?

তবে পরীক্ষা করি, কটা আঙুল বলো, বলে মুঠো বন্ধ করে থাকে।

আঙুল দেখাও।

এবারে নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে! ও কি, ও কি চোখে জল কেন?

জুলেখা বলে, বাদশা, আমি পাষণ্ড, আমি পামর, আমি শয়তানী।

বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ফারুকশিয়র শুধায়, কি হয়েছে পিয়ারী?

জুলেখা ভাবে দর্শনীর রহস্য প্রকাশ করে। তখনি মনে হয়, তাতে এখনি হাঙ্গামা বেধে উঠে আসল উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যাবে। যেমন করেই হোক ফারুকশিয়রকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

জুলেখা বলে, বাদশা আমি এবারে যাই।

যাবে?

চমকে ওঠে ফারুকশিয়র, যেন ও-কথাটা এই প্রথম শুনল। তারপরে বলে, হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। তার আগে এক কাজ করো, তোমার কথা মনে পড়ে এমন কিছু আমাকে দিয়ে যাও।

জুলেখা বলে, বাদশা, আমি তোমার, কিন্তু আমার তো এমন কিছু নাই যা তোমাকে দিতে পারি।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে তার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে বাদশা বলে—চুলের এই কাঁটাটি দিয়ে যাও।

চুলের কাঁটা খুলে দিতে দিতে বলে, এ কি দেওয়ার যোগ্য জিনিস! কি করবে এ নিয়ে বাদশা?

অনেক সময়ে ফার্সী বয়েত মনে আসে, ঐ কাঁটার আঁচড় দিয়ে দেয়ালে লিখে রাখব।

তখন বাদশার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুর্নিশ করে জুলেখা বলে, বাদশা, এবারে আসি।

আর একটু দাঁড়াও।

দুই হাতের মধ্যে তার মুখখানি নিয়ে অন্ধপ্রায় চোখের ক্ষীণ রশ্মিটুকু তার মুখের উপরে নিক্ষেপ করে বলে, এই যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি পিয়ারী, দিনান্তের শেষ আলো যেমন দেখতে পায় সুন্দর পৃথিবীকে। ওরা যখন চোখে কাঁটা বিধিয়ে দিল, ভাবলাম বাদশাহী গেল, হয়তো প্রাণও যাবে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি করে গেল তোমার মুখখানি দেখবার শক্তি। তারপরে কদিন পরে যখন চোখের দু-একটা রশ্মি ফিরে পেলাম, মনে হল, না, আল্লা তো নিষ্ঠুর নন, আবার দেখতে পাব তোমাকে। আর আজ এখন বুঝছি আল্লা রীতিমত সদয়, তোমাকেও ফিরে পাব আর সেই সঙ্গে হয়তো বাদশাহীটাও।

জুলেখা চুপ করে থাকে। এত সুখের যে মূল্য দিতে হবে তা স্মরণ করে

তার অন্তরাত্মা কাঁপতে থাকে। সে ভাবে আল্লা রীতিমত সদয় বইকি!

জুলেখা বেরিয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় কারাগারের দরজা।

ফারুকশিয়রের মনে আনন্দ ধরে না, ঘরের মধ্যে পদক্ষেপ করে বেড়ায়, যেন কারাগার নয় হিন্দুস্থানের অবাধ সাম্রাজ্য। সমস্ত শরীর তার হাল্কা হয়ে গিয়েছে, ইচ্ছা করলে এখনি ঐ ছাদের বাঁধন ভেদ করে উড়ে যেতে পারে। আর ঐ কাঁটাটি কখনো রাখছে জেবে, কখনো বুকে, কখনো হাতের মুঠোর মধ্যে। অবশেষে দেয়ালের কাছে এসে কাঁটার আঁচড়ে লিখে দিল এক ফার্সী বয়েত—

"চুলের কাঁটায় ফুলের কাঁটায়
প্রভেদ গেল ঘুচি,
উঠল ফুটে প্রেমের গুলাব
হৃদয়-রক্ত-রুচি।"

বয়েতটা লিখে একটু শান্ত হলে মনে পড়ল এত সুখ যার কল্যাণে সম্ভব হল, সেই পাহারওলাকে দুটো মিষ্টি কথা বলা উচিত। চেষ্টা করলে ঐ ঘুলঘুলিটা দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখা যেতে পারে।

ঘুলঘুলিটার কাছে গিয়ে পায়ের আঙুলগুলোর উপরে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে তাকাল ঘরটার দিকে—অন্ধপ্রায় চোখ প্রথমটা কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু দু-এক লহমার মধ্যেই চোখের আলোয় ঘরের অন্ধকারে আপস হয়ে যায় আর চোখে পড়ে।

প্রথম নজরে অন্ধ বিশ্বাস করতে পারে না তার নষ্ট-প্রায় দৃষ্টিকে। দ্বিতীয় নজরে পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তৃতীয় নজরে গর্জন করে ওঠে, বেইমান, শয়তানী!

তারপরে দরজায় মারে ধাক্কা। লোহার দরজা বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখায় না। তখন চিৎকারে গর্জনে অভিশাপে ধিক্কারে সেই কারাকক্ষ প্রতিধ্বনিত করে চার দেয়ালে আঘাত করে ফিরতে থাকে।

তারপরে হঠাৎ কি মনে পড়ায় থমকে দাঁড়ায়। চট করে জেব থেকে চুলের কাঁটাটি বের করে নিয়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ে আর সবলে কাঁটাটি চালিয়ে দেয় চোখের মধ্যে। এই তো আমার একসঙ্গে লাভ হয়ে গেল বাদশাহী আর বেগম। তারপরে বলে, আল্লার মুঠো থেকে চোখের এই দৃষ্টিটুকু ছিনিয়ে নিয়েছিল কে? শয়তান, শয়তান!

বলে আর হাসে, সে হাসি উন্মাদের।

আগম্-ই-গন্না বেগম্

গোয়ালিয়রের তেরো মাইল উত্তরে নুরাবাদ। নুরাবাদ ছোট শহর বা বড় গ্রাম এ দুইয়ের কিছুই নয়। প্রকাণ্ড একটা মাঠের মাঝখানে ছোট একটা নদীর ধারে খানকতক খোলার বাড়ি, কয়েকটা পাকা কোঠা আর একটা মসজিদ নিয়ে নুরাবাদ। আর আছে এখানে মসজিদের কাছেই বাগিচার মধ্যে একটি কবর। কবরটির চারদিক পাথরে বাঁধানো, উপরে সবুজ ঘাস—পাথরের গায়ে ফার্সি হরপে লেখা—"আগম-ই-গন্না বেগম"—গন্না বেগমের জন্যে একটু চোখের জল ফেলো। কত কবরেই তো এমন কত মিনতি লিখিত থাকে কে তাতে কর্ণপাত করছে? কিন্তু আশ্চর্য এই যে গন্না বেগমের মিনতি নিষ্ফল হয়নি। বছরে এক দিন শীতকালে, হয়তো সেটা গন্না বেগমের মৃত্যু দিন, নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না, অনেক তারিখের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে তার মৃত্যুর তারিখটা, এখানে লোক সমাগম হয়, মেলা বসে বললেও অত্যুক্তি হবে না। গন্না বেগম কে? সে তাপসী রাবেয়ার মত পুণ্যবতী মহিলা নয়, সুলতানা রিজিয়ার মত পরাক্রমশালিনী রাজ্ঞী নয়, নুরজাহানের মত সৌন্দর্যময়ী রমণী নয়। না, এ সমস্ত কিছুই নয় সে। তবু লোকে এখনো তাকে ভুলতে পারেনি, বছরে একবার করে মনে করে। কেন? গন্না বেগম বড় দুঃখিনী। দুঃখের কি অভাব আছে সংসারে? না, তা নয়, সংসারে দুঃখী নয় কে? তবে তাকে বিশেষ করে চিহ্নিত করে নেওয়ার অর্থ কি? সুখের কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দুঃখের অতলে যে পড়ে, ঐশ্বর্যের শিখর থেকে ভাগ্য-স্রোতের তাড়নায় অসহায় উপলখণ্ডের মত যে গভীর উপত্যকায় নেমে আসতে বাধ্য হয় তার উপরে বুঝি মানুষের একটু বিশেষ সমবেদনা থাকে। সেই সমবেদনার টানে এখানে আসে পীর ফকির বাউল দরবেশের দল, আসে গ্রাম গ্রামান্তরের নানা বৃত্তির নানা লোক—আর আসে চারণ কবির দল, উর্দু-ফার্সিতে রচনা করে নিয়ে গন্না বেগমের দুঃখের কাহিনী। গন্না বেগম নিজেও কবি ছিল। কবিরা এসে কবিতায় সেলাম জানিয়ে যায় দুঃখিনী কবির প্রতি। কবিরা সুর করে ফার্সি কবিতা পড়ে যায়—আর মাঝে মাঝে সমস্ত জনতা সমস্বরে চাপা বেদনায় বলে ওঠে, "আগম্-ই-গন্না বেগম"—গন্না বেগমের জন্য একটু চোখের জল ফেলো। সংসারে অপরের জন্যে চোখের জল ফেলবার সময়

বড় অল্প। ধন্য সেই দুঃখিনী, মৃত্যুর এত কাল পরেও যে অপরের চোখের জল আকর্ষণ করতে সক্ষম। "আগম-ই-গন্না বেগম।"

২

গন্না বেগমের বাপ আলি কুলি খাঁ কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী, ইরাণ রাজবংশের লোক। খাদিজা সুলতান নামে একটি তরুণীকে সে ভালবেসেছিল, তার নামে লিখত কবিতা। তরুণী তার নামে কবিতা লিখতে নিষেধ করে পাঠাল। ফল হল উল্টো। আলি কুলি খাঁ লিখল—'আমার কবিতায় যদি তোমার নাম গেঁথে না দিতে পারি তবে কি সার্থকতা আমার কবিতার।'

দুজনের প্রণয় জানাজানি হয়ে গেল, লোকের চোখ পড়ল খাদিজা সুলতানের দিকে, সবাই বুঝল কবির দৃষ্টি ভুল করেনি, খাদিজা অপূর্ব সুন্দরী। সবাই ভাবল কবি কবিতা লিখুক ক্ষতি নেই, এমন রত্ন কবির ঘরে শোভা পায় না, কথাটা তুলল নাদির শার কানে। নাদির শা গুণী লোক, কবিকে বিস্তৃত বিরহের পটে অজস্র কবিতা লিখবার সুযোগ দিয়ে খাদিজাকে নিয়ে এলো হারেমে! মনের দুঃখে আলি কুলি খাঁ চলে এলো হিন্দুস্থানে। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শা তাকে জফরজঙ্গ পদবী দিয়ে মীর তুজুক নিযুক্ত করল। পরবর্তী কালে দ্বিতীয় আলমগীর তাকে সাত হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করল। অবশেষে অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গের চাকরি নিয়ে দিল্লী থেকে চলে এলো লক্ষ্ণৌতে। দিল্লীতে থাকবার সময়ে আলি কুলি খাঁ বিয়ে করল এক পেশাদার নাচওয়ালীকে, যেমন তার রূপ তেমনি তার কবিত্বশক্তি। এদেরই একমাত্র সন্তান গন্না বেগম। সৌন্দর্য, কবিত্ব আর দুঃখ যাতে মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে, তার মধ্যে জন্মলগ্নেই দুটি পেয়েছিল গন্না বেগম, সৌন্দর্য আর কবিত্ব। তৃতীয়টিও যথাসময়ে এসে জুটল, বোধ করি জন্মলগ্নেই সেটাও লিখিত তার অদৃষ্টে। স্রোতের টানে পালের হাওয়া আর দাঁড়ের তাড়না তিনে মিলে দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে চলল গন্না বেগমের জীবন তরণী। এবারে সেই কাহিনী বলব। কিন্তু তার আগে একবার বলে নেই—"আগম-ই-গন্না বেগম।"

৩

গন্না বেগমের শৈশবে আলি কুলি খাঁর মৃত্যু হল, অভিভাবক রইল তার মা। ক্রমে গন্না বেগম বয়ঃপ্রাপ্ত হল। রূপের আগুন আর কবিত্বের খ্যাতি চারদিকে পড়ল ছড়িয়ে। বড় বড় ঘর থেকে বিয়ের কথা আসতে লাগল। এই

সব পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যে দুজন সবচেয়ে বড় তারা অত্যন্ত বড়। একজন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড ধনী সামন্ত, আর একজন ইমাদ-উল্-মুল্ক, দিল্লীর বাদশার উজীর, হিন্দুস্থানের সবচেয়ে প্রতাপশালী রাজপুরুষ। যাকেই বঞ্চিত করা হবে তার ক্রোধ পড়বে অসহায় মা ও কন্যার উপরে। গন্না বেগমের মা পড়ল সঙ্কটে। যাই হোক, তার মা স্থির করল অযোধ্যার নবাবের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে, গন্না বেগম হবে অযোধ্যা বেগম। এই উদ্দেশ্যে যখন তারা, মেয়ে ও মা আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেছে তখন জাঠ সর্দার জবাহির সিংহ তাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেল। কিন্তু কোন এক সুযোগে তার কবল থেকে পালিয়ে তারা উপস্থিত হল ফরাক্কাবাদে। কিন্তু এখন কি কর্তব্য ভাবল মা ও মেয়ে। ইতিমধ্যে নবাব আহমদ খা বঙ্গশ, তাদের অনেক কালের সুহৃদ, পরামর্শ দিল গন্নাকে ইমাদ-উল্-মুল্কের সঙ্গে বিয়ে দিতে। অযোধ্যার নবাব যতই বড়ই হোক বাদশার উজীরের চেয়ে নিশ্চয় বড় নয়।

কিন্তু হলে কি হয়, দুঃখের ভাগ্য নিয়ে যে জন্মেছে বাদশার উজীরেরও সাধ্য নাই তাকে সুখে রাখে। মুঘলানী বেগম, বাদশার মা, স্থির করে রেখেছিল তার মেয়ে উমদা বেগমের সঙ্গে বিয়ে দেবে উজীরের। তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল ইমাদের উপরে। যে-সময়ের কথা বলছি তখন হিন্দুস্থানের বাদশাহী সাম্রাজ্যের ভাঙা রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা আহমদ শা আবদালী।

সে তখন সাময়িকভাবে দিল্লী অধিকার করে বসে আছে। ইমাদ তার আশ্রিত, মুঘলানী বেগম তাকে ধরে পড়ল। আহমদ শা আবদালী উজীরকে অনুরোধ করল, তার অনুরোধকে হুকুম বলাই উচিত, উমদা বেগমকে বিয়ে করতে আর গন্না বেগমকে পাঠিয়ে দিতে বাদীরূপে সুজাউদ্দৌলার হারেমে। সুজাউদ্দৌলাকে খুশি রাখা আবদালীর আবশ্যক। যে হলে হতে পারত বেগম সে হয়ে এলো বাঁদী। নবাবের হারেমে এসে বিষ পান করে গন্না বেগম বাঁদী-জীবন দিল ঘুচিয়ে। এখন শেষ বিচারের আশায়, মানুষের বিচার যে কি অপূর্ব তা সে দেখে নিয়েছে, নুরাবাদের কবরে শায়িত, যেখানে বছরের পর বছর বসে মেলা, সে মেলার বিবরণ দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এই গল্পটি।

৪

এতক্ষণ যা বললাম তা ইতিহাস, এবারে যা বলতে যাচ্ছি তা কাহিনী ; ইতিহাস যা ঘটে, কাহিনী যা ঘটলে ঘটতে পারত ; সম্ভাবনা বিনি-সুতায় দুলছে বলে ঐতিহাসিকগণ তাকে অলীক মনে করে, বইয়ের পাতায় ধরে রাখে না ; তবু স্মৃতির পদ্মপত্রে তা সর্বদা টলমল করতে থাকে, চোখের সামান্য জলের ফোঁটাটি বাণীর মুক্তাফলের মত অমূল্য মনে হতে থাকে।

আলি কুলি খাঁর সঙ্গে ইরাণ থেকে এসেছিল আদিনা বেগ। দুজনে বন্ধু। আদিন, বেগের পুত্র আব্দুস সামাদ। আব্দুস সামাদ আর গন্না বেগম সমবয়স্ক, বাল্যকালে দুজনে ছিল খেলার সাথী। অল্প বয়সেই দুজনের কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। ছেলেমানুষেরা যেমন করে থাকে— দুজনে বাজি রেখে কবিতা লিখত। এমন সময়ে আলি কুলি খাঁ আর আদিনা বেগের মৃত্যু হল। তারপর যথা সময়ে গন্না বেগম ও আব্দুস সামাদ বয়ঃপ্রাপ্ত হল। এখন আর তারা খেলার সঙ্গী নয়, একজন থাকে অন্দর মহলে আর একজন বাইরে, দুজনের দেখা সাক্ষাৎ ঘটনাধীন, কাল-ভদ্রে হয়ে থাকে। তবে এখনো তারা কবিতা লেখে, আর বাজি রাখবার প্রয়োজন হয় না, লেখে প্রাণের তাগিদে —আর সে কবিতার যে বিষয় কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। সন্ধ্যা বেলায় ছাদের উপরে বসে গন্না বেগম স্বরচিত গজল গায়। আর মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে গন্না বেগম শুনতে পায় বাগিচার মধ্যে বসে আব্দুস সামাদ স্বরচিত গজল গাইছে। ছন্দের অদৃশ্য ডুরি ওদের ক্রমেই এঁটে বাঁধছে। বিয়ের কথা কেউ ভাবে না, কেননা তা হওয়ার নয়, প্রেমের কথাই ভাবে, কেননা তা স্বতঃসিদ্ধ। এইভাবে চলে। তার পরে শুরু হয় বিয়ের কথা। সে প্রসঙ্গ আগেই বিবৃত করেছি। পাথরে চাপা পড়া ঝরনার মত ওদের প্রেম আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কাব্যের ফেনা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিন্তু ওরা যে অসহায়, কিছু করবার নেই। যেখানে নায়ক প্রতিনায়ক বাদশার উজীর আর অযোধ্যার নবাব, সেখানে করবার আছেই বা কি। একটি মাত্র পথ আছে ওদের সম্মুখে খোলা— ওরা চোখের জলের উদ্বেগ স্রোতে কবিত্বের ফেনা ছড়িয়ে যায়। ওতেই আরাম—হয়তো বা একটুখানি আনন্দেরও মিশল আছে ওরই মধ্যে।

এমন সময়ে আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পথে জাঠ সর্দার জবাহির সিং দলবল নিয়ে এসে হরণ করে নিয়ে গেল গন্না বেগম আর তার মাকে। আব্দুস

সামাদ বাধা দিতে গিয়ে মাথা কেটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল পথের ধারে। মাস কয়েক পরে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠল, খোঁজ নিয়ে জানল গন্না বেগম তখন উজীরের বেগম। বাস, সেদিকে চলবার পথটা সম্পূর্ণ বন্ধ। তখন মনের মধ্যে স্মৃতি আর মাথায় তলোয়ারের আঘাতের তিলক নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। তার পরে অনেক দিন পরে সে খবর পেল গন্না বেগম শায়িত নুরাবাদের কবরে। এখন সে প্রৌঢ়, সে ভাবে গন্না বেগম জীবিত থাকলেও প্রৌঢ় হত। কালের স্রোতে এক ঘাট থেকেই নৌকা ভাসিয়েছিল তারা। গন্না বেগম আর তার নিজের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করে এসে পৌঁছল সে নুরাবাদে। খবর পেয়েছিল ওখানে চারদিক থেকে কবিরা এসে কাব্য আবৃত্তি করে।

৫

চার-পাঁচজন কবি চারণ কাব্য আবৃত্তি করে বসলে উঠল আব্দুস সামাদ। সবাই দেখল তার কৃশ মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল চক্ষু আর কপালের উপরে মস্ত একটা মস্ত একটা দাগ। কাব্য আবৃত্তি শুরু করবার আগে সে জানাল তার কাব্যের নাম তলোয়ারের তিলক। তারপরে সুর দিয়ে শুরু করল অমৃতে গরলে মেশানো সেই অপূর্ব প্রেমের কাহিনী। প্রত্যেকটি স্তবক আবৃত্তি করবার পরে সে বলে ওঠে 'আগম ই গন্না বেগম'—আর তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর মিলিয়ে জনতা ধ্বনিত করে তোলে 'আগম-ই-গন্না বেগম।' সমস্ত বায়ুমণ্ডল আহত বীণার তন্ত্রের মত থর থর করতে থাকে, প্রতিধ্বনি কণ্ঠ ফিরিয়ে দেয়—'আগম-ই-গন্না বেগম।'

প্রহরখানেক পর সন্ধ্যার সময়ে যখন সেই শোকময় প্রেম গাঁথা আবৃত্তি শেষ করল চারণ-কবি, তখন মুগ্ধ জনতা 'আগম-ই-গন্না বেগম' আবৃত্তি করতে ভুলে গিয়ে জড়বৎ বসে রইল, তারপরে হঠাৎ চটকা ভেঙে সমস্বরে বলে উঠল 'আগম-ই-গন্না বেগম।' সে ধ্বনি যেন নির্গত হল নিস্তব্ধ নিসর্গের কণ্ঠ থেকে।

কোন কথা না বলে কবি লাঠিখানা তুলে নিয়ে বারকতক প্রদক্ষিণ করল কবরটিকে, তারপরে যাত্রা করল অন্ধকারের মধ্যে। একজন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম করে শুধাল, মির্জা সাহেব, কপালে আপনার কিসের দাগ?

আব্দুস সামাদ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে আর হাতের আঙুল দিয়ে দুর্জ্ঞেয়তার মুদ্রা করে বলে উঠল—'আগম-ই-গন্না বেগম!'

তারপরে ধীর পদে যাত্রা করে অল্পক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তিন হাসি

সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তরে ভারতের কয়েকটি শহর হঠাৎ অসামান্য গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই সব শহরের মধ্যে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ আর কানপুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য অনেক আগে থেকেই শহর তিনটির গুরুত্ব ছিল, কিন্তু এখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এ তিনের মধ্যেও যদি আগেপিছে করতে হয়, তবে কানপুরকে বসাতে হয় সকলের আগে। এই বিষয়টি বুঝবার সঙ্গে আমাদের কাহিনীটি জড়িত। তাই আর একটু খুলে বলি। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর গুরুত্ব, একটি হচ্ছে বাদশার রাজধানী, আর একটি অযোধ্যার নবাবের, কোম্পানি যাকে king বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, বাদশাকে ছেড়ে দিলে হিন্দুস্থানের অপর একজন king বা রাজার রাজধানী। এদের গুরুত্ব রাজনৈতিক। অবশ্য কানপুরেরও যে একটু রাজনৈতিক গুরুত্ব না ছিল তা নয়, কানপুরের কাছে বিঠুরে দীর্ঘকাল ছিলেন নির্বাসিত পেশবা, এখনো আছেন তাঁর পোষ্যপুত্র নানা সাহেব, যিনি কিনা বিদ্রোহের একজন নায়ক। কিন্তু কানপুরের গুরুত্বের আসল কারণ রাজনৈতিক নয়। কোলকাতা থেকে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পথের মধ্যে কানপুর—যেন পথরোধ করে পড়ে রয়েছে। কানপুর হস্তগত না হলে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর পথ বন্ধ, পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারত বিছিন্ন। এই কারণেই এই শহরটি বারে বারে হাত বদলিয়েছে। সিপাহী যুদ্ধের রণভূগোল বা স্ট্র্যাটেজিতে কানপুরের গুরুত্ব ইংরেজ বুঝেছিল, সিপাহী পক্ষ বুঝতে পেরেছিল মনে হয় না। সিপাহী পক্ষ কানপুরের গুরুত্ব বুঝতে পারলে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কানপুর-রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করত। তা তারা করেনি। সিপাহীদের পরাজয়ের এটি একটি প্রধান কারণ। তার বদলে তারা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর রাজনৈতিক মূলধনের উপরে খুব বেশি ভরসা স্থাপন করেছিল। যুদ্ধ ব্যাপারে রাজনীতির কাছে রণনীতিকে খর্ব করলে যা সচরাচর ঘটে থাকে, তাই ঘটল সিপাহীদের বেলাতে। অনেকের বীরত্ব ও ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও তারা পরাজিত হল। এই পর্যন্ত ভূমিকা। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন যে, কি প্রয়োজন ছিল এর! তারপর যখন শুনবেন যে, আমার গল্পের বিষয় একটি কাকাতুয়া পাখি তখন হয়তো আবার ভাবতে পারেন ধান ভানতে শিবের গীত। কাকাতুয়া পাখির সঙ্গে রণনীতির কি সম্বন্ধ! এ

সংসারে কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র জড়িয়ে যায় কে বলতে পারে? Rome-এর দুর্গ capitol রক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে যদি কয়েকটা রাজহাঁস জড়িত হতে পারে, কানপুরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কাকাতুয়া পাখির জড়িত হওয়াকে অবাস্তব মনে হতে যাবে কেন? যাই হোক, বাস্তব অবাস্তবতার দায়িত্ব লেখকের নয়—তার দায়িত্ব কাহিনীটি বিবৃত করা।

সেকালে কানপুর শহরে মামুদের হোটেল নামে একটি বিখ্যাত হোটেল ছিল। মামুদের হোটেল নাম হলেও তার মালিক মামুদ নয়, কোন কালে কোন মামুদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল কি না, তাও কেউ জানে না, শুধু সবাই দেখে যে ঐ নামে হোটেলটি চলে আসছে। তার মালিক একজন ইহুদী, নাম দানিয়েল। দানিয়েল চতুর ব্যবসায়ী, যতদূর সম্ভব আড়ালে থাকে সে, হিন্দু কর্মচারী চাকরবাকর খানসামা দিয়ে কাজ চালায়। দানিয়েলের ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল সিপাহী বিদ্রোহের অরাজকতা আরম্ভ হয়ে গেলে। যখন সমস্ত কানপুর শহরে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শাসন লোপ পেল, দেখা গেল যে, মামুদের হোটেলে আগের মতই কাজ চলছে, শান্তি, শৃঙ্খলা ও শাসনের কোন অভাব নেই। বারে বারে শহর হাত বদলিয়েছে, প্রথমে সিপাহী, তারপরে ইংরেজ, তারপরে আবার সিপাহী এবং অবশেষে আবার ইংরেজ পালাক্রমে এসেছে আর গিয়েছে—মামুদের হোটেলের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সমান চলেছে, কখনো একদিনের জন্যেও ছেদ পড়েনি। কেবল অবস্থাভেদে একটি পরিবর্তন হত, তা-ও কেমন অনায়াসে, কেমন নিঃশব্দে, কেমন বিনা প্রতিবাদে। সেখানে কখনো উড়েছে নানা সাহেবের নিশান, কখনো কোম্পানির। বদলটা দানিয়েলের ইঙ্গিতেই হত, দুই রকম নিশানই সে সংগ্রহ করেছিল। অনেকে সন্দেহ করে যে আরো অনেক রকম নিশান, যেমন বাদশাহী নিশান, নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিশান, অযোধ্যার নবাবের নিশান প্রভৃতি ও সে সংগ্রহ করে হাতের কাছে রেখে দিয়েছিল। অরাজক দেশে 'অনাগত বিধাতা' হয়ে জীবনযাপন করাই শ্রেয়। নিশান বদলের সময় হলেই দানিয়েল হেঁকে বলত, আরে সুরজপরসাদ, কোম্পানির ঝাণ্ডা খাড়া কর ভাইয়া, নানা সাহেবের রাজ তো শেষ হইয়ে গেল।

অমনি সুরজপ্রসাদ নানা সাহেবের নিশান নামিয়ে ফেলে কোম্পানির নিশান উড়িয়ে দিত।

আবার কখনো বা, আরে সুরজপরসাদ, মালুম হচ্ছে কোম্পানির রাজ বুঝি শেষ হইয়ে গেল, ঝাণ্ডা বদল কর ভাইয়া।

সুরজপ্রসাদ যথাদিষ্ট করে!

মামুদের হোটেল নিরপেক্ষ ‘নোম্যান্সল্যাণ্ড’, এখানে কখনো কোম্পানির ফৌজের হেড কোয়ার্টার: কখনো সিপাহী ফৌজের হেড কোয়ার্টার। এখানে খদ্দেরের প্রয়োজন বোধে নিষিদ্ধ গোস্ত ও সিদ্ধ শাকসব্জি সরবরাহ করা হয়। দানিয়েল বলে ব্যবসায়ীর দেশ নাই, জাত নাই, শত্রু নাই, সে নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষতার জন্যেই হোক বা আর এমন সুবিধা মত বাসস্থান আর নাই বলেই হোক, কোন পক্ষ মামুদের হোটেলের উপরে উপদ্রব করেনি, আর মামুদের হোটেল মানে দানিয়েল সর্বদা প্রবল পক্ষের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে। যার হাতে ডাণ্ডা, ঝাণ্ডা তার কাছে দেশ ঠাণ্ডা—এই ছিল দানিয়েলের সিদ্ধিমন্ত্র। এ হেন মামুদের হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ের উপরে পায়ে শিকলি বাঁধা হয়ে উপবিষ্ট একটি প্রবীণ কাকাতুয়া, যে নাকি আমাদের গল্পের নায়ক। একজন খদ্দের হোটেলের দেনা শোধ করতে না পেরে তার বদলে এই পাখিটি দিয়েছিল দানিয়েলকে। সেই থেকে, তা বেশ কিছুদিন হল, কাকাতুয়াটি রয়ে গিয়েছে মামুদের হোটেলে। পাখিটি সুরজপ্রসাদের বড় পেয়ারের, সে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম বলতে শিখিয়েছিল তাকে। সকাল বেলা স্নানাহার সেরে সে যখন ঝুঁটি বাগিয়ে গম্ভীরভাবে বসে থাকত, মনে হত বাড়ির বুড়ো কর্তা। ভয়ে এগোতে চাইত না কাছে ছেলের দল। আবার যখন কথা বলত, সবাই বলত, আর জন্মে ও নিশ্চয় মানুষ ছিল, পাখির মুখে এমন স্পষ্ট কথা বড় শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল ওর হাসিটা কে শিখিয়েছিল ঐ হাসি তাকে? সুরজ-প্রসাদ বলে, ওটা হাসির মত শুনতে হলেও হাসি নয়, পাখির গলার একরকম আওয়াজ। হাসি হোক আর গলার আওয়াজ হোক, কেউ শেখাক বা স্বভাবলব্ধ হোক, ঐ হাসিতে দিনের বেলাতে চমকে উঠত লোকে—আর নির্জন গভীর রাত্রে ঐ হাসি শ্রোতার অন্তরাত্মার মধ্যে কাঁপন জাগিয়ে দিত—ও যেন রহস্যময় অদৃষ্টের বিদ্রূপের হাসি।

২

কানপুর শহর এখন নানা সাহেবের অর্থাৎ সিপাহীদের অধীনে, অবস্থা সম্পূর্ণ অরাজক। জেনারেল হুইলার আর সাহেবের দল গঙ্গার ঘাটে নিহত হয়েছে। মেম সাহেবের দল আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বন্দী জীবন যাপন করছে বিবিঘরে। তাদের নিয়ে কি করা যায়? নানা সাহেবের ইচ্ছা যেমন

আছে তেমনি থাক, সুযোগ হলে ইংরাজের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু আজিমুল্লা খাঁ আর জুবেদি বিবির ইচ্ছা অন্য রকম।

এরা দুইজন কে? আজিমুল্লা খাঁ সিপাহী পক্ষের একজন প্রধান ব্যক্তি, নানার পরামর্শদাতা অমাত্য। জুবেদি বিবি কে? রঙ্গমঞ্চের উপরে যে অভিনেতা থাকে লোকে দেখতে পায় তাকেই, কিন্তু পর্দার আড়ালে বসে যার সুতো টানে, ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের খবর রাখে কে?

আজিমুল্লা যখন বলত, বিবি, তোমার এত সাহস, এত বুদ্ধি, তুমি এগিয়ে এসো না কেন!

জুবেদি বলত, মিঞা সায়েব, আমরা চিরকাল পর্দানশিন, এখনই বা পর্দার বাইরে যাব কেন?

কেন বুঝতে পারছ না? লোকে তোমাকে নানা সাহেবের সুবাদে নানী সাহেবা বলবে, কাজেও তো তাই।

নানার নানী হয়ে সুখ আছে কি?

তবে কিসে সুখ!

সে তুমি জান মিঞা।

তারপরে বলে, এখন তামাশা রাখ, বিবিগুলোকে খুন না করতে পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

অস্বস্তি কেন?

দেখছ না, এখন পর্যন্ত নানা সাহেব দুই নৌকায় পা রেখে চলছে, আমাদেরও বলছে সাবাস, আবার গোপনে ইংরেজকেও চিঠি পাঠিয়ে বলছে ঘাবড়াও মৎ। এখন তার হাত দুটো বিবিদের রক্তে রাঙিয়ে দিতে পারলে আর ভাবনার কারণ থাকে না।

আজিমুল্লা তার হাতখানা ধরে বলল, জুবেদি, তোমার এত বুদ্ধি!

এই রে, আবার আরম্ভ হল, তোমার এত বুদ্ধি, এত রূপ, এমন যৌবন। ওসব অনেক শুনেছি, চলো এখন নানা সাহেবের কাছে।

রাত তখন গভীর, নানা সাহেব মামুদের হোটেলের হলঘরটার প্রকাণ্ড ফরাসের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করে চিন্তামগ্ন। আজিমুল্লা আর জুবেদি অনেকক্ষণ হল ওকে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছে।

আজিমুল্লা বলছে, মহারাজ, একবার মুখের হুকুমটা দিন, তারপরে আর ভাবতে হবে না।

খাঁ সাহেব, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, হুকুম দেওয়ার পর থেকেই ভাবনার সূত্রপাত হয়।

নানা সাহেবের পায়ের কাছে বসেছিল জুবেদি। সে নানা সাহেবের পা দুখানা কোলের উপরে তুলে নিয়ে বলল, মারাঠা রাজ্যের মহারাজ বলে এই পায়ে প্রণাম করে সুখ নেই, কবে যে হিন্দুস্থানের বাদশা বলে এই পায়ে কুর্ণিশ করতে পারব!

সে শখ যদি থাকে, তবে দিল্লি যাও না, বহাল তবিয়তে আছেন বাহাদুর শা।

সে তো কেবল নামেই বাদশা।

আর আমার নামে তোমরা দুজন বাদশা আর বেগম।

দুজনে সমস্বরে বলে ওঠে, তোবা, তোবা! মহারাজ আমরা আপনার হুকুমের নফর।

না আজিমুল্লা খাঁ, না জুবেদি বিবি, তোমরা আমার হুকুমের মনিব। আমার মুখ থেকে হুকুমটা বের করে নিয়ে মনিবি করতে চাও।

তোবা, তোবা।

আপনি যে হুকুম দেবেন আমরা তাই তালিম করব।

তবে শোন, নারী ও শিশুহত্যার হুকুম আমার দ্বারা হবে না।

শত্রুপক্ষের নারী ও শিশু হলেও হবে না?

এমন কোথায় হয়েছে বলো?

কেন হবে না! খোদ বাদশার হুকুমে দিল্লিতে অনেক বিবি অনেক ছেলে-মেয়ে নিহত হয়েছে।

হয়েছে জানি, কিন্তু কাজটা ভাল হয়নি।

আমরা খবর পেয়েছি, ইংরেজও অনেক পূরবীয়া আওরত ও ছেলেমেয়ে হত্যা করেছে।

তবে সেটাও ভালো হয়নি।

সবাই যদি খারাপ কাজ করে থাকে আপনিও না হয় করলেন। যুদ্ধ তো শাস্ত্রপাঠ নয়।

কোন্ শাস্ত্রে এমন উপদেশ দিয়েছে শুনি?

এদেশের কোন্ শাস্ত্র পরাধীনতার পরে লিখিত হয়েছে? শুনুন মহারাজ যুদ্ধ, বিপ্লব, মহামারী প্রভৃতি আপদকালে সাধারণ বিধিনিষেধ চলে না।

তার মানে ঐ বিবিগুলোকে আর ছেলেমেয়েদের হত্যা করতে হবে। কেন শুনি ?

ইংরেজ ভয় পাবে !

আজিমুল্লা খাঁ তুমি না ইংলণ্ড ঘুরে এসেছ ? ইংরেজকে চিনেছ মনে হয় না। এই হত্যাকাণ্ডটি হলে আপসের পথটি বন্ধ হবে। তাই হুকুমটিতে তোমাদের বড় প্রয়োজন, না !

বড় কোমল স্থানে হাত পড়েছে বুঝতে পেয়ে জুবেদি বিবি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, ঐ বিবিরা যদি মেয়েছেলে হয় তবে মর্দ কে ! ওরা প্রত্যেকে পালোয়ানের বাপ।

রাত্রি আড়াই প্রহরের ঘড়ি বেজে যায়—মীমাংসা হয় না তর্কের।

এবারে আজিমুল্লা খাঁ আর জুবেদি বিবি দুজনেই সুর চড়িয়েছে।

মহারাজ, অনেক করে সিপাহীদের শান্ত রেখেছি, কিন্তু বোধ করি আর বেশি দিন পারব না।

এই হুমকি দিয়েই নিরস্ত্র সাহেবগুলোকে খুন করিয়েছ. এখন আবার চাও অসহায়া মেয়েগুলোকে খুন করতে।

কি করব মহারাজ, এ যে যুদ্ধ !

তার মানে ?

তার মানে যে করেই হোক সিপাহীদের খুশি রাখতে হবে।

যেমন করেই হোক !

যেমন করেই হোক, মহারাজ।

অধর্ম করেও ?

পেশবার রাজ্য কেড়ে নেওয়া বুঝি ধর্ম, পেশবার বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া বুঝি ধর্ম, হিন্দুস্থানের বাদশাহী জুড়ে বসা বুঝি ধর্ম !

তাই বলে অসহায় মেয়ে আর শিশু !

আপনি তো মারছেন না, আপনি তো দেখছেন না, আপনি তো জানছেন না।

কেবল আপনার নামে হচ্ছে, কি বলো ?

জুবেদি বাক্যে মধু ঢেলে দিয়ে বলে, মহারাজ আপনাকে বাতাস করছি, আপনি ঘুমোন, কালকে না হয় আবার চিন্তা করে দেখবেন।

জুবেদি, তোমার মনটি এমন কোমল, তুমি কঠিন হুকুম চাও কেন ?

মহারাজ, দামস্কাসের তলোয়ার দেখেননি, যেমন কোমল তেমনি তীক্ষ্ণ! তারপরে বলে, মহারাজ, আপনি যদি তীক্ষ্ণ হতেন, তবে আমার শুধু কোমল হলেই চলত।

বেশ তো তীক্ষ্ণই না হয় হচ্ছি, কি চাও, একখানা হুকুম তো?

না মহারাজ, আপনার মুখের আধখানা হুকুমই যথেষ্ট।

সে আধখানা কি রকম হলে সন্তুষ্ট হও শুনি!

মহারাজ, মোরাদাবাদী খরমুজার এ আধখানাও যেমন মিষ্ট, ও আধখানাও তেমনি মিষ্ট।

বুঝেছি, বুঝেছি, এখন কি রকম আধখানা চাও বলো—

আমার কি মহারাজকে পরামর্শ দানের যোগ্যতা আছে! তোমরা যেমন ভাল বোঝ তেমনি করগে, মোট কথা যুদ্ধে জেতা চাই, এমনি কিছু বললেই যথেষ্ট।

বেশ তবে তাই বললাম।

এবারে আজিমুল্লা খাঁ আনন্দে বলে উঠল, এই তো হিন্দুস্থানের বাদশার যোগ্য হুকুম! মহারাজ পাপ, অন্যায়, অধর্ম, এসব দিদি বুড়ীদের ছেলে ভোলানো কেচ্ছা!

জুবেদি মধুরে গরলে জড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, এতদিনে মহারাজের হিন্দুস্থানের বাদশাহীর পথ সুগম হল—

অসহায় শিশু ও নারীর রক্ত দিয়ে—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

কে হাসে! বলে চমকে উঠল নানা সাহেব।

কেউ না মহারাজ—ঐ কাকাতুয়াটা।

তাই বলো। বলে নানা সাহেব।

পাখি বোঝা সত্ত্বেও তার বুকের ভিতরে কাঁপতে থাকে। আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে রহস্যময় অদৃষ্টের নির্ঝর থেকে ধ্বনির লহরী উদ্গত হতেই থাকে—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ।

এবারে কানপুর ইংরাজের অধিকারে।

মামুদের হোটেলের হলঘরটাতে তাকিয়া ফরাসের বদলে চেয়ার টেবিল কোচ।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি। তাঁর উপরে হুকুম ছিল যে, লক্ষ্ণৌ শহরে অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্য ও তার নারীদের উদ্ধার করে আনতে হবে, যাতে সেখানে আর কানপুরের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে। কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌর দূরত্ব চল্লিশ মাইল পথ। কানপুরের নীচে নৌকার সাঁকোয় গঙ্গা পেরিয়ে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পথ। স্যার কলিন দেখল যে, কানপুরের দিকের সেতুমুখ যথেষ্ট সুরক্ষিত নয়, অল্প অনায়াসেই শত্রুসৈন্য অধিকার করে নিতে পারে। সেতুটি হস্তচ্যুত হলে বা ভগ্ন হলে লক্ষ্ণৌ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ইংরেজ সৈন্য বিপদগ্রস্ত হতে পারে। সেতুমুখ সুরক্ষিত করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু কিছু বাধাও আছে। সেতুমুখের কাছেই একটি পুরাতন শিবমন্দির। সেটি না ভাঙলে সেতুমুখ সুরক্ষণ সম্ভব নয়।

বারুদ দিয়ে শিবমন্দির উড়িয়ে দেওয়া হবে সংবাদ পাওয়ামাত্র শহরে চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। সিপাহী পক্ষ এখন নিতান্তই নিস্তেজ, তবু যাদের সহানুভূতি সেই দিকে তারা ইশারায় বলাবলি শুরু করল, আরে যারা চর্বি মাখানো টোটা দিয়ে জাত মারতে চায়, তাদের কাছে আবার শিবমন্দির পবিত্রতা!

ওরি মধ্যে আবার যাদের সাহস বেশি তারা বলল, দিক না একবার উড়িয়ে মন্দির, বাবা ত্রিশূল নিয়ে যখন বেরোবেন, তখন ম্লেচ্ছগুলো পালাবার পথ পাবে না।

কিন্তু অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা এই যে, সাংসারিক ফল লাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকের চেয়ে আধিভৌতিকের মূল্য অধিক। তাই তারা একটি ডেপুটেশনে গিয়ে উপস্থিত হল স্যার কলিনের দরবারে অর্থাৎ মামুদের হোটেলের সেই হলঘরটাতে। ডেপুটেশনের প্রধান পূজারী, পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণের দল, সঙ্গে উপযুক্ত দোভাষী।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল তাদের কথা মন দিয়ে শুনে বলল, দেখ তোমাদের অনুরোধ অবশ্যই আমি রক্ষা করতাম, যদি জানতাম যে বিবিঘরের অসহায় শিশু

আর নারীদের রক্ষার জন্য এতটুকু চেষ্টা তোমরা করেছিলে, অন্তত মুখের কথাতেও প্রতিবাদ করেছিলে জানতে পারলেও রক্ষা করতাম তোমাদের মন্দিরটা।

কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সবাই নীরব হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে একজন বলল, কি করব হুজুর সিপাহীরা আমাদের কথা শোনে না।

তবু তারাই তোমাদের দেশের লোক।

আর আপনারা তো হুজুর দেশের রাজা।

তখন তো সিপাহীরাজকেই মেনে নিয়েছিলে।

না মেনে উপায় কি হুজুর, সিপাহীলোক বেবাক ডাকু :

একথা কি তখন মনে হয়েছিল?

মনে বরাবর হয়েছে হুজুর।

মুখে বলেছিলে?

বললেও শুনত না।

তোমাদের দেশের লোকে যদি না শোনে, তবে আমারাই বা শুনব কেন আশা করছ!

হুজুর কী যে বলছেন! কোথায় ডাকু আর চোট্টা সিপাহীলোক, আর কোথায় কোম্পানিরাজ।

নানা সাহেবও কি ডাকু আর চোট্টা!

নানা সাহেবজীর নিজের কথা খাটত না—ঐ আজিমুল্লা খাঁ যা বলত তাই হত।

দোষ যারই হোক, তার জন্যে কোম্পানিরাজ নিজের ক্ষতি করবে কেন?

ক্ষতি কেন করবে হুজুর! ঐ একটা মন্দিরের বদলে শহরের যে-কোন দশটা ইমারত ভাঙবার হুকুম দিন।

তাতে আমার কি লাভ হবে! ঐ মন্দির না ভাঙলে সাঁকো কমজোরি হয়ে থাকবে। আমি দুঃখিত যে তোমাদের অনুরোধ করতে পারলাম না।

অগত্যা ডেপুটেশন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে গেল।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল আপাদমস্তক জঙ্গীলোক। সামরিক প্রয়োজনের চেয়ে বড় কিছু নেই তার চোখে—ঐ উদ্দেশ্যে গীর্জা, কেল্লা, মন্দির সমস্ত সমান নির্বিকারভাবে উড়িয়ে দিতে পারে সে। আবার বিনা প্রয়োজনে পথের কুকুরটাকে মারতে সে রাজী নয়—কুকুরের প্রতি দয়ায় নয়, বারুদ অপচয় হবে

বলে। সতীচৌরা ঘাটের শিবমন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুকুম সে দিয়েছে, ওখানে গীর্জা থাকলেও হুকুম দিতে বাধত না তার।

ডেপুটেশন চলে গেলে মিস্টার রস্টক শুধাল, কি স্থির করলে স্যার কলিন?

নূতন করে আর কি স্থির করব—রণনীতির নিত্য আচরণ তো নির্ধারিত আছেই, সেতুমুখের বাধাটা অপসারিত হবে, সেটা মন্দির কি গীর্জা অবান্তর।

আদৌ অবান্তর নয় স্যার কলিন, গীর্জা আর পৌত্তলিকদের মন্দির এক পর্যায়ভুক্ত নয়, ওটা উড়িয়ে দেওয়াতে তুমি কিছু পুণ্য অর্জন করবে।

একটা লড়াই ফতে করবার সুগৌরবের তুলনায় তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ছিঃ ছিঃ এমন কথা মনে ভাবলেও মুখে বলতে নেই।

স্যার কলিন বলে, আমরা জঙ্গীলোকেরা মুখে মনে এক।

সেইজন্যেই এক ঘোর পৌত্তলিক দেশের আজো এই হেনস্থা, একশ বছর খ্রীষ্টানী শাসনের পরেও এখনো কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এবারে মিঃ রস্টকের কিছু পরিচয় না দিলে পাঠকের প্রতি অবিচার হবে। পাঠক ইতিমধ্যেই নিশ্চয় ভাবতে শুরু করেছেন যে রস্টক পাদ্রী। ভুল হল। তার পিতামহ পাদ্রী ছিল। তার পাদ্রীপনা একপুরুষ ডিঙিয়ে পৌত্রে এসে বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। মিস্টার রস্টক স্বভাবপাদ্রী। সিপাহী বিদ্রোহ বেধে উঠলে খ্রীষ্টানরাজ কিভাবে পৌত্তলিকদের দমিত করে দেখবার উদ্দেশ্যে সুদূর শ্বেত-দ্বীপ থেকে ভারতে এসেছে। আজ মাস দুই এদেশে পৌঁছে খ্রীষ্টানী ফৌজের আচরণ দেখে বড়ই হতাশ হয়েছে স্বভাবপাদ্রী রস্টক সাহেব। এরা বিদ্রোহ দমনে যেমন তৎপর পৌত্তলিকতা উৎপাটনে তেমন নয়। মন্দির ভাঙতে গেলেই এদের বারুদের অভাব ঘটে। রস্টক আজ মাস দুই প্রধান সেনাপতি স্যার কলিনের পিছু পিছু আছে। ডেপুটেশনের প্রতি তার মনোভাব দেখে খুশি হতে পারেনি। মন্দির ভাঙাটাই যথেষ্ট নয়—একটা মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভাঙা হচ্ছে এই কথাটা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

স্যার কলিন বলে, সেতুমুখ সুরক্ষণ, লক্ষ্ণৌ থেকে অবরুদ্ধ নরনারীদের উদ্ধার এর চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে!

কি হতে পারে? পৌত্তলিকদের মন্দির আর বিগ্রহ ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া।

সামরিক প্রয়োজনে তা কখনো কখনো করতে হয়—কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এক ছটাক বারুদ নষ্ট করতে আমি রাজী নই।

রস্টক সখেদে বলে ওঠে, ধিক তোমার অখ্রীষ্টানী মনোভাবকে স্যার কলিন। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করে, স্যার কলিন, তোমরা যদি ভেবে থাক যে, বারুদ বন্দুক সঙীন দিয়ে এদের শাসন করবে তবে মস্ত ভুল করবে।

তবে কি করতে হবে?

তবে কি করতে হবে? পৌত্তলিকতার কেল্লা এই হিন্দুস্থান, উড়িয়ে দাও এর সব মন্দিরগুলো।

মিস্টার রস্টক, আজ যে এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হতে হয়েছে এর কারণ কি জান?

তুমিই বল স্যার কলিন।

এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ফৌজের ধারণা হয়েছিল যে চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে বাধ্য করে কোম্পানি ওদের ধর্মভ্রষ্ট করতে চায়।

শুনেছি।

তবে?

চর্বি মাখানো কার্তুজ ব্যবহার করলে যে ধর্ম নষ্ট হয় তা যত্ন করে রক্ষা করবার মত নয়।

এটা তোমার মত।

তোমার মত কি ভিন্ন?

আধিদৈবিক বিষয়ে আমরা কোন মত পোষণ করিনে, আমাদের কারবার আধিভৌতিক নিয়ে।

সেটা গৌরবের কথা নয়—তবু তোমাকে ধন্যবাদ যে ঐ ভাটি মন্দিরটা ভাঙতে সম্মত হয়েছ।

বাধ্য হয়ে।

এতে কেবল তোমার সেতুপথ সুগম হবে না, সুগম হবে সত্যধর্মের পথ, হিন্দুস্থান এবারে সত্য সত্যই দেবস্থান হয়ে উঠবে।

এমন সময়ে হঠাৎ উত্তরাকাশ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ঘড়ি বের করে দেখে নিয়ে বলল—সময় মতই হয়েছে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে ফেটে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে আর একটা কু-সংস্কারের কেল্লা ভূপাতিত হয়ে পৌত্তলিকদের মুক্তির পথ সুগম করে দিল।

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

কে হাসে, কে, কে, হাসে? বলে ভীত ত্রস্ত রস্টক চিৎকার করে উঠল।

স্যার কলিন বলল, ব্যস্ত হয়ো না, ওটা একটা পাখি মাত্র!

পাখি মাত্র! তাই বল।

রস্টক নিশ্চিন্ত হল কিনা জানিনে, কিন্তু তখনো সেই হাসি রহস্যময় কোন্ অতল গহ্বর থেকে নিদারুণ বিদ্রূপের মত পাক খেয়ে খেয়ে উত্থিত হতে থাকল।

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

৪

কানপুর এবার স্থায়ীভাবে ইংরেজের দখলে এসেছে। লক্ষ্ণৌ ইংরাজের হস্তগত হয়েছে, দিল্লি তো অনেক আগেই হয়েছে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল পরাজিত সিপাহী সৈন্যদলকে তাড়া করে নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে—সিপাহীরা এখন হয় ছত্রভঙ্গ, নয় পরাজিত। হিন্দুস্থান সিপাহীপ্রভাব বিমুক্ত।

কানপুরের মামুদের হোটেলের সেই হলঘরটিতে পূর্বোক্ত মিস্টার রস্টক ও মিস্টার রাসেল সিপাহী বিদ্রোহপ্রসঙ্গে হিন্দুস্থানে ইংরাজ শাসনের ফলাফল আলোচনায় নিযুক্ত। এখন রাত্রি অনেক, আগামীকল্য প্রাতঃকালে মিস্টার রাসেল ইংলণ্ডগামী জাহাজে চাপবার উদ্দেশ্যে কলকাতা রওনা হবে। মিস্টার উইলিয়াম হবওয়ার্ড রাসেল ইংলণ্ডের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রের সংবাদদাতারূপে সিপাহীবিদ্রোহের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে এদেশে এসেছিল, এক বছরের উপর ইংরাজ ফৌজের সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছে—তার সাংবাদিক চোখ এমন অনেক কিছু দেখেছে যা জঙ্গী আদমির বা ইংরাজ কর্মচারীদের চোখে পড়েনি। ইংরাজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সে কৃতনিশ্চয় হতে পারেনি। রস্টকের ধারণা অন্য রকম, সে ধারণা কি রকম তা আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

মিস্টার রস্টক বলছিল—রাসেল, আজকাল, ছন্নছাড়া কানপুর দেখে কানপুরের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে না। যুদ্ধের আগেকার কানপুর দেখলে বুঝতে পারতে ইংরাজ কানপুরের জন্যে তথা হিন্দুস্থানের জন্যে কি করেছিল।

রাসেল বলছিল, স্বীকার করছি যে, যুদ্ধে বারংবার হাত বদলাবার ফলে

কানপুরের আজ দুর্দশা, কিন্তু আমি ঠিক সেকথা ভাবছি না।

তবে ঠিক কি ভাবছ শুনতে পারি কি ?

ইংরাজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসন্দেহ নই।

বিস্মিত রস্টক বলে—নিঃসন্দেহ নও ? কেন আমরা কি সতীদাহ, গঙ্গা-সাগরে শিশুসন্তান নিক্ষেপ বন্ধ করিনি ? আমরা কি পিণ্ডারী ঠগ প্রভৃতি দস্যুদের অত্যাচার দূর করিনি ? তুমি কি ইংরেজের কীর্তিস্বরূপ গঙ্গার খাল, রেলপথ দেখনি ?

অবশ্যই দেখেছি, কিন্তু আরো কিছু দেখেছি যার স্মৃতি ভুলতে পারছি না। কলকাতা থেকে কানপুর আসতে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছি যার দুই দিকে কুঁড়ে ঘর আর নিরন্ন বুভুক্ষু ভিক্ষুকের দল।

এ হচ্ছে যুদ্ধের পরিণাম !

না মিস্টার রস্টক, এ হচ্ছে কোম্পানির শাসনের ফল। অবশ্য যুদ্ধের পরিণামও চোখে পড়েছে—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই দিকে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত তথাকথিত সিপাহীদের মৃতদেহ। আমার বেশ মনে আছে একদিন এক ঘণ্টার পথে এমন বিয়াল্লিশটা মৃতদেহ গুনেছিলাম।

বিদ্রোহের দণ্ড !

সমস্ত দেশ যেখানে বিদ্রোহী শাসক সেখানে সুনামের দাবি করবে কিসের জোরে !

অস্ত্রের জোরে, মিস্টার রাসেল, অস্ত্রের জোরে।

তবে তাকে শাসন বলে দাবি করো না মিস্টার রস্টক, বল সঙ্ঘবদ্ধ দস্যুতা।

তার পরে বলে, মানুষ স্বভাবত দস্যু এদেশে নয়, বিদেশে নয়, কোন দেশেই নয়। তবু যখন তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, বুঝতে হবে শাসনের মধ্যে গলদ আছে।

বিদ্রূপের সুরে রস্টক শুধাল, হে কলমবীর, জানতে পাই কি, কি সেই গলদ !

কোম্পানি এদেশে শাসক নয়,—নিতান্তই এডভেঞ্চারার, ন্যূনতম ব্যয়ে প্রভূততম বিত্ত সঞ্চয় কোম্পানির পেশা।

ধিক তোমার দেশদ্রোহী রসনাকে।

ধীরে বন্ধু, ধীরে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি অবধান কর। ক'মাস আগে আগ্রা গিয়েছিলাম, দেখলাম বিশ্ববিখ্যাত তাজ। কিন্তু প্রথমেই কি চোখে পড়ল জান ? শ্বেত পাথরের গম্বুজের পাশে কার্নিসের ফাঁকে একটি বটগাছের চারা

গজিয়েছে। পাঠান, মোগল, হিন্দুদের আমলে এমন লজ্জাকর অবহেলা ঘটতেই পারত না।

কেন জাঠ, মারাঠা, শিখ, আফগান প্রভৃতি কি মোগল সৌন্দর্যসৌধগুলোর মূল্যবান অলঙ্কার সব অপহরণ করেনি?

তারা নিজেদের শাসক বলে দাবি করেনি।

হাসালে মিস্টার রাসেল, তুমি হাসালে! এতবড় হিন্দুস্থানে এক বছরের উপরে ঘুরে কার্ণিসের ঐ বটের চারা দেখে গেলে। ওতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে কোম্পানির শাসন ব্যর্থ!

ঐ অতটুকু বটের চারাও দেখেছি—আবার এত বড় যুদ্ধটাও দেখলাম।

যুদ্ধ কোথায়? বিদ্রোহ।

য়ুরোপে ঘটলে মহাযুদ্ধ বলে অভিহিত হত, বিদ্রোহ বলে একে তুচ্ছ করাতেই প্রমাণ হয় যে, হিন্দুস্থানে এখনো আমরা শাসকের পদবী অধিকার করতে পারিনি, ক্লাইভের আমলেও যেমন এডভেঞ্চারার ছিলাম এখনো তাই আছি। দেখ না কেন, এদেশের প্রাচীন সব কীর্তি, মন্দির, মসজিদ, সৌধ অট্টালিকা, দীঘি, সরোবর, নগর, গ্রাম আমাদের শাসনের ফলে ধ্বংসপ্রায়। দেশের লোক তার জবাব দিয়েছে আমাদের সিভিল লাইন, বাংলো, ব্যারাক, হোটেল পুড়িয়ে দিয়ে। খুব অন্যায় করেছে কি! গঙ্গার খাল আর রেলপথের কথা তুমি তুলেছিলে, সেই সঙ্গে টেলিগ্রাফ তারের কথাও তুলতে পারতে—কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এই সব খাল, রেল, টেলিগ্রাফের তার হিন্দুস্থানের প্রাচীন কীর্তির শ্মশানের উপর দিয়ে কি যায়নি! আমরা যাতায়াতের সুবিধার জন্যে নূতন পথ তৈরী করেছি—কিন্তু তা আমাদের, শাসকদের সুবিধার জন্যে! আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর সংগ্রহ করেছি—কলকাতা থেকে পনরো-ষোল মাইল দূরে কোন পথ নেই বললেই চলে। কেন? সেখানে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন করে না বলে।

তুমি কি এই সব কথা দেশে গিয়ে রটাবে নাকি?

না। স্যার হেনরি লরেন্সের মুখে যা শুনেছি তাই লিখব—লিখব যে স্যার হেনরি লরেন্সের মত লোকের অভিমত এই যে, কোম্পানির শাসনে প্রজাদের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়নি, মোটের উপরে তারা আগেকার চেয়ে বেশি কষ্টে আছে।

এ যে তুমি সেকেলে বার্ক শেরিডানকেও ছাড়িয়ে গেলে।

তা যদি হয়, তবে তার একমাত্র কারণ কোম্পানি সেকেলে ক্লাইভ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

তাজ্জব করলে হে! তা কোম্পানির প্রতি তোমার সুসমাচারটা কি শুনতে পাই কি?

সুসমাচার দেবার আমি কে? ইতিহাস একমাত্র সুসমাচারদাতা!

তা তোমার ইতিহাস কি বলে শুনি?

ইতিহাস এই কথা বলে যে, ন্যায়নিষ্ঠায় ইংরাজের শাসন যদি পূর্বতন শাসকদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে, তবে অস্ত্রবলে এদেশ শাসন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাতে এমনই বা কি ক্ষতি?

ক্ষতি এই যে, অস্ত্রবলে শাসন করবার হিসাবের খাতাটার যেদিন তলব পড়বে দেখা যাবে যে, ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে গিয়েছে। তখন সেদিন সেই সর্বনাশা হিসাবের চাপে জাত-হিসাবী ইংরাজকে এই সাধের শখের সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে রাতারাতি দেশে ফিরে যেতে হবে।

শুনলাম তোমার কথা, তবে আমিও শেষ কথাটা বলে নিই। প্রয়োজন হলে বাহুবলেই আমরা এদেশ চিরকাল শাসন করব—হিন্দুস্থানে ইংরাজ শাসন অজর অমর অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।

মিস্টার রস্টক হয়তো এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়।

এমন সময়ে অন্ধকারকে তীক্ষ্ণ করাতে বিদীর্ণ করে শব্দ উঠল—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

রাসেল কাকাতুয়ার খবর রাখত না, চমকে উঠে বলল—ও কি?

রস্টক বলল, ভয় পেও না—একটা পাখি মাত্র।

কি জানি কি ভেবে রাসেল আপন মনে বলে উঠল—হিন্দুস্থানের পাখি!

নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিদ্রূপের মত তখনো সেই রহস্যময় তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসি অন্ধকারকে চিরে ফেলতে ফেলতে ধ্বনিত হচ্ছিল—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

বেগম শমরুর তোশাখানা

অবশেষে বেগম শমরু বাগানে এসে বসল, তখন আকাশের দিকে অন্ধকারের উপরে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। জেব থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম বারকয়েক মুছল—দিনের বেলায় বেগমসাহেবা পুরুষের পোশাক পরে থাকে—ঐ তার এক অদ্ভুত খেয়াল। বারকয়েক দীর্ঘ নিশ্বাসে বাইরের হাওয়া বুকের মধ্যে টেনে নিল, খুব তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন আগ্রহে জল পান করে তেমনি ভাবে। নাঃ, তবু ঘামের অন্ত নেই, রুমালখানা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তখন অন্দর-মহলের দিকে তাকিয়ে বলল, কে আছিস, শরাব আনতে বল্। বাগানে সে একাই এসেছিল, বলেছিল কারও আসতে হবে না। এক চুমুকে শরাবের গেলাসটা খালি করে বলল, যা, আমি কিছুক্ষণ একলা থাকব।

বাগানের মধ্যে শব্দের অভাব নেই, বসন্তের বাতাস গাছে গাছে সর সর শব্দ তুলছে, ফোয়ারার জলের ঝির ঝির শব্দ, কোথায় একটা বুলবুলি সন্ধ্যার অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে শিস দিয়ে চলেছে; কিন্তু সব ছাপিয়ে বার বার তার কানে প্রবেশ করছে সেই অন্তিম আর্তকণ্ঠের করুণ মিনতি—বেগমসাহেবা, মাপ কিজিয়ে। শমরু ভেবেছিল শরাবের নেশা পাপের স্মৃতির উপরে রঙীন পর্দা টেনে দেবে, কার্যত হল তার ঠিক উল্টো। মনে একটু একাগ্রতা আসতেই এইমাত্র অনুষ্ঠিত ভয়াবহ কাণ্ডটা গুণীর আঁকা ছবির মত ক্রমে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়ে তার চোখে পড়তে লাগল আর থেকে থেকে কানের মধ্যে বিদ্যুৎশলা ঢুকিয়ে দিতে লাগল, বেগমসাহেবা, কসুর মাপ কিজিয়ে, আউর কভি এসা নেহি করেগি।

শমরু ভাবল, এখন আমিনা থাকলে বেশ হত, আজেবাজে গল্প করে ভুলিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু সে আজ ক'দিন হল যে কোথায় গিয়েছে, পাত্তা নেই। শেষে রাগ হল তরকিলালের উপর। তরকিলাল তার সবচেয়ে বিশ্বাস-ভাজন বন্দী, সমস্ত গোপন পাপকার্যের প্রধান সহায়। মস্ত সেলাম বাজিয়ে উল্লুকটা বলেছিল, সাহেবান, এমনভাবে দরজা গেঁথে দেব ইট দিয়ে যে, কেউ বুঝতে পারবে না ওখানে দরজা ছিল, তার পর একপোঁচ চুন বুলিয়ে দিলেই দেয়ালের সঙ্গে একসা হয়ে যাবে।

শমরু জিজ্ঞেস করেছিল, কতক্ষণ সময় লাগবে?

তখন আর এক আড়াই-হাতী সেলাম বাজিয়ে বলেছিল, সময়? স্রিফ পন্দ্রহ্ মিনট!

নিষ্ফল রাগে গজরায় শমরু। এই তার পনেরো মিনিট! ইঁট-চুন-সুরকি-শাবল-কোদাল-কর্নি নিয়ে এমন এক কাণ্ড করল সে, পাকা দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল—আর সারাক্ষণ ভিতর থেকে কাতরানি এসে পৌঁছেছে।

এই উল্লু, এই তোর পন্দ্রহ্ মিনট?

এই হয়ে গেল সাহেবান।

দরজা যে ভেঙে ফেলল!

সাধ্যি কি বেগমসাহেবা, নেপালী শালকাঠের তৈরী।

দেখছিস কত জোরে ধাক্কা মারছে!

খোদ দুশমন মেয়েটা।

ঠিক বলেছিস, খোদ দুশমন।

তরক্কিলাল ইট গাঁথতে গাঁথতে বলে, দুশমন নয়? দেখুন না সাহেবান, ঘরে ঢুকিয়ে দেবার সময় কামড়ে দিয়েছে হাতে।

পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছিলি? খুলে ফেলবে না তো?

খুলবে ওর সাধ্যি কি! লোহার পাতের উপরে ঘুঙুর পরিয়ে রেখেছিলাম, ওর হাতে পায়ে ইশক্রুপ দিয়ে এঁটে দিয়েছি। ঘুঙুরকে ঘুঙুর, জিঞ্জিরকে জিঞ্জির।

হাতেও এঁটে দিয়েছিস নাকি? বেশ বেশ! হেসে ওঠে শমরু।

তার পরে শুধায়, আপত্তি করেনি?

আপত্তি করলে শুনছে কে! বললাম, আজ সন্ধ্যায় মস্ত জলসা হবে, ঘুঙুর পরো।

জুবেদি হেসে বলল, সন্ধ্যায় তো এত আগে কেন? এখন তো বেলা সবে পাঁচটা। আর তাছাড়া, তুমিই বা কেন? আমি কি ঘুঙুর পরতে জানি না!

আমি বললাম, জান বই কি। কিন্তু এ যে বিলায়েতি ঘুঙুর। পরতে সময় লাগবে আর পরাতেও লোক লাগবে।

আজ এত আয়োজন কেন?

আজ যে ভ্যালর সাহেব থাকবেন।

শমরু শুধায়, ভ্যালয় সাহেবের নাম শুনে ও কি বলল ?

প্রথমে কিছু বলল না, শুধু ঠোঁটের কোণে একটা হাসি চমক মারল আর দুই গালে কুঙ্কুম ছড়িয়ে দিল।

দাঁতে দাঁত চেপে শমরু বলে ওঠে, শয়তানী ! তার পর ?

তখন বলল. বের কর দেখি কেমন তোমার বিলায়েতি ঘুঙুর।

থলি থেকে ঘুঙুর বের হতেই চিৎকার করে উঠল—এ যে জিঞ্জির !

কেউ তো শোনেনি ?

না সাহেবান। তার পর বললাম, আমীর লোকের সঙ্গে পেয়ার করতে গেলে মাঝে মাঝে জিঞ্জির পরতে হয়।

তখন ?

তখন আর কি ! কসাই যে জবাই করে, জানোয়ারটা কি মরতে চায় ? তাই বলে কেউ তো ছাড়ে না, জবরদস্তি করে পরিয়ে দিলাম।

কেউ দেখেনি তো ?

কেউ না।

তুই একলা পরাতে পারলি ?

তরক্কিলাল হেসে বলে, সাহেবান, ঘরে তিন-তিনটে জরুকে জব্দ করে রেখেছি, আর একটা আউরতের সঙ্গে জোরে পারব না ?

নে নে, হাত চালা !

এই হয়ে গেল সাহেবান।

ও কিছু সন্দেহ করেনি ?

করেছে বই কি। আমার চাচা বলে, চোরের মনের মধ্যেই যে চোরাই মাল থাকে। ও বলে উঠল, ভ্যালয় সাহেব ওকে পেয়ার করে বলে বেগমসাহেবা রাগ করেছে। তবে তখনও বুঝতে পারেনি ওর কি হাল হবে, ভেবেছিল বড়-জোর দু-চার দিন ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে।

শমরু শুধায়, তার পরে যখন—

দরজার কাছে ইট চুন-সুরকি দেখে সব বুঝে ডুকরে উঠল।

ঘরের মধ্যে ঢোকাবার পরে কিছু বলল না ?

বলল বই কি, কিন্তু সে কথা নোকরকে শুধাবেন না !

বেয়াদব ! আমি হুকুম করছি, বল্।

তরক্কিলাল শমরুর ক্রোধের পরিণাম বেশ ভাল ভাবেই জানে—না বললে

সমূহ বিপদ, বলাতেও যে বিপদ নেই, হয়তো তা নয়। ভয়ে ভয়ে বলল—ভ্যালর সাহেব জোয়ান মরদ, সে যদি তিনকাল-গত গাল-তোবড়ানো বুড়ীকে ভাল না বাসে তবে দোষ কার? হোক না বেগম, বুড়ী বই তো নয়!

ওসব থাক, আর কি বলল?

বলল, আর দুটো দিন দেরি হলেই আমরা পালাতাম, সোজা পঞ্জাব হয়ে কাশ্মীর।

আমি বললাম, আপাতত এখানে শুকিয়ে মর।

মরব! গর্জে ওঠে শয়তানী, বলে, ভ্যালর সাহেব খবর পেলেই আংরেজের পল্টন নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, তখন বেগমকে শুকিয়ে মরতে হবে এই ভুঁইঘরে!

এতবড় আস্পর্ধা! মনে মনে গর্জে ওঠ শমরু।

বেগমসাহেবা, মাপ কিজিয়ে!

মাপ কিজিয়ে! চোখ দিয়ে আগুন বের হয় শমরুর। মনে মনে বলে ওঠে, এবার তোশাখানা তৈরি হল, ভ্যালর এসে খুললেই হয়।

সেই বুলবুলি-ডাকা বসন্তের সন্ধ্যায় একা বসে বসে কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে শমরুর। সে ভাবে, দূর হোকগে ছাই, ওসব কথা আর ভাবা কেন! কিন্তু পারে কই? পাপ একাধারে ভয়াবহ ও রমণীয়, মাথায় মণি-জলা সাপের মত, ভয়ের সঙ্গে ঐ রমণীয়তাটুকু না থাকলে সংসারে পাপের পরিমাণ বোধহয় কম হত। পারে না শমরু, রমণীয়তার মণি আকর্ষণ করে ওর চিত্তকে, কখন অজ্ঞাতসারে পূর্বকথা আবার মনে পড়ে।

আমিনার নাম করে কাঁদাকাটি করল না?

না সাহেবান।

ভারি আশ্চর্য!

আশ্চর্য বই কি, আমিনা ছাড়া তো ওর আপন লোক কেউ নেই—অথচ এমন বিপদে তার নাম একবারও করল না।

গেল কোথায়? কাল সন্ধ্যাতেও যেন দেখেছি। কাল রাতে আমাকে সেতার শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছে—আজ সকাল থেকেই দেখছি না।

তরক্কিলাল বলে, কোথায় আর যাবে, আছে এইখানেই কোথাও।

একবার একটা অসম্ভব সম্ভাবনা চমক মেরে যায় শমরুর মনে, বলে, তুই অন্ধকারে ওকে ধরে নিয়ে এসেছিস, জুবেদি ভেবে আমিনাকে ধরে আনিসনি তো?

কি যে বলেন সাহেবান!

ওরা পিঠোপিঠি বোন—

হোক না কেন। তার পরে মনে মনে বলে, অন্ধকারে হাতড়ে আমিনা-জুবেদি-শমরুতে তফাত যদি না বুঝতে পারল তবে আর সে তরক্কিলাল কেন?

ওদের দেখতে এক রকম, গলার স্বরও অনেকটা একরকম—

তরক্কিলাল কিছু বলে না, কিন্তু যা ভাবে তা মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, ভাবে, এক রকম হলে ভ্যালর সাহেব আমিনাকে বেছে না নিয়ে জুবেদিকে বেছে নেবে কেন? অনেক তফাত, অনেক তফাত!

দেখিস্, ভুল হলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

তরক্কিলাল চুন-সুরকির পলস্তারার উপরে কলি বুলোতে বুলোতে বলে, আমিনা হলে ভ্যালর সাহেবের নাম করবে কেন?

যুক্তিটা মোক্ষম, উত্তর করবার কিছু নেই, ইচ্ছাও নেই শমরুর। কথাটা চাকর-বাঁদীর মহলেও জানাজানি হয়ে গিয়েছে ভেবে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে।

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায় সে বাগানের দিকে, আর ইঁট খুলে কেউ ওকে মুক্তি দিতে পারবে না, ইচ্ছা থাকলেও আর সম্ভব নয়, আর এই সরধানা শহরে, শমরুর রাজধানীতে তেমন ইচ্ছাই বা কার হবে?

এমন সময়ে একজন বাঁদী এসে কুর্নিস করে জানায়, ভ্যালর সাহেব আর সব আমীর লোক হাজির হয়েছেন।

শমরু বলে, আচ্ছা আসছি—তুই যা।

২

আঠারো শতকের শেষ দিকের হিন্দুস্থান মস্ত একটা গো-ভাগাড়ে পরিণত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের শবদেহটার উপরে এসে জুটেছিল দেশ-বিদেশের শেয়াল-শকুন। ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান, আর্মেনিয়ান, রাশিয়ান, আফগান, আরও কত বিদেশের ভাগ্যান্বেষী। দেশী ভাগ্যান্বেষীরও অভাব ছিল না—মারাঠা, শিখ, জাঠ, আফগান। মুঘল বাদশাহীর টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে এখানে-ওখানে গড়ে উঠল নূতন নূতন রাজ্য, নূতন নবাবী, নূতন জায়গীর। এই সব ভাগ্যান্বেষীর একজন রাইনহার্ট, জাতে জর্মান, হিন্দুস্থানের ইতিহাসে জেনারেল শমরু নামে পরিচিত। রাইনহার্ট শেষ বয়সে একটি তরুণী সুন্দরীকে বিয়ে

করে। বেগম শমরু নামে সে খ্যাত, তার খ্যাতি ছাড়িয়ে গিয়েছে স্বামীর খ্যাতিকে। স্বামীর মৃত্যুর সময়ে শমরুর বয়স ত্রিশের নীচে। স্বামীর জায়গীর, ধনবল ও সৈন্যবলের সঙ্গে যুক্ত হল বেগমের বুদ্ধি, সাহস ও রাজনীতিজ্ঞান, আর সমস্ত মিলে বেগম শমরু একজন প্রধান গণনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠল—পশ্চিমী ও বাদশাহ, দুয়েরই সে মান্য বন্ধু।

তার ধনের লোভে, জায়গীরের লোভে, আর শূন্য পতিপদের লোভে, রাজধানী সরধানাতেও দেখা দিতে লাগল ভাগ্যান্বেষীর দল। নবাবহীন বেগম পদ শোভন নয়, অনেকেই নবাবপদ-পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল। ফরাসী ভাগ্যান্বেষী মঃ ভ্যালর তাদেরই একজন।

৩

নাচের আসরে নাচ চলছে। সেকালে বেগম শমরুর নাচের আসরের খুব নাম ছিল। মীরাট থেকে, এমন কি দিল্লী থেকে আমীর-ওমরাহ-রঈস লোক সব নিমন্ত্রিত হয়ে আসত, কোম্পানীর সাহেবরাও নিমন্ত্রণ পেত। আজও আসর খুব জমকালো। মাঝখানে বসেছে বেগমসাহেবা, একপাশে সিপাহসালার জেনারেল টমাস আর একপাশে মঃ ভ্যালর। চতুর শমরু এদের দুজনকে কখনও পাশাপাশি বসতে দেয় না, যে-কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। টমাস পুরাতন বিশ্বস্ত সুদক্ষ লোক আর ভ্যালর নবাগত হলেও ইতিমধ্যেই তার হৃদয় জয় করে ফেলেছে; কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে পারে না শমরু—তাই দুজনের মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করে শান্তিরক্ষা করে চলে।

সকলেই মুগ্ধভাবে নাচ দেখছে, কেবল দুজন ছাড়া—শমরু আর ভ্যালর। ওদের নাচে মন নেই, অবশ্য চোখ আছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলেই বুঝতে পারা যায় মন অন্যত্র। ভ্যালরের চোখ নর্তকীদের মধ্যে সন্ধান করছে জুবেদিকে। কোথায় সে? গবেষণাটা রয়ে-সয়ে চালাতে হয়, শমরু বুঝতে পারলে জুবেদির রক্ষা থাকবে না। হয়তো বুঝতে পেরেছে—অন্তত আমিনাকে জেরা করে সেই রকম মনে হয়েছিল ভ্যালরের। ভ্যালর বুঝেছিল জুবেদিকে পাওয়ার অন্তরায় দুজন—আমিনা আর শমরু। শমরুর বাধার অর্থ সে বুঝতে পারে, কিন্তু আমিনার বাধার অর্থ কি? ভ্যালর আর জুবেদির প্রণয়-বৃত্তান্ত শমরুর কানে সে পৌঁছে দেয় কেন? শুধুই কি প্রভুভক্তি? ভাগ্যান্বেষী ভ্যালরের কাছে প্রভুভক্তি, সত্য, নিষ্ঠা প্রভৃতি শব্দমাত্র। সে ধারণা করে, আর কিছুই নয়, জুবেদির প্রতি তার আসক্তিতেই আমিনা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

অনুমানটা যে সত্য, তা তো হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে গেল। একটু ভালবাসার ছল করে ডাকতেই কাল রাতে সাড়া দিয়েছিল, ভ্যালরের নির্দেশমত গোপনে একাকী দেখা করতে এসেছিল। ভ্যালর নিশ্চিন্ত হয়, আর সে বাধা জন্মাবে না। কিন্তু জুবেদি কোথায়? তার চোখ চঞ্চলভাবে সন্ধান করে।

শমরু মনে মনে পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করে। যতই সন্ধান কর, আর তোমার পিয়ারীর সাক্ষাৎ পাবে না। শয়তান! ভ্যালর আর জুবেদি'র মধ্যে কার উপর যে তার বেশি ক্রোধ, ঠিক বুঝতে পারে না। একবার মনে হয় ভ্যালরের উপর, একবার মনে হয় জুবেদির উপর। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের— কখনও কখনও নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে। কেন সে আমল দিতে গেল এই ভাগ্যান্বেষীটাকে! লোকটাকে আমল দেওয়াতে—তার বেশিও যে কিছু দিয়েছে তা নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না শমরু—পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারীর দল চটেছে, সবচেয়ে বেশি চটেছে জেনারেল টমাস। জেনারেল টমাসের বাহুবলেই শমরুর বাহুবল, টমাস যদি রাগ করে চলে যায় তবে তার জায়গীর রক্ষা করাটাই দায় হয়ে উঠবে। অবশ্য, ক্রোধের তাপ বেশিক্ষণ থাকে না, তখনই মনে পড়ে ভ্যালরের ভালবাসা, চোখে পড়ে তার বীরবপু। প্রতিহত ক্রোধ ফিরে গিয়ে পড়ে হতভাগিনী জুবেদির উপর! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার সাহস! নে, এখন না-খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মর্।

আসরের শিষ্টাচার রক্ষা করে চলতে হয়, নতুবা সে কি করে বলত বলা যায় না। এই সময়ে আমিনা থাকলে ভ্যালরের কাছে পাঠিয়ে মনের কথা জেনে নেওয়া যেত। গত কাল রাতে তার ইঙ্গিতেই তো সাড়া দিয়েছিল ভ্যালরের ডাকে। তার পরে কোথায় যে গেল! না, সেটাও ভুলল ভ্যালরের জাদুতে? নাঃ দুনিয়ায় সকলেই বেইমান।

৪

কয়েকমাস আগে নবাগন্তুক তরুণ ভ্যালরের মসৃণ টাক যখন শমরুর দরবারের দিগন্তে চক চক করে উঠল, তখন কেউ চিন্তিত হয়নি, সকলেই ভেবেছিল কিছুদিন এই ভাগ্যান্বেষীটি দিগন্তের ধারে উঁকিঝুঁকি মেরে আবার বৃহত্তর জগতে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এমন ঘটনা দেশের বড় বড় রাজা-নবাবের দরবারে হয়ে থাকে, সরধানার দরবারেও আগে ঘটেছে। কিন্তু দেখা গেল যে, ভ্যালরের ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটল। নবোদিত গ্রহ বেগম-সাহেবার

অনুকূল ইঙ্গিতে প্রহরে প্রহরে বৃহত্তর উজ্জ্বলতর হতে হতে ক্রমে উচ্চতর আকাশে উঠতে শুরু করল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আর সন্দেহ রইল না যে বেগমসাহেবার বিশেষ অনুগ্রহভাজন সে। এবারে দরবারের প্রধান পাত্রদের সঙ্গে রেষারেষি শুরু হয়ে গেল ড্যালরের। কিন্তু যেখানে আকর্ষণটা আসছে খোদ বেগমের দিক থেকে, সেখানে প্রতিরোধ সম্ভব নয়। ক্রমে ড্যালরের আসন নির্দিষ্ট হল প্রায় উচ্চতম স্থানে, প্রায়, কিন্তু সর্বোচ্চে নয়। সকলের উচ্চে তখন আসীন ছিল জেনারেল টমাস। হিন্দুস্থানব্যাপী অশান্তির দিনে সুদক্ষ সেনাপতিকে বাদ দিয়ে রাজ্যরক্ষা করা চলবে না জানত শমরু—তাই টমাস রয়ে গেল। তবে শমরুর হৃদয়ে কার আসন সবচেয়ে উঁচুতে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ রইল না। সবাই বুঝল একদিন টমাসকেও যেতে হবে, আর বুঝল একদিন হয়তো ড্যালর সাহেব বেগমসাহেবার পাশে গিয়ে বসে শূন্য নবাবপদ পূরণ করে তুলবে। সকলে নিষ্ফল আক্রোশে সমস্ত অপমান পরিপাক করতে বাধ্য হল। সভাসদের পক্ষে অপমানপরিপাক-শক্তি অপরিহার্যতম গুণ।

ড্যালর বয়সে অন্তত পনেরো-কুড়ি বছরের ছোট শমরুর চেয়ে। এমন ক্ষেত্রে দুজনের প্রণয় কিছু বিস্ময়কর। কিন্তু সত্যিই কি কিছু বিস্ময়ের আছে? অসম অবস্থার মধ্যেই প্রণয় তো স্বাভাবিক। উপরের জল নীচে তোড়ে নেমে এসে ঝরনার সৃষ্টি করে, নীচের জল তোড়ে উপরে লাফিয়ে উঠে সৃষ্টি করে ফোয়ারার। সমাবস্থার প্রণয়, সে এত নিত্যকার ব্যাপার, কারও চোখে পড়ে না। ড্যালর এক হাতে শমরুর হৃদয়টি অধিকার করে নিয়ে যখন আর এক হাত বাড়িয়েছে তার রাজ্য রাজধানী আর বহুখ্যাত তোশাখানার দিকে, সেই সময়ে ঘটনার আর এক পরিবর্তন ঘটল।

শমরুর দরবারে এসে উপস্থিত হল আমিনা আর জুবেদি। তরুণী, সুন্দরী, কাশ্মীরের মেয়ে। গায়ের রঙে নিয়ে এল কাশ্মীরের তুষার আর জাফরানের মিশল। কৈশোর পেরিয়ে সবে তারা যৌবনে পদার্পণ করেছে, কিন্তু এখনও সে খবরটা দেহ পেরিয়ে মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়নি। কাশ্মীরের মেয়ে দুটিকে শমরু আদরে গ্রহণ করল, সে নিজেও কাশ্মীরের মেয়ে কিনা। এদের আগমনে ও অভ্যর্থনায় কেউ বিস্মিত হল না—এরাও এক জাতের ভাগ্যান্বেষী। নানা দরবারে ঘুরতে ঘুরতে অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবনাবসান ঘটে এদের—কখনও সিংহাসনে, কখনও কোতলখানায়।

আমিনা আর জুবেদি পিঠোপিঠি বোন, বয়সে খুব বেশি হবে তো দেড় বছর

দু বছরের মাত্র ব্যবধান। নাচতে গাইতে, কাশ্মীরের কেচ্ছা বলে বেগম-সাহেবাকে ঘুম পাড়াতে ওদের জুড়ি নেই। ড্যালরের আগমনে যেমন দরবারে দেখা দিয়েছিল মনস্তাপ, এদের আগমনে তেমনি দেখা দিল মনস্তাপ অন্দর-মহলে। সন্ধ্যাবেলায় রঙমহলে যখন শমরু শরাব আর ড্যালরকে নিয়ে বসত, আমিনা আর জুবেদি থাকত পাশে দাঁড়িয়ে। পাত্র শূন্য হয়ে গেলে পূর্ণ করে দিত তারা। সুরা-জড়িত কণ্ঠে শমরু হুকুম করত, সিতার বাজা, কিংবা কাশ্মীরের কিস্‌সা বল। সিতারের রবে কিংবা সিতারের চেয়ে মধুরতর কণ্ঠস্বরে শমরুর চোখ ঢুলে আসত নেশাজড়িত নিদ্রায়, বলে উঠত, পিয়ারা—

ড্যালর খুব হিসেবী লোক, বলত, বেগমসাহেবা। শমরু জেদ করত, আর কিছু বলে ডাকো—অনেক জেদাজেদির পরে বলত, পিয়ারী। হিসাব করে যে প্রেম করতে পারে, তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধির কাজ। কিন্তু যে অবস্থায় পড়লে বুদ্ধি বিদায় নেয়—শমরুর এখন সেই অবস্থা। তার পরে ড্যালরের বাহু আশ্রয় করে স্খলিত পদে শমরু চলে যেত শয়নকক্ষের দিকে। সিতার আর সুরাপাত্র তুলে নিয়ে প্রস্থান করতে করতে আমিনা আর জুবেদি কি ভাবত কে জানে। একে নারী, তায় যুবতী, তায় ভাগ্যান্বেষী। তবু মুখের কথায় যদি মনের ভাব প্রকাশ পায় তবে বলতে হবে যে, এই ব্যাপারটা ওদের বড় ভাল লাগেনি।

জুবেদি বলল, দেখলে বহিন, বেইমানী কাণ্ড!

আমিনা বলল, চুপ চুপ, কে কোথা থেকে শুনবে। তাছাড়া নবাব-বেগমের ব্যাপারে আমাদের থাকবার কি দরকার!

জুবেদি বলল, আমি কি বেগমসাহেবাকে বলছি—বলছি ঐ মর্দটাকে, বেইমান তো ও!

আমিনা বলে, জুবেদি, তুই একদিন বিপদে পড়বি।

পড়লামই বা—ঐ পুরুষটাকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।

বেগমসাহেবা পারলে, তুই বা না পারবি কেন? ও-ও তো আমাদের মত বেগানা আদমি।

সেই জন্যই তো গোঁসা।

তবে তুই গোঁসা কর্—আমি চললাম, রাত অনেক হয়েছে।

তখন দুজনে প্রস্থান করে।

আমিনার স্বভাবে কাশ্মীরের তুষারের গুণ কিছু বেশি; সে শান্ত, বিবেচক,

বিষণ্ণ আর জুবেদীর স্বভাবে কাশ্মীরের জাফরানের রঙ কিছু বেশি, সে চঞ্চল, ছলাকলাময়ী, ভাবগ্রাহী আর উত্তেজনাপ্রবণ। হয়তো সেই জন্যই সে অধিকতর সুন্দর, অন্তত সেই রকম ধারণা ভ্যালরের। ইতিমধ্যেই সে জুবেদিকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করেছে।

৫

তার পরে কিছুদিন গিয়েছে। গ্রহের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে হয়েছে সঞ্চার, মানুষের ভাগ্যলিপি গিয়েছে বদলে। অস্তায়মান শশিকলায় যে চকোর সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দেখেছিল,এবারে তার চোখে পড়ল পূর্ণিমার পরিপূর্ণ রাকা ; তার প্রার্থনা, পক্ষ ও আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভ্যালর এখন জুবেদির রূপে মুগ্ধ। কথাটা প্রথমে চোখাচোখিতেই ছিল, অবশেষে কানাকানি হতে হতে বেগমের কানে গিয়ে পেঁছিল। বেগম আমিনাকে ডাকিয়ে বলল, তোর বহিনকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

আমিনা মস্ত সেলাম করে বলল, সাহেবান, ও সব মিথ্যা কথা, পাঁচজনে হিংসায় রটাচ্ছে।

এক সময়ে গোপনে জুবেদিকে ডেকে সব কথা শোনাল, বলল, বহিন, বেগম-নবাবদের খানার মেজ থেকে যে টুকরো-টাকরা পড়ে, তা খাও আপত্তি নেই, কিন্তু একেবারে খানার মেজে হাত বাড়ানো কিছু নয়। বাঁদী লোকের সাবধান হয়ে চলতে হয়।

জুবেদি রেগে উঠে বলল, কে বাঁদী, আর কে বেগম? ঐ গাল-তোবড়ানো বুড়ীটা বেগম আর আমি কিনা বাঁদী!

আমিনা বলল, তুই সুন্দরী হতে পারিস—কিন্তু বেগম ঐ শমরু সাহেবা।

দেখা যাবে! বলে যৌবনের বাতাস পালে লাগা বজরার মত সগর্বে সে চলে গেল।

গভীর রাত্রে দিলখুশা মহালের বাগানের মধ্যে নিয়মিত স্থানে জুবেদি ও ভ্যালর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

জুবেদি বলছিল, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, চল দুজনে পালাই।

কোথায় যাব?

কেন, তোমার দেশে।

সে যে অনেক দূর।

জুবেদি বলে, তবে আমার দেশে।

সেখানেই যেতে হবে। তবে একবারে খালি হাতে যাব?

জুবেদি হেসে বলে, খালি হাতে কেন, আমাকে তো নিয়ে যাচ্ছ।

তার কথায় ভ্যালর হেসে ওঠে।

দুজনের হাসির চকমকি-ঠোকা লেগে অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে।

ভ্যালর তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, জুবেদি, তোমাকে নিয়েছি দিলের তাঞ্জামে, কিন্তু হাতেও তো কিছু নেওয়া চাই।

কি নেবে?

বেগম শমরুর তোশাখানার নাম শোননি?

শুনিনি! কাশ্মীর অবধি পৌঁছেছে তার খ্যাতি, সেইজন্যেই তো দিল্লীর বাদশাহের দরবারে না গিয়ে এখানে এসেছি।

আমিও। বলে ভ্যালর।

হিন্দুস্থানে এত টাকা-কড়ি হীরা-জহরৎ আর কারও তোশাখানায় নেই।

তোমার তাতে লাভ কি?

হাতে এলেই লাভ।

হাতে আসবে কি করে?

ভুলিয়ে-ভালিয়ে খবরটা জানতে পারলেই হাতে আসবার উপায় করব।

শুনেছি বেগম ছাড়া সে খবর আর কেউ জানে না।

বেগম জানলেই হল।

তোমাকে কি জানাবে?

এখনও জানায়নি, তবে জানতে পারব বলেই মনে হচ্ছে।

কথাটা জুবেদির বিশ্বাস হল না ভেবে ভ্যালর বলল, তুমি ভাবছ আমাকে জানাবে কেন? আরে, আমার মুখের পিয়ারী ডাক না শুনলে যে তার ঘুম আসে না!

সেই অন্ধকারের মধ্যেও সে বুঝতে পারল যে, কথাটা জুবেদির ভাল লাগল না। তাই তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল—আসল পিয়ারী তুমি।

জুবেদি বলল, তুমি সাবধানে থেকো। আমার জন্যে ভাবি না, ভয় তোমার জন্যে।

ভ্যালর শুধায়—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের কথা কেউ বুড়ীর কানে তুলেছে, কে তুলেছে, আমিনা?

জুবেদি হাঁ না কিছুই বলে না, তাতেই সন্দেহটা প্রত্যয়ে পরিণত হয়।

ভ্যালর ভাবে ওকে দূর করতে হবে—ছোট্ট এতটুকু একটা কাঁটা কি সে উৎপাটন করতে পারবে না ?

৬

পিয়ারী, পিয়ারী !

শমরু উত্তর দেয় না।

তুমি কি গোঁসা করলে পিয়ারী ?

এবারে শমরু বলে, না, গোঁসা করিনি, বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

আমি থাকতে দুশ্চিন্তা কেন ?

তুমি যেমন আছ তেমনি আছে মাধাজী সিন্ধিয়া, আফগান লুঠেরা গোলাম কাদির, উত্তরে শিখরা মাথা তুলছে, দক্ষিণে জাঠরা। দুশ্চিন্তা নয় কেন ? হিন্দুস্থানময় যে গদর্ (অশান্তি)।

এ অশান্তি তো সকলেরই।

সকলেরই কি এত ধন-দৌলত হীরা-জহরৎ !

তবু ভাল যে এতদিনে বিশ্বাস করে কথাটা স্বীকার করলে। কতদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তো কিছু বলনি।

নতুন লোককে কি গুপ্তধনের কথা চট করে বলা যায়—একটু বাজিয়ে নিতে হয়।

বাজিয়ে কি দেখলে ?

খাঁটি সোনা।

দুজনেই হাসে, দুজনের অধরোষ্ঠে দুখানা ছোরা ঝক ঝক করে ওঠে।

দুজনের এক শয্যার ঘনিষ্ঠতা, বিশ্রব্ধ সংলাপ শুনলে মনে হয় এরা নিবিড় প্রেমে সংবদ্ধ। বস্তুত ঠিক উল্টো। এরা হিংস্রতম শত্রু। দুজনে মনে মনে ছোরা শানাচ্ছে। একজন ভাবছে, তোমার তোশাখানা লুণ্ঠন করে জুবেদিকে নিয়ে পালাব। আর একজন ভাবছে, কতক্ষণে তোমাকে দেখাতে পারব জুবেদি কুত্তীর মুর্দা, তার পরে আছে জল্লাদ, এক কবরে তোমাদের পুঁতব। বেইমান, বেইমানী ! এই তো প্রেম। দূর থেকে দেখলে হিংসা ও প্রেমে পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না, দুয়ের বাহ্যলক্ষণ অনেকটা একরকম।

জুবেদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর থেকে তোশাখানার খবর জানতে চেষ্টা করেছে ভ্যালর। তোশাখানার যে নিষ্ঠুর ভূমিকা তৈরি করে রেখেছে শমরু,

সে পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। জুবেদিকে ঘরে বন্দী করবার পরেও শমরুকে অপেক্ষা করতে হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা কাল। প্রথম প্রথম ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের ধ্বনি এসে পৌঁছত। হয়তো তা ধ্বনি নয়, শমরুর স্মৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তবু বিপদের ঝুঁকি নিতে পারেনি। এখন বেশ ভাল করে কান পেতে শুনেছে গলার আওয়াজ আর নেই, তবে এখনও জীবিত আছে, হাত-পা নাড়লে ঘুঙরের টুংটাং শুনতে পাওয়া যায়। শমরু ভাবে ভালই হল, মোহরের শব্দ মনে করবে ড্যালর। এই চব্বিশ ঘণ্টা কাল ড্যালর দেখতে পায়নি জুবেদিকে। তার কোন সন্দেহ হওয়ার কথা নয়; জবেদি বলেছিল, গোটা দুই দিন আমি একটু আড়ালে থাকব, এর মধ্যে সম্ভব হলে তোশাখানার খবর জেনে নিয়ে ব্যবস্থা করে:—সম্ভব না হয় দুজনে খালি হাতেই পালাব। মোট কথা, এখানে আর নয়। বেগমসাহেবা সব জানতে পেরেছে—শয়তানী রাগলে জল্লাদনী!

পিয়ারা।

কি পিয়ারী?

আজ শয়নঘর কেন বদলেছি জান?

পিয়ারী, আমি তো তোমার মনের কথা জানতে চেষ্টা করি না, সে অবসর কই, তোমার রূপেই আমি মুগ্ধ।

মুখের কথার প্রমাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ড্যালর চুম্বন করল শমরুর গালে, বাসি মাংসের মত বিরস বোধ হল।

শোন তবে, আজ আমরা শয়ন করেছি তোশাখানার ঠিক উপরে।

সত্যি?

লোভে চক চক করে ওঠে ড্যালরের চোখ দুটো।

বিশ্বাস না হয়, মেঝেতে কান পেতেই দেখ।

কেন?

দেখই না।

ড্যালর মেঝেতে কান পাতে, চমকে উঠে বলে—এ কি, টুংটাং আওয়াজ কিসের?

মোহরের।

মোহর! কত?

সে কি গোনাগাঁথা আছে! রাশি রাশি মোহর, হীরা-জহরৎ মেঝেতে ঢেলে রাখা আছে।

কিন্তু শব্দ কিসের ?

অনেক দিনের বন্ধ ঘর, ইঁদুর-আরসোলা জুটেছে—তাদেরই ছুটোছুটিতে শব্দ উঠছে !

হঠাৎ একটা বাস্তকোচিত প্রশ্ন করে বসল ভ্যালর—ওরা খায় কি ?

যারা হীরে-জহরতের মধ্যে বাস করে তাদের বুঝি খিদে পায় ?

কিন্তু যদি পায়—

তখন তারা একজন আর-একজনকে ধরে খায় !

তার পরে মনে মনে বলে, যেমন আমি তোমাদের দুজনকে খেতে চলেছি।

ভ্যালর মনে মনে ভাবে, জুবেদির গা ভরে হীরার গহনা করে দিতে হবে, কেমন মানাবে ওকে !

শমরু শুধায়, একবার দেখবে না ?

ভ্যালর ভাবে, শমরু একবারেই মজেছে। তবু উদাসীনতার ভান করে বলে, কি লাভ ? তোমার থাকলেই হল, তাতেই আমি খুশি। একটু থেমে বলে, তবে কি জান, ধনদৌলত এখান থেকে সরানো নিরাপদ মনে হয়।

আমারও তাই মনে হয়।

ভ্যালর বলে, কিন্তু নিয়ে যাবে কোথায় ?

কেন, কাশ্মীরে। চাপা ব্যঙ্গের স্বরে বলে শমরু। অবশ্য বুঝতে পারে না ভ্যালর।

সে বলে, না, অত দূরে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। পথে বিপদ আছে। তবে কত কি আছে একবার দেখা উচিত, তাহলে বুঝতে পারা যাবে বহন করতে কতগুলো উট লাগবে।

তবে কাল সন্ধ্যাবেলা—একটু নির্জন হলে—তোমাকে নিয়ে ঢুকব তোশাখানায়। এখন ঘুমোও।

দুজনে মনে মনে ছোরা শানাতে শানাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভ্যালর স্বপ্ন দেখে জুবেদি যেন হীরার কারাগারে বন্দী—বলছে, মুক্তি দাও। ভ্যালর বলছে, হীরার কারাগার থেকে কে কবে মুক্তি চেয়েছে। জুবেদি তুমি বড় বোকা।

শমরু স্বপ্ন দেখে তার জানালার উপরে একজোড়া শুক-শারী মুখচুম্বনে নিযুক্ত। সাড়া পেতেই তারা ভ্যালর-জুবেদি হয়ে উড়ে পালায়। স্বপ্নে গর্জন করে ওঠে, বেইমান, বেইমানী !

গা-আঁধারি সন্ধ্যার অন্ধকারে তরক্কিলাল শাবল দিয়ে সেই দরজার গাঁথুনি ভাঙছে; পিছনে দাঁড়িয়ে শমরু আর ভ্যালর। শমরু অন্য লোক ডাকেনি, পাপের সাক্ষী কেউ বাড়াতে চায় না, না বেগম না বাঁদী। শমরুর ভয় ছিল পাছে ও বেঁচে থাকে, কিন্তু বারো ঘণ্টার মধ্যে নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়নি, তরক্কিলাল বলে, হয়ে গিয়েছে।

শমরু বলে, ভ্যালর. আমার মনে হয় পাহাড়ের গুহায় নিয়ে লুকিয়ে রাখা নিরাপদ।

ভ্যালর বলে, তাতে জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা। শহরের কাছেই কোথাও পুঁতে রাখা উচিত, প্রয়োজন হলে সরানো যাবে, তুলে আনা যাবে।

তরক্কিলাল ভেঙে চলে।

ভ্যালর ভাবে, জুবেদি এখন নিরাপদে থাকলে হয়।

শমরু ভাবে, আমিনা যদি পালিয়ে থাকে ভালই হয়েছে।

ক্রমে দরজার ফাঁক প্রশস্ত হয়। আর ক'খানা ইঁট সরাতেই সমস্ত দরজাটা প্রকাশ পায়, তরক্কিলাল প্রকাণ্ড চাবি দিয়ে প্রকাণ্ড তালা খুলে ফেলে দরজায় ধাক্কা দেয়—দরজা খুলে গিয়ে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বের হয়। ভ্যালর বলে, অন্ধকার যে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

শমরু বলে, তরক্কিলাল, বাতি।

তরক্কিলাল চকমকি ঠুকে শোলা জ্বালায়। অন্য আলো আনতে নিষেধ ছিল। আলো পাপের শত্রু, পাপের চেয়ে বেশি ভয় পাপের প্রকাশকে।

সেই ক্ষীণ আলোয় ভ্যালর দেখতে পায় শূন্য ঘরের রিক্ত মেঝের উপরে নতজানু হয়ে মুখ নীচু করে মরে পড়ে আছে জুবেদি। এক বিদ্যুৎ-চমকে সমস্ত পূর্ব ইতিহাস পরিষ্কার হয়ে যায় তার মনে।

শমরুর মুখে তাকিয়ে দেখতে পায় অপূর্ব এক তৃপ্তির হাসি।

তখন ভ্যালর দৈবপ্রেরণার বশে বলে ফেলে, একি করেছ বেগমসাহেবা—এ যে জুবেদি ভেবে আমিনাকে এনে খুন করেছ! বেগমের এমন ভুল সাজে না।

ভ্যালর বেশ জানে, আমিনা আর জুড়ি মেলাতে আসবে না।

শমরুর মুখে কালি মেড়ে দেয় দেখে এত দুঃখের মধ্যেও তৃপ্তির হাসি খেলে যায় ভ্যালরের ঠোঁটে।

একি করেছিস উল্লু, গর্জে ওঠে শমরু। তরক্কিলাল বলে, দোহাই বেগম-সাহেবা, আল্লার শপথ—ওটা জুবেদি।

সেই হাসি দেখে আরও উচ্চস্বরে গর্জে ওঠে, ফের মিথ্যা, হারামজাদ—

তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, খসে পড়ে তরক্কিলালের মুণ্ড।

বেইমান কুত্তা, এবার তোর পালা, কিন্তু তার আগে একবার দেখে নিই আমিনা কি জুবেদি। এই বলে চকমকি ঠুকে শোলা জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ে শমরু।

এক নিমেষের মধ্যে বাইরে থেকে শিকল টেনে দেয় ড্যালর। তার পরে বুকফাটা আর্তস্বরে 'জুবেদি' 'জুবেদি' চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে যায় বাইরে।

এর পর ড্যালরকে আর কেউ দেখতে পায় নি সরধানায়॥

উঠতি গুণ্ডা

আপনারা তাহাদের দেখিয়াছেন, নিশ্চয় দেখিয়াছেন, কতদিন কতবার দেখিয়াছেন। কি মনে পড়িতেছে না? কোথায় দেখিয়াছেন, কখন দেখিয়াছেন? আচ্ছা আর একটু খুলিয়া বলি, সব কথা নিশ্চয় মনে পড়িবে।

সংখ্যায় তাহারা চারজন, বয়স কুড়ি হইতে ত্রিশের মধ্যে, মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক। শিক্ষিত কিনা? অবশ্যই শিক্ষিত, নতুবা বই লেখে কি ভাবে? হ্যাঁ, ঠিক ধরিয়াছেন তাহারা সাহিত্যিক। চারজনেই কিনা? হ্যাঁ, আগাগোড়া চারজনেই সাহিত্যিক, একেবারে এক গণ্ডা সাহিত্যিক।

আর একটু তথ্য সরবরাহ করিব কি? একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, জামা খুলিলে গুণ্ডা-গুণ্ডা, জামা পরিলে ভদ্রলোক, তার উপরে গলায় একখানা চাদর লইলে পাকা সাহিত্যিক, যে কোন মহতী সভায় সভাপতির আসনে বসাইয়া দেওয়া যায়। চোখে সোনার চশমা, মাথায় টাক, মুখে হাসি।

অপর তিনজনের চেহারা ও বেশভূষা অল্প বিস্তর পূর্বোক্ত ছাঁচের মধ্যেই পড়ে, তবে কাহারও চশমা আছে কাহারও নাই, কাহারও হাতে হাত-ঘড়ি, কাহারও হাতে ব্যাগ, কাহারও ঘাড়ে ঝুলি, এইরকম ছোটখাটো দু'চারটে প্রভেদ অবশ্যই আছে। তা ছাড়া রজকের আলস্য অধ্যবসায়ের ফলেও পোষাকের রঙের এদিক ওদিক কখনও কখনও যে না হয় এমন নয়।

গায়ের রঙ?

কি আশ্চর্য, এমন প্রশ্ন নারী, বাঙলী ও বন্ধুদের সম্বন্ধে করিতে নাই।

কোথায় দেখিয়াছেন, কখন দেখিয়াছেন, কবে দেখিয়াছেন?

শেষেরটার উত্তর আগে দিই। নিত্য দেখিয়াছেন, অর্থাৎ কিনা চোখের মস্তক ভক্ষণ না করিয়া থাকিলে কিংবা অন্য কোন রমণীয় লক্ষ্যে চক্ষু দুটি আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন।

কোথায়?

যেখানে বাংলাদেশের অর্ধেক লোককে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায় সেই কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের চৌ মোড়ে।

কখন

সেই যখন কলেজগুলি ছুটি হয়, অফিস ছুটি হয়, পুষ্টতর যাত্রীপ্রবাহে নগরীর শিরাধমনী স্ফীত হইয়া ওঠে সেই বেলা চারটা হইতে ছ'টার মধ্যে।

তাহারা সেখানে কি করে?

মশায়, এ প্রশ্নের উত্তর দান আমার ক্ষমতার অতীত, তাহারা যে সাহিত্যিক। নারী, বাঙালী ও সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্ব বাঁধাপথে চলে না নিশ্চয় জানেন। তবে পরবর্তী সময় পুলিস কোর্টে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই বলিতে পারি।

বেশ জমিয়া উঠিতেছে, না? দেখিতেছেন তো ঘটনার মধ্যে পুলিস কোর্ট যখন আছে।

আপনারা যদি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে নিশ্চয় আরও জন দুই লোককে লক্ষ্য করিয়াছেন। সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অদূরে দাঁড়াইয়া থাকে তাহারা, প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙ গবেষণা তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু চক্ষুতত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে আড়চোখে তাহারা সাহিত্যিকদের উপরে নজর রাখিয়াছে। অবশ্য তথাকথিত রেলিঙ গবেষক দুইজন জানে না যে ভদ্রবেশী চারজন সাহিত্যিক।

ভদ্রবেশী কেন বলিতেছি?

তবে পুলিস কোর্টে যথাসময়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা খুলিয়া বলি, সব বুঝিতে পারিবেন।

তথাকথিত গবেষক দুইজন সাদা পোষাকে পুলিসের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের লোক, সাহিত্যিকগণ সন্দেহভাজন ব্যক্তি, শহরে উঠতিগুণ্ডা ধরপাকড় চলিতেছে।

কয়েক দিন পরে চৌ-মোড়ের সবাই দেখিতে পাইল চারজন যুবককে পুলিশের ভ্যানে তোলা হইতেছে। পাছে সাক্ষী হইতে হয় আশঙ্কায় সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভাবিল ফেরারী আসামী, কেহ ভাবিল চোরা কারবারী, কিন্তু সত্যকার পরিচয় কেহই জানিতে পারিল না, কেহই অনুমান করিতে পারিল না যে উঠতি গুণ্ডা সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিগণ চারজন উঠতি সাহিত্যিক!

সময়টা সেপ্টেম্বর, পূজার তখন আর মাস খানেক বাকি।

২

ম্যাজিস্ট্রেট পাবলিক প্রসিকিউটর বা পি-পি-র উদ্দেশ্যে বলিলেন, এঁদের ধরে আনলেন কেন, এঁরা নিরীহ সাহিত্যিক।

পি-পি এক সময়ে সাহিত্যিক হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই নিজের

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলিলেন, স্যার, উঠতি গুণ্ডা আর উঠতি সাহিত্যিক সব সময়ে প্রভেদ করা যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট। খুব যায়, এঁদের লেখা আমি পড়েছি। এঁর মাসিক 'কষ্টি-পাথর' সময় মতো বাড়ীতে না পৌঁছলে আমার স্ত্রীর মাথা ধরে। সর্বনাশ, এঁকে হাজতে রাখলে বা জেলে দিলে আমার গৃহবিপ্লব সুরু হয়ে যাবে। আর এঁর কবিতা পর পর দুদিন পড়লে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়—তাই বলে তাঁকে আইনের ফাঁকে ফেলা তো চলে না। আর এ দুজনের লেখাও অবশ্য পড়ে থাকবো কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না।

পি-পি ॥ কিন্তু হুজুর এঁরা প্রত্যেক দিন চৌমোড়ে কেন দাঁড়িয়ে থাকেন --সেটা কি সন্দেহজনক নয়?

ম্যাজিস্ট্রেট ॥ সত্যই তো, কেন আপনারা নিত্য চৌমোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন?

সাহিত্যিকগণ যুক্ত আবেদনে জানাইল যে, স্যার, আমরা সাহিত্যিক, তবে ঘরোয়া সাহিত্যিক নই, ঘরের মধ্যে বসিয়া কল্পনা ও অলঙ্কারের সাহায্যে রচনা আমাদের কাজ নয়। আমরা পথে ঘাটে দোকানে বাজারে গুথাস পত্তিতে প্লট ও নরনারী (মানে নরনারীর চরিত্র) খুঁজিয়া বেড়াই। সেই উদ্দেশ্যেই কয়েকদিন আমরা কলেজস্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের চৌমোড়ে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। এমন সময়ে সংবিধানগত মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া পাষণ্ড (আচ্ছা পাষণ্ড কথাটা না হয় বাদ দিয়াই পড়িবেন) পুলিশ অন্যায়ভাবে আমাদের ধরিয়া আনিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে অবিলম্বে আমাদের মুক্তিদান না করিলে পূজা সংখ্যা 'কষ্টি-পাথর' যথাসময়ে বাহির হইবে না আর তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের লিখিত ২৫০টি গল্প, বড় গল্প, ছোট উপন্যাস, উপন্যাস, কবিতা, রোমাঞ্চ প্রভৃতির স্থান শূন্য থাকিয়া যাইবে। তাহার ফলে অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—তাহার দায়িত্ব পুলিসকেই বহন করিতে হইবে।

ম্যাজিস্ট্রেট পি-পিকে বলিলেন, কি বলেন?

পি-পি 'পাষণ্ড' শুনিয়া বিষম চটিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, স্যার, আমার আপত্তি আছে। আমি ইহাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো সাক্ষী প্রমাণাদি উপস্থিত

সাহিত্যিকদের প্রত্যেকের মনে যুগপৎ নিজ নিজ বহুতর অশ্লীল গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির স্মৃতি উদিত হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, তবে ইহাদের জামিনে খালাস দিই।

পি-পি ॥ আপত্তি নাই, কিন্তু জামিন হইবে কে?

ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যিক সমজের 'গার্জেন' উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জামিন হইব।

সাহিত্যিকগণ জামিনে খালাস পাইয়া বাড়ী আসিল।

পরে সরকার হইতে মামলা তুলিয়া লওয়ায় তাহারা বেকসুর খালাস হইয়াছিল, কিন্তু অতঃপর আর তাহারা চৌমাড়ে দাঁড়াইয়া প্লট সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে নাই, ঘরে বসিয়াই লিখিত। এখন তাহারা প্রসিদ্ধ ঘরোয়া সাহিত্যিক।

পশু শিক্ষালয়

দেশপ্রিয় পার্কের যে-অংশটা নৈমিষারণ্য নামে পরিচিত সেখানে অপরাহ্নে একদল পেন্সন ও যষ্টিধারী বৃদ্ধ বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সমাগমের ফলেই স্থানটি নৈমিষারণ্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে সেখানে হরিবাবু (যষ্টি ও পেন্সনধারী একজন বৃদ্ধ) কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল—আজ আপনার বিলম্ব কেন হরিবাবু ?

কথিত হরিবাবু ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, আর বলবেন না, যেমন হয়েছে দেশের সরকার।

সরকারের অবিমৃশ্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত, সরকারের নানা প্রকার অপরাধের মধ্যে প্রধানতম হইতেছে যে পেন্সনের সঙ্গে D. A. নামে মধুর স্পৃহনীয় উপসর্গটা নাই। কাজেই একজন বলিলেন, আবার নতুন কি হল ?

নতুন কোথায়, নিত্য আর পুরাতন।

হরিবাবুর নিত্য আর পুরাতন অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিল।

হরিবাবু আরম্ভ করিলেন—নাতিটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করবার জন্যে আজ মাসখানেক চেষ্টা করছি। যেখানেই যাই শুনি, জায়গা নেই। আরে মোলো যা, পড়বে তার আবার জায়গার কি প্রয়োজন ? এ কি খাওয়া না শোয়া ? সকলেই জানায়, অতিরিক্ত নিলে সরকার থেকে গ্র্যাণ্ট বন্ধ করে দেবে। শুনুন একবার কথা। গ্র্যাণ্ট বন্ধ করবে! কেন, গ্র্যাণ্ট কি সরকার ঘর থেকে দেয় ! যাই হোক, এইভাবে স্কুল থেকে স্কুলে মাস খানেক ঘুরে ভর্ত্তি করবার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন পেলাম একটা স্কুলের সন্ধান।

অবশ্য সেখানেও নানারকম আপত্তি উঠিয়েছিল কিন্তু হাতে পায়ে ধরে দিলাম শেষ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করে।

যাক্, তাহলে আপাততঃ আপদ শান্তি। অপরে বলিলেন, নামটা শুনে রাখি, কাজে লাগতে পারে।

হরিবাবু বলিলেন, স্কুলটার নাম নিখিলবঙ্গ পশু বিদ্যালয়।

একজন বলিলেন, তার মানে ভেটারিনারি স্কুল ?

অপরে বলিলেন, বেশ করেছেন—ওর Prospect আছে। পশু চিকিৎসা জানা এ দেশে খুব দরকার।

হরিবাবু বলিলেন, ভেটারিনারি স্কুল নয়, সেখানে তো হয় পশুর চিকিৎসা এখানে খোদ পশুরা শিক্ষা পায়।

বলেন কি মশায়?

যা দেখলাম তাই বলি। বাঘ ভালুক শেয়াল কুকুর বেড়াল বানর গাধা বাচ্চারা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে লেখা পড়া শিখছে।

বিস্মিত হইয়া সকলে শুধায়, আর হেডমাষ্টার, শিক্ষক পণ্ডিত প্রভৃতি।

তারাও পশু, তবে বয়স বেশি, হেডমাষ্টার একটা বুড়ো ষাঁড়।

বলেন কি মশায়, এমন স্কুলের নাম তো জানতাম না।

একটিই আছে কি না। তা ছাড়া, ওরা আত্মপ্রচার পছন্দ করে না।

তা মানুষের ছেলেকে নিতে চাইলো?

সেই তো বিপদ! বলে, মানুষের সাহচর্য্যে পশুর বাচ্চারা খারাপ হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি নাছোড়বান্দা হয়ে হাতে পায়ে ধরে, আমার নাতিটাই পশু হয়ে উঠবে, পশুরা মানুষ হবে না, এমনি কত সব স্তোক বাক্য বলে দিলাম শেষ পর্য্যন্ত গছিয়ে। হেডমাষ্টার বললেন, আচ্ছা নিলাম ছোকরাকে স্পেশাল কে হিসাবে—আর অনুরোধ করবেন না।

হরিবাবুর অভিজ্ঞতা শুনিয়া সকলের বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা রহিল না, এবং সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হরিবাবু খুব জিতে গেল। আমাদের ছেলেপিলে নাতিরা মানুষ ছাড়া তো আর কিছু হবে না, হরিবাবুর নাতি আস্ত একটা পশু হবে। আঃ, কি সৌভাগ্য হরিবাবুর।

তারপরে সকলে মনের ঈর্ষ্যা গোপন করিয়া এবং হরিবাবুর সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলে সেদিনের মতো নৈমিষারণ্যের অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

২

মাসখানেক পরে হরিবাবু আবার একদিন সময় অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যের সহধর্ম্মীগণ বলিয়া উঠিল—আবার আজ হঠাৎ দেরী কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিবাবু বলিলেন, আর বলবেন না, কপাল!

কি হল মশায়?

নাতিটাকে স্কুল থেকে আনিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

কেন? পশুর সঙ্গে থেকে কদভ্যাস শিখছিল বুঝি?

না, পশুরাই ওর সাহচর্য্যে কদভ্যাস শিখছিল এই অভিযোগ।

কি আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য বোধ করবেন না—সমস্তটা শুনুন।

হরিবাবু বলিতে লাগিলেন, হেডমাষ্টারের জরুরি চিঠি পেয়ে গিয়ে হাজির হলাম। ব্যাপার কি?

তিনি বললেন, আপনার নাতিটিকে নিয়ে যান মশায়।

কেন, তার অপরাধ কি?

অপরাধ তার ব্যক্তিগত না হতে পারে, ওটা মানুষের জাতিগত স্বভাব।

খুলেই বলুন।

হেডমাষ্টার বলতে লাগলেন, পশুরা কদভ্যাস শিখছে ওর কাছ থেকে।

বলেন কি? পুঁটে আমার ভালো ছেলে, রোজ দু'বেলা গীতা পড়ে।

ত, পড়ুক—সবটা শুনুন।

হেডমাষ্টার বলে চলেন—পশুরা সবাই সবাইকে আপন মনে করে, এ পর ও আপন এ জ্ঞান আমাদের নেই। আপনার পুঁটে এ জ্ঞানটি ইতিমধ্যে বাচ্চাদের দিয়েছে।

কেমন?

দু'টো কুকুরের বাচ্চা পরস্পরকে ভাই বলে জানে। ও বলল, তোরা আপন ভাই, না বৈমাত্র, না খুড়তুতো-জেঠাতো, না কেবল গ্রাম সম্পর্কে ভাই?

ক্ষতি কি?

মনুষ্য-সমাজে ক্ষতি না হতে পারে—পশু-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, ওতে সমাজের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

আর কি অভিযোগ?

পশুদের সকলের অপরের দ্রব্যে সমান অধিকার, এটা আমার, ওটা অপরের এ বোধ তাদের নেই। আপনার পুঁটের কল্যাণে সবাই এখন জিনিসপত্রে আপন পর ভেদ করতে শিখেছে।

ক্ষতি কি—মানুষের সমাজে তো এমন চলে।

তাই মানুষের সমাজের আজ এমন অবস্থা।

আর কি অভিযোগ ?

কত বলবো। পুঁটে বাচ্চাদের চুরি করতে, মিথ্যা কথা বলতে শেখাচ্ছে। আবার এর মধ্যে একদিন সবাইকে নিয়ে মিছিল বের করে কি সব চাই বলে ঘোরাচ্ছিল! গেল আমাদের পশু-সমাজ। না মশাই, নিয়ে যান আপনার নাতিকে।

খুব রাগ হল আমার, বললাম, এ ষাঁড়ের মতোই কথা বটে।

শুনে, বলবো কি মশাই, বেটা বুড়ো বলীবর্দ্দ এমন এক বিরাট গর্জন করে উঠল যে কোথায় লাগে তরে কাছে সত্যাগ্রহীদের অহিংস গর্জন!

সবাই শুধায়, কি করলেন তখন ?

যে শিং নাড়া, যে গর্জন, আর কি করবার থাকতে পারে, নাতিটার হাত ধরে পালিয়ে চলে এলাম।

তা নাতিকে এবারে কোথায় ভর্ত্তি করে দেবেন ভাবছেন ?

না, আর ইস্কুলে নয়।

তবে,

এবারে ভাবছি বড়বাজারের এক গদ্দিতে ঢুকিয়ে দেব।

ব্যবসা শেখাবেন বুঝি! ভালো, ভালো।

হ্যাঁ, ব্যবসাই এক রকম।

এক রকম মানে ? ব্যবসার কি আবার রকম ভেদ আছে নাকি ?

সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা শেখাবো ওকে।

কি সেটা ?

জানেন সবাই, কেবল সাহসের অভাবে স্বীকার করতে পারছেন না।

তবু শুনি কি সেটা ?

চোরা-কারবার।

সকলে স্বস্তির সঙ্গে বলিল—এই! আমরা ভাবছিলাম না জানি সেটা কি! তা চোরা-কারবারে আবার সাহসের কি প্রয়োজন! ন্যায্য কারবারেই আজ প্রয়োজন হয় সাহসের।

এই বলিয়া সকলে সরকারের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিল।

হরিবাবু উঠিয়া পড়িলেন। বড়বাজারের গদি শিক্ষানবিসির মাশুল হিসাবে যে টাকাটা দাবী করিয়াছে তাহা জোগাড় করিতে হইবে।

প্রত্যাবর্তন

অপুত্রক মাতুল নিবারণবাবুর নাভিশ্বাস উঠেছে, শেষ সময় উপস্থিত, খবর পাওয়া মাত্র উপযুক্ত ভাগ্নে সত্যশরণ উল্লসিত হয়ে এক দৌড়ে তারাচরণের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। তারাচরণ উকিল আর সত্যশরণের তাস খেলার নিত্যসঙ্গী।

তারাচরণ তার ত্রস্ত ভাব দেখে বলল, কি, হয়ে গিয়েছে নাকি ?

সত্যশরণ বলল, না ঠিক হয়নি, তবে হল বলে। তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, এতক্ষণে হয়েই গেল বা।

এমন তো কতবার শুনলাম। কাক-জ্যোৎস্না দেখে কতবার তুমি উল্লাসে কা কা ধ্বনি করে উঠেছ মনে আছে কি ?

এবারের কথা আলাদা।

কেন শুনতে পাই কি ?

সাহেব ডাক্তার এসেছে যে। ওরা শুধু ফিস নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সঙ্গে দক্ষিণা স্বরূপে রুগীর প্রাণটাও নিয়ে যায়। পাড়ার ডাক্তার বলে গেল।

তাই বলো, একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর।

তা বলতে পারো, কেননা আমাদের শাস্ত্রে বৈদ্যকে অশ্বিনীকুমার বলেছে।

তারপরে সত্যশরণ বলল, আর তো দেরি করা চলে না।

তা বটে, তবে চলো শ্মশানে বলেই যাই।

আহা, তোমাকে শ্মশানে যেতে বলেছে কে ? তবে শ্মশানের কাছে বলতে পারো, কেননা, ঐ জায়গাটার আগেই রাজদ্বারের উল্লেখ আছে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধব।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ধরো নিবারণবাবু যদি উইল করে দিয়ে যান।

দিয়ে গেলেই হল ! তোমরা আছ কি করতে ?

আমরা তো আর রাতকে দিন করতে পারি না।

খুব পারো। নজীর আর আইনের বিদ্যুতের বাতি জেলে রাতকে দিন করে দাও।

আরে সেটা তো সেও করতে পারে।

কে ? ঐ তিনকাল গত বুড়িটা ? তা হলে আর তোমরা আছ কী করতে ?

শহরে উকিল কি আমি একাই ?

একা নও, একাই একশ।

আচ্ছা একটু স্থির হয়ে বসো, এই রাত্তেই তো রাজদ্বারে যেতে হচ্ছে না।

এই বলে তারাচরণ তাস বের করল।

সত্যশরণ এবারে আর আশাভঙ্গ হল না, শেষ রাত্রে নিবারণবাবু সত্য সত্যই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

নিবারণবাবু এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বারকয়েক ফেল হয়ে মধ্যপ্রদেশে যখন চলে গেলেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশের অনেক নীচে। তারপরে সেখানে কণ্ট্রাক্টরী করে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন নিয়ে এলেন অনেক টাকা আর সেই সঙ্গে তুলসীকে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলল, ওখানে যা করেছ করেছ, এ বাংলাদেশ। বিয়ে করে ফেলো।

নিবারণবাবু বললেন, তা সম্ভব হলে তো ওখানেই হতো। তুলসী বিয়েতে রাজী নয়।

তবে বিয়ে করেছ বলে চালিয়ে দাও, জানছে কে ?

তুলসী তাতেও রাজী নয়।

বন্ধুরা অবাক হয়ে বলে, এমন তো কখনো শুনিনি।

নিবারণবাবু বলেন, তুলসীকে তো আগে দেখনি।

কিন্তু বন্ধুরা বলে, তুমি মরলে উত্তরাধিকার নিয়ে যে সঙ্কট হবে।

সে কথা কি আর বলিনি ?

কি বলেন উনি ?

বলে সে, তোমার কাছে আসবার আগেও আমি ছিলাম, তখন কী ভেবেছিলে আমার জন্যে ? তুমি চলে যাওয়ার পরেও আমি যদি থাকি, তখনি বা ভাবতে যাবে কেন ?

আমি বলি, ও কেনর জবাব এই যে মানুষের স্বভাব। তুলসী বলে, মানুষ কি শুধু এক রকমের হয়ে থাকে।

তখন বন্ধুরা শুধোয়, কিন্তু তুমি কি স্থির করেছ ?

নিবারণবাবু বলেন, তুলসী যাই বলুক আমি স্থির করেছি, আমার যা আছে, থাকবার মধ্যে এই বাড়িটা আর কিছু টাকা উইল করে ওকে দিয়ে যাবো।

প্রতিবেশী সত্যশরণটার আশা নেই জেনে বন্ধুরা আনন্দ অনুভব করে বলে, হাঁ, উনি যাই বলুন না কেন, তোমার তো একটা কর্তব্য আছে।

বেশী কথা বলা নিবারণবাবুর স্বভাব নয়, তিনি চুপ করে থাকেন।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ডোঙারগড়ের কাছে একটা শালের জঙ্গল কিনে নিয়ে যখন নিবারণবাবু কাঠের ব্যবসা শুরু করেন তখন তাঁর পুঁজি অল্প ছিল, অভিজ্ঞতাও বেশি ছিল না, ছিল অন্তহীন আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় আর সম্মুখে দীর্ঘপ্রসারিত যৌবন। এর যে কোনটার অভাব হলে তাঁর ব্যবসা চলত না বরঞ্চ তাঁকেই চলে আসতে হত। কাঠের ব্যবসায়ীর জীবন আর যাই হোক সুখের নয়, নিরাপদ তো নই। বনের মধ্যেই তাদের বাস, মাঝে মাঝে রেল স্টেশনে আসতে হয় মালগাড়ি পাওয়ার তদ্বিরে, মাঝে মাঝে শহরে যেতে হয় ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে রাখতে, তাছাড়া বাকি সময় বনবাস। শাল গাছের রলা পুঁতে তার উপরে শাল কাঠের তক্তা দিয়ে ঘর তৈরী হয়, উঠবার জন্যে আছে সিঁড়ি, রাতের বেলায় টেনে তুলে নিতে হয়। বাস, সারারাত শাল কাঠের বাক্সবন্দী হয়ে থাক, বাইরে চলতে থাকে অরণ্যের রহস্যময় শব্দ আর তার সঙ্গে শ্বাপদের গর্জন। কখনো কখনো হাতী এসে পিঠ চুলকে যায়, শালের রলায় ঘরটা কাঁপতে থাকে। শহরে বসে এ সব কথা শুনতে বা পড়তে যত ভয়াবহ মনে হয় আসলে তেমন কিছু নয়—অন্তত ঐ জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের এই ধারণা।

নিবারণবাবু জঙ্গলের অনেকটা অংশ নিজে লোক রেখে কাটাতেন, বাকিটা স্থানীয় ঠিকেদারদের ইজারা দিয়ে দিতেন। কাজেই বনের মধ্যে তার বাসস্থানের কাছেই অনেকগুলো ঘর তৈরী হয়ে ছোট একটি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। ঠিকেদারেরা সবাই ঐ অঞ্চলের লোক, অধিকাংশই জাতে গোয়ালা। তাদেরই কারো ঘরে রাঁধাবাড়ার কাজ করত তুলসী। নিবারণবাবু পরে অনেক সময়ে ভেবেছেন যে, আগে কি কখনো তুলসীকে দেখেছেন—না, তাঁর মনে পড়ে না। প্রথম যখন তিনি তুলসী সম্বন্ধে সচেতন হলেন, দেখলেন তুলসী ছাড়া কেউ কোথাও নেই, সকলেই ভোজবাজির মতো অন্তর্হিত হয়েছে, তারপরে বুঝলেন যে তাঁর টাকার থলিটিও ভোজবাজির ভোজ্য জোগাবার জন্যে অন্তর্ধান করেছে। সেই জনশূন্য পত্তনে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় আছেন তিনি আর তাঁর শিয়রে আছে কিশোরী তুলসী আর আছে অরণ্য আর শ্বাপদ আর দিবারাত্রির নিয়মিত আবর্তন।

অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও হঠাৎ নিবারণবাবু গুরুতর পীড়িত হয়ে জ্বরে অচৈতন্য হলেন। ওদেশের লোকে ব্যাধির অভ্যস্ত শিকার নয় বলেই ব্যাধিকে বড় ডরায়, তাকে মৃত্যু বলেই মনে করে। তাই তারা এক রাত্রের মধ্যে সরে পড়ল আর এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফিনিশিং টাচ হিসাবে নিবারণবাবুর টাকাকড়িও সঙ্গে নিতে ভুলল না। ডাক্তার বৈদ্য না থাকায় মাত্র চার পাঁচদিন পরেই নিবারণবাবুর জ্ঞান হল, দেখলেন শিয়রে কে একজন উপবিষ্ট।

তিনি শুধোলেন—তুমি কে ?

সে বলল—আমি তুলসী।

ক্লিষ্টভাবে রেখা সঞ্চার করে রুগী মনে আনতে চেষ্টা করলেন এই তুলসী কে ? মনে হল না যে, তাঁর কিছু মনে পড়ছে, তবু একটু বুঝলেন যে তুলসী তাঁর আপন, তখন তিনি তুলসীর ছোট্ট হাতখানা নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাপ যত বেশী দেওয়া যায় পাক তত শীঘ্রই হয়, পদার্থ বিজ্ঞানের এই নিয়ম বোধ করি মানুষের মন সম্বন্ধেও খাটে, নতুবা নিবারণ ও তুলসীর সান্নিধ্য এত দ্রুত পরম পরিণতির দিকে এগোবে কেন ? ভূস্তরের চাপে অঙ্গার হীরক হয়ে ওঠে, সঙ্কটের চাপে ওদের মধ্যে যে আলো জ্বলে উঠল তার আলোয় নিবারণবাবু নিজের এক নূতন রূপ আবিষ্কার করলেন আর আবিষ্কার করলেন তুলসীকে। সে আজ তাঁর জীবনে সবচেয়ে সত্য। এতদিন তাঁকে জানতেন না ভেবে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তার উপরে সে কাছেই ছিল অথচ চোখে পড়েনি। ঘরে আলো ছিল না বলেই শিয়রে পিপাসার জল থাকা সত্ত্বেও চোখে পড়ে নি। এতদিনে আলো জ্বলেছে। নিবারণবাবু ভাবেন তুলসীর মনেও কি জ্বলছে আলো ? ঐটুকু সংশয় প্রেম থেকে ঘুচতে চায় না। প্রেম করতলগত আমলক নয়, পদ্মপত্রে জল। নিবারণবাবুর এসব ব্যাধি ছিল না, এতদিন তিনি গাছকে দেখেছেন কাঠরূপে, আজকে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যখন তিনি দেখেন যে তাতে পত্র আছে পল্লব আছে পুষ্প আছে। তুলসীর খোঁপায় সেদিন একটি ফুলের গুচ্ছ দেখে শুধোলেন—এটা কি ফুল তুলসী ?

বিস্মিত তুলসী বলে—সে কি কথা বাবু, এ যে শাল ফুল।

সকলে তাঁকে বাবু বলতো, তুলসীও বাবু বলে।

নিবারণবাবু বলেন, ওটা ছাড়।

কেন সবাই তো বাবু বলে তোমাকে।

তুমি আর সবাই কি এক।

তবে কি বলবো?

একটু ভেবে নিয়ে নিবারণবাবু বলেন, 'ওগো' বলে ডেকো।

হাসিতে তুলসীর খোঁপার শালের মঞ্জরী দুলে দুলে ওঠে, 'ওগো' কি আবার একটা ডাক।

তবে তোমাদের দেশে কি বলে?

কাকে কি বলে?

সম্বন্ধটা মুখে আসে না নিবারণবাবুর. তিনি পরাজয় স্বীকার করেন।

অসুখের জের মিটিয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করতে এক মাসের উপর লাগল নিবারণবাবুর। সুস্থ হয়ে উঠে তুলসীকে বললেন, এবারে ঘরে ফিরে যাও।

তুলসী বলল, যারা পালিয়েছে আগে ফিরে আসুক।

তারা আর ফিরবে না, বলেন নিবারণবাবু।

তবে আমিই বা যাই কি করে, বলে তুলসী।

তোমার যে বাপ মা আছে।

ভয় তো সেই জন্যেই।

সে আবার কি রকম?

একমাসের উপরে তোমার ঘরে থাকলাম তারপরে আর তারা ঘরে নেবে কেন?

বাপ মা নেবে না! বলো কি?

বাপ মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু মা?

মার মন যে নরম।

বরফ হলে আর জল নরম থাকে না।

তুলসীর উত্তর শুনে অবাক হয়ে যান নিবারণবাবু। অশিক্ষিত দেহাতী মেয়ের মুখে এসব কথা জোগায় কে?

তবু তিনি আর একবার চেষ্টা করেন, বলেন, তুমি ফিরে না গেলে তোমার বাপ-মায়ের কষ্ট হবে না?

এ অবস্থায় ফিরে গেলে কষ্ট হবে আরো বেশি।

তুমি যে এখানে আছ তা কি তারা জানে?

জেনেও জানে না। আমি যাদের সঙ্গে এসেছিলাম তারা গাঁয়ের লোকমাত্র আপনজন নয়। তারা ফিরে গিয়ে নিশ্চয় সব প্রকাশ করে দিয়েছে।

তা হলে যে নিজেদের হাত সাফাই এর কথাটাও বলতে হয়। তবে কি কি বলেছে?

এমন ক্ষেত্রে যা বলে থাকে, তোমাদের মেয়েকে বুড়োর বাপে নিয়ে গিয়েছে।

বুড়োর বাপ আবার কি?

বাঘ গো বাঘ। গোণ্ডিয়ায় সাহেবদের কুঠি হওয়ার পর থেকেই এখানকার অনেক মেয়েকে বাঘে নিচ্ছে কিনা। এই বলে হাসে।

মেয়েটির ক্ষুরধার বুদ্ধিতে সহজাত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন নিবারণবাবু।

দুঃসময়ের বন্ধুকে তিনি তো তাড়াতে পারেন না, বিশেষ এখন তাঁর দুঃসময়। অতএব তুলসী রয়েই গেল। যে ঘরকাও নয় ঘাটকাও নয় শেষ পর্যন্ত তার স্থান হয় হৃদয়ের মধ্যে। এক্ষেত্রেও তাই হল। সমাজ যেখানে নেই সামাজিক সম্বন্ধও সেখানে থাকে না, তাই কোন অশ্বস্তি দেখা দিল না।

নিবারণবাবু দেখলেন এখানে আর ব্যবসা করা হবে না, কেননা যারা প্রধান সহায় হতে পারত তারাই এখন পলাতক। তিনি এখানকার দেনা-পাওনা চুকিয়ে সিংভূম জেলায় সারান্দা জঙ্গলে গিয়ে কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন। তুলসীকে নিজের স্ত্রী বলেই পরিচয় দিলেন, সে আপত্তি করল না।

এমনভাবে বছর কুড়ি গেলে বিস্তর টাকা জমানো হয়েছে মনে হল নিবারণবাবুর। তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে কলকাতায় রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তুলসী আগেও যেমন আপত্তি করেনি এখনও তেমনি আপত্তি করল না।

কলকাতা যাত্রার কয়েকদিন আগে নিবারণবাবু বললেন, তুলসী আমরা তো কলকাতা চললাম।

তুলসী নির্বিকারভাবে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তার উত্তরে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে নিবারণবাবু বললেন, তোমার ভয় করছে না।

তুলসী আবার নির্বিকারভাবে বলল, ভয় তো জঙ্গলে—বাঘ ভালুক আছে।

জনপদেও ভয় আছে, সেখানে পরিচয় দেবে কি বলে?

সে দায় আমার নয়, বলে হাতের কাজ করে যায় তুলসী।

ধরো স্ত্রী বলেই যদি পরিচয় দি।

তাই দিয়ো, নইলে আবার তোমার লজ্জা।

তোমার ?

বুনো মানুষের আবার লজ্জা কি ? আর তাছাড়া সেখানে আমাকে চেনে কে ?

এবারে বার দুই ঢোক গিলে নিবারণবাবু বলেন—আচ্ছা বিয়েটা করে ফেললে দোষ কি ?

লাভই বা কি ?

লাভ না থাক ক্ষতি আছে।

কি রকম শুনি।

আমার মৃত্যুর পরে বিষয় সম্পত্তির অধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হবে।

এ-ই ? বলে আবার কাজ করে যায় তুলসী।

চুপ করে থাকলে যে ?

আমার ক্ষতি আমি বুঝবো, তোমার যদি কিছু লাভ থাকে তো বলো।

নিবারণবাবু বুঝতে পারেন না, এতদিনেও বুঝতে পারেননি তুলসীকে। চুপ করে থাকেন।

এবারে তুলসী বলে, চুপ করে থাকলে যে।

তোমাকে বুঝতে পারলাম না তুলসী।

না বুঝে যদি কুড়ি বছর চলে থাকে তবে এখনো চলবো। নাও এখন যাওয়ার উজ্জুক করো।

২

নিবারণবাবু তুলসীকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে উঠলেন। আগেই এক বন্ধুকে দিয়ে বাড়িটি কিনিয়ে রেখেছিলেন। মস্ত বাড়ি। তুলসী কলকাতা শহর দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিলাসপুর শহর সে দেখেছিল, ভেবেছিল কলকাতা শহর সে রকম কিছু হবে। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অন্য এক রাজ্য। তার মনে হল যেন প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মুখের মধ্যে সে প্রবেশ করল। তারপরে বাড়িটা! তিনটা তলায় কত ঘর, কত বারান্দা, কত ছাদ। একটা কোণের ঘরে সে মুহ্যমান অবস্থায় বসে রইল।

নিবারণবাবু প্রচুর টাকা রোজগার করে ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দেখা করতে এল। কেউ বলল নিবারণ জেঠা, কেউ বলল নিবারণ দাদা, কেউ বলল নিবারণ ভায়া। সকলের সম্বোধনকে ডুবিয়ে দিয়ে শোনা গেল সত্যশরণের গলা, নিবারণ মামা—সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। সে খবর নিয়েছিল নিবারণের ছেলেপিলে নেই, সে হচ্ছে আইনসিদ্ধ একমাত্র উত্তরাধিকারী। মামী আছে বটে, তা বুড়ি আর কতদিন।

তুলসী সকলের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে, পারে না, কেমন যেন বাধো বাধো করে—কোথায় যেন বাধা।

নিবারণবাবুর এত বড় যে বাড়ি তা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে গেল, মৌমাছিতে যেমন চাক পূর্ণ হয়ে যায়—আর উঠল তেমন কলগুঞ্জন। আর মধু! সকলেই তার সন্ধানে আছে, সকলের আর সকলের চেয়ে বেশী দাবি সেই মধু-ভাণ্ডের উপরে।

প্রথমে কার মনে সন্দেহ জাগল কেউ বলতে পারে না, কেন বা কেমন করে সন্দেহ জাগল তাও কেউ বলতে পারে না—তুলসী নাকি রক্ষিতা মাত্র—পত্নী নয়। তখন ত্রিকালগত অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী বুড়ির দল বহু দূরবিসর্পী, বহু দিগন্ত-স্পর্শী কুটিল জটিল প্রশ্ন নিক্ষেপ করে সত্য আবিষ্কার করে ফেলল। আর তুলসীও রাখ, ঢাক না করে স্পষ্টভাবেই বলে ফেলল—বাবুর সঙ্গে আমার তো বিয়ে হয়নি।

তবু আছ কি করে?

রেখেছেন তাই আছি।

লজ্জা করে না?

এতদিন তো করতো না। আর লজ্জার আছেই বা কী। আমাকে না হলে যে বাবুর চলে না।

গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

এক সঙ্গে অনেকগুলি শীর্ণ হাত অনেকগুলি শীর্ণ গাল স্পর্শ করে।

ভোজবাজির মতো নিবারণবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি শূন্য হয়ে যায়।

সত্যশরণ উকিল সাক্ষী করে শপথ করে বুড়ো মরলেই বুড়িকে দেখে নেবে।

উকিল তারাচরণ বলে, ধরো যদি তাকে উইল করে দিয়ে যায়।

দিয়ে গেলেই হল, তোমরা আছ কি করতে। তাছাড়া আমি শাস্ত্রসম্মত

একমাত্র উত্তরাধিকারী। হিন্দু আইন ইংরেজের আইন দু-ই আমার পক্ষে।

তবে অপেক্ষা করে থাকো বুড়ো মরুক।

সেই শুভদিন আজ সমাগত। মানুষ অমর নয় এই পুরাতন সত্য পুনরায় প্রতিপাদিত করে নিবারণবাবু মারা গিয়েছেন।

সত্যশরণ লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত হল। পাড়াপড়শীরা মৃতদেহ নিয়ে গেল। সত্যশরণ সঙ্গে গেল না, তারাচরণকেও যেতে দিল না। কী জানি বুড়ি কি করে বসে, সঙ্গে একজন উকিল থাকা ভালো। বলা বাহুল্য তুলসীর খোঁজ নেওয়া কেউ আবশ্যক বোধ করল না, হাজার হোক বিবাহিতা পত্নী তো নয়, রক্ষিতা মাত্র! তার আবার শোক কি।

পরদিন প্রাতে তুলসীকে দেখা গেল না। সত্যশরণ বলল, বেটি থানা পুলিসে গেল, না উকিলের বাড়িতেই গেল?

তারাচরণ বলল, তোমার অত খোঁজে দরকার কি? আইনে বলে Prossession is right! তুমি চেপে বসে থাকো। সত্যচরণ চেপে বসে তো রইলই, উপরন্তু দরজায় দারোয়ান বসিয়ে দিল। তারপরে দুইজনে মিলে নিবারণ বাবুর কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল। অধিক গবেষণা করতে হল না, উপরেই পাওয়া গেল উইল। তিনি তাঁর সর্বস্ব তুলসী দাসীকে দিয়ে গিয়েছেন। তারাচরণ পরামর্শ দিল, এখনি পোড়াও। তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত উইল পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল।

সত্যশরণ নিশ্চিন্ত হল।

৩

ডোঙারগড় স্টেশনে তুলসী যখন নামল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গায়ে তার একখানি চাদর, সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নাই। গেটে টিকিট দিয়ে সে বনের দিকে চলল—অদূরে ঘন অরণ্য। বনের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল, বাঁধে জল বেধে রয়েছে; সেখানেই বসে পড়ল, পা আর চলে না। হাঁটু দুটো বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসতেই চোখের জলের সাতনরী হার দুলল বুকের উপর। এই রকম তার প্রথম চোখের জল নিবারণবাবুর মৃত্যুর পরে। কেন সে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ভালো করে জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে, ওখানে তার আর আশ্রয় নাই। পরম দুঃখে পড়লে মেয়ের যেমন বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে তেমনিভাবে স্বভাবতই তার মনে পড়ল বনের

কথা, যে বন থেকে সে এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পিতৃগৃহ যে তার পর হয়ে গিয়েছে এই প্রথম সে বুঝল। জঙ্গল আজ তার কাছে সত্যাই অরণ্য।

রাত্রির প্রহরগুলো ক্রমে অধিকতর ভারী হয়ে জমতে লাগল অরণ্যের শিরে, নিশাচর পাখির অশুভ রব, শ্বাপদের গর্জন, সহস্র তরুলতা বনস্পতির রহস্যময় কানাকানি ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, আর শাখা পল্লবের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার সুতো ঝুলে পড়ে—সেই সমস্ত অরাজক উপাদানকে একটি মাল্যে গ্রথিত করে তুলতে বৃথাই চেষ্টা করতে থাকল। এই প্রকাণ্ড নৈসর্গিক রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে অফুরন্ত চোখের জলের সূত্রধাররূপে নিস্পন্দ বসে রইল তুলসী। অবশেষে রাত্রিও শেষ হয়ে এল, শেষ হল না ওর অশ্রুজলের। যে মানুষকে এতকাল সে আশ্রয় করে ছিল, সেও গিয়েছে আর যে জঙ্গল ওর পিতৃভূমি তাও গিয়েছে। ওর চোখের জল থামাবার তো হেতু নাই। সংসারে চোখের জল ছাড়া আর সকলেরই অন্ত আছে।

আলোচনা

প্রমথনাথ বিশীর গল্প

৩

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে আলোচনা খুব একটা বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সমালোচক পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোকেই আমাদের ঐতিহাসিক গল্পের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি লেখকের ইতিহাস অনুসারী কল্পনাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক গল্পে কিন্তু এই কল্পনারই প্রাধান্য অধিক। ঐতিহাসিকেরা উপাদানের অভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে-স্থানে একটু ফাঁক রেখে গেছেন, ঐতিহাসিক গল্পকার সেই ফাঁকটুকু পূরণের জন্য কল্পনার জাল বিস্তার করেন। তবে ঐতিহাসিকের সেই ফাঁকটুকু পূরণে গল্পকারের 'ইতিহাস রসবোধ' অবশ্যই থাকা চাই, তা না হলে গল্পটি নিছক কাল্পনিকতায় পর্যবসিত হয়ে পড়বে। ঐতিহাসিক গল্পে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের প্রাধান্য থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কাহিনী সেখানে ইতিহাসের সেই কালকে কেন্দ্র করেও আবর্তিত হতে পারে। সেদিক থেকে বিচার করলে ঐতিহাসিক গল্পের স্বাধীনতা অনেক বেশি। আবার অন্যদিক থেকে এই জাতীয় গল্প রচনার যে অসুবিধা তা হল—গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে উপযুক্ত ইতিহাসের বোধ লেখককে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' প্রথম যখন লেখেন তখন তা ছিল একটি বড় গল্প। কিন্তু পরে ৪র্থ সংস্করণে ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ফলে ৮৩ পৃষ্ঠার গল্প ৪৩৪ পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সংযোজনটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়। তার আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুটি ঐতিহাসিক গল্প রচনা করেছিলেন, যা থেকে অনেকে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র

দত্তের পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্তও ইংরাজিতে ইতিহাস অবলম্বনে কিছু গল্প লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক ছোটগল্প লিখেছেন, কিন্তু 'মুকুট' ও 'দালিয়া' ছাড়া কোন ঐতিহাসিক গল্প নজরে পড়েনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রাজকাহিনী'তে ঐতিহাসিক গল্পের জাল বুনেছেন। একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর 'প্রাগজ্যোতিষ' গল্পটির কাল হল আর্য আগমনের গোড়ার দিক, এবং 'ইন্দ্রতুলক' গল্পটি তারও আগের কালের পটভূমিকায় রচিত। 'অমিতাভ', 'বিষকন্যা' ও 'সেতু' খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীর কল্পনা 'মৃৎপ্রদীপ', 'অষ্টম সর্গ' ও 'মরু ও সঙ্ঘ' খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর কালসীমায় রচিত। আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ের কাহিনী 'শঙ্খ-কঙ্কন' ও 'রেবা রোধসি' শিবাজীর বিষয় নিয়ে রচিত কাহিনী 'বাঘের বাচ্ছা' ও তাঁর সময়েরই কাহিনী সদাশিবকে নিয়ে রচিত গল্প। শাহ সুজার সময়ের কাহিনী 'তক্ত মোবারক' পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী 'রক্তসন্ধ্যা' ও চুয়াচন্দন'। শরদিন্দুবাবু ইতিহাসের যে কাহিনীগুলি গ্রহণ করেছেন তা অল্প পরিচিত, ফলে সেখানে কল্পনার বিস্তারের সুযোগ অনেক বেশি। তাছাড়া তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোমান্টিক কাহিনীকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীও বহু ঐতিহাসিক গল্প-রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মহেন-জো-দড়োর পতন, মহালগ্ন, জেমি গ্রীণের আত্মকথা, কোকিল, ছিন্ন দলিল, গুলাব সিংএর পিস্তল, ছায়া বাহিনী, মড্‌রুথ, নানাসাহেব, প্রায়শ্চিত্ত, রক্তের জের, অভিশাপ, রাজা কি রাখাল,পরী, কোতলে আম, দর্শনী, আগম্-ই-গন্না বেগম্, তিন হাসি, বেগম শমরুর তোশাখানা প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। 'লালকেল্লা' উপন্যাসটির পটভূমি হল মুঘল আমল, 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র কালসীমা ইংরাজ রাজত্ব। 'বঙ্গভঙ্গ' ও '১৫ই আগস্ট'-এ তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাসকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক গল্পের কালসীমা আরও সুদূর অতীতে প্রসারিত। 'মহেন-জো-দড়োর পতন' গল্পটিকে ঐতিহাসিক না বলে বোধহয় প্রাগৈতিহাসিক বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। মহেন-জো-দড়োর সভ্যতা ঐতিহাসিকদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু, সেই সভ্যতা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তা নিয়ে অনুমানও কল্পনার অন্ত নেই। প্রধানতঃ দু'টি কারণে মহেন-জো-দড়োর সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত

হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। একটি হল সিন্ধুনদের বন্যা ও অপরটি হল আর্যজাতির আক্রমণ। এই দুটি কারণকে অবলম্বন করে লেখক সেই যুগ পরিবেশকে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন। সিন্ধুসভ্যতায় যে অশ্বের ব্যবহার ছিল না, এই ঘটনাটিকেও তিনি নিখুঁতভাবে গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি আরও একটি কারণ যুক্ত করেছেন সার্থকভাবে, সেটি হল সিন্ধুসভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিলাসবহুল ও অলস জীবনযাত্রা। প্রকৃতপক্ষে উপচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয়তাই তাদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। লেখক পাদটীকায় জানিয়েছেন—"ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।" বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক গল্পের এখানেই মাত্রাবোধ। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার ততটুকুই মিশ্রণ ঘটবে যাতে' 'ইতিহাস রস' ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রমথনাথ কোনক্ষেত্রেই সেই মাত্রাবোধের অপব্যবহার করেননি।

'মহালগ্ন' গল্পে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষে আগমন ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের সুযোগের ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা চন্দ্রগুপ্ত ও এক গ্রীক রমণীর প্রণয়ের রোমান্টিক কাহিনীই মুখ্য স্থান লাভ করেছে।

মুঘলযুগের কাহিনী নিয়েও লেখক অনেকগুলি গল্প রচনা করেছেন, বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালের বিভিন্ন ঘটনা তাঁকে আকর্ষণ করেছে। 'রাজা কি রাখাল' গল্পে বাদশাহ আলমগীর একজন ভিখারী বুড়ির থেকেও কত-বেশী দুঃখী ও দীন তা দেখান হয়েছে। এখানে ঘটনাটি ঐতিহাসিক না হলেও, ইতিহাসের নিষ্ঠুর এক পরিহাসের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র আলমগীরকে এমনি প্রেমের কাঙালরূপে চিত্রিত করেছিলেন। নিষ্ঠুরতা ও কোমলতার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই বাদশাহ আলমগীর চরিত্র। 'পরী' গল্পে লালকেল্লার আস্তাবলের সহিসের দৃষ্টিতে প্রকাশ করা হয়েছে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ মোঘল-সাম্রাজ্যের পতনের পর অন্তঃপুরের বেগমদের নিদারুণ দুর্দশার চিত্র। অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল হারেমের বন্ধন, ঐতিহাসিকেরা বলেন তাই তাঁরা একবার নগরে ভিক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গল্পকার কাহিনীর নিষ্ঠুরতাকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলেছেন যখন দেখি সেই আস্তাবলের সহিস বড়ে খাঁর গোস্ত রান্নার গন্ধ পেয়ে বেগমেরা এসে কড়াইসুদ্ধ মাংস তুলে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রস্থান

করেছে, কিন্তু বড়ে মিঞা আর সঙ্গীসাথীরা ভেবেছে যে বেহেস্তের পরীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। 'কোতলে আম' গল্পে নিষ্ঠুর নাদির শা-র অত্যাচারের পাশা-পাশি একজন নর্তকীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্র দেখান হয়েছে। নাদিরশার রণসাজে সজ্জিত বীর মূর্তির সে পূজা করে, কিন্তু প্রেমিক নাদিরশার কুৎসিৎ লোমশ বাহুর আলিঙ্গনে সে নিজেকে ধরা দিতে ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। 'দর্শনী' গল্পে ফারুকশিয়ারের বন্দীদশায় তাঁর প্রেমিকা জুবেদী নারীর সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে পাহারাদারকে রাজী করিয়ে কারাগারে দেখা করার অনুমতি পায়। প্রায়ান্ধ সম্রাটের সঙ্গে জুবেদীর মিলনের মধুর মুহূর্তের পরই নাটকীয়ভাবে ঘটে যায় সেই ঘটনা—সম্রাটের ঘর থেকে বেরোনর পর পাহারাওয়ালা যখন জুবেদীর কাছ থেকে দর্শনী বুঝে নিতে ব্যস্ত তখন সে দৃশ্য ফারুকশিয়ারের চোখ থেকে শেষ আলোটুকুও কেড়ে নিল। ইতিহাস এরকম প্রাণস্পর্শী বিবরণ দিতে পারে না, কিন্তু গল্প পারে।

'চাপাটী ও পদ্ম' গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই ঐতিহাসিক এবং সে ইতিহাস সিপাহীবিদ্রোহের সমসাময়িক। সিপাহীরা চাপাটি ও পদ্মকে তাদের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিল, সেইজন্যই এই গ্রন্থের এরূপ নামকরণ। Forbes Mitchell-এর 'Reminiscences of the Great Mutiny 1857-59'-এর গ্রন্থের বর্ণিত ইতিহাস 'জেমী গ্রীণের আত্মকথা' গল্পে এক শিক্ষিত যুবক, যাঁকে ইংরাজরা গুপ্তচর অপবাদে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, দেশপ্রেমিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। 'ছিন্ন মুকুল' গল্পটিতে সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় বাঙালী চরিত্রের ইংরাজপ্রীতির নামে কাপুরুষতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, তবে শেষপর্যন্ত বাঙালীর মুখরক্ষা করেছে তারক নামে দেশপ্রেমিক বাঙালী যুবকটি। সিপাহীবিদ্রোহকে প্রথম জাতীয় জাগরণ বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও লেখক যে-সব ছবি প্রকাশ করেছেন তাতে একটা নব উন্মাদনার ছবিই ফুটে উঠেছে এবং সেই উন্মাদনা যজ্ঞের নায়ক নানাসাহেবকে তিনি ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে মহানায়ক করে গড়ে তুলেছেন। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে অন্যান্য গল্পগুলির অঙ্কুর সিপাহী বিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া, "কেবল নানাসাহেব গল্পটিতে কিছু স্বাধীনতা লইয়াছি।"

'বেগম শমরুর তোশাখানা' গল্পটিতে ইতিহাস রসের সঙ্গে রহস্যের সংমিশ্রণে আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিছু কিছু গল্পে ইতিহাসের উপাদানকে গ্রহণ করা হলেও লেখক সেগুলিকে

ঐতিহাসিক গল্পরূপে প্রকাশ করতে চাননি। ইতিহাসের কাহিনী থেকেই তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন 'ধনেপাতা' গল্পটি নীহার-রঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্ব (পৃ. ৫৫১-৫৫২) থেকে কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী প্রসঙ্গে কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ গ্রন্থপ্রসঙ্গে দীর্ঘ উদ্ধৃতিদানের পরিশ্রম স্বীকার করলেও, লেখক এখানে অতীতকালের বাঙালী শিক্ষার্থীদের যে আচার-আচরণ প্রকাশ করেছেন, তা আধুনিককালের বাঙালী ছাত্ররাও কতখানি বর্জন করতে পেরেছে চিন্তনীয়।

'সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন' এমনি একটি ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ গল্প। সেকেন্দার শা-র অনুগামী একজন গ্রীক সৈনিক পেস্কাডস্‌এরিওফিস্‌ এর ডায়েরী, যার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে এবং যার ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, লেখক তার ভাবানুবাদ করে দিয়েছেন বলে স্বীকার করলেও তাঁর কৌতুকপ্রিয়তাকে গোপনে করতে পারেননি। একজন গৌড়ীয় বিদেশীর পাল্লায় পড়ে গ্রীকসুন্দরী হেলেন যেভাবে তাকে নিয়ে পলায়ন করলেন, তাতে সেকেন্দার শা-র ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত না নিয়ে আর কি উপায় থাকতে পারে! বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসগ্রহণকে কেন্দ্র ক'রে এমনি আর একটি ঐতিহাসিক ব্যঙ্গমূলক গল্প হল—'সে সন্ন্যাসীটির কি হইল'। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ব্যঙ্গমূলক গল্পগুলির কথা বাদ দিলেও, ইতিহাসরসাশ্রিত গল্পের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর বিশেষ ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের মত পুরাণের কাহিনীকেও লেখক অনেকস্থানে গল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'ন-ন-লো-ব-লিঃ' 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট', 'কল্কি', 'ব্রহ্মার হাসি', 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য', 'ওলট পালট পুরাণ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে পৌরাণিক চরিত্র বা পটভূমিকাকে গ্রহণ করা হয়েছে সত্য কিন্তু লেখকের পৌরাণিক গল্পলেখার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে রঙ্গ-ব্যঙ্গ বা রূপককাহিনী প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যেমন 'রামায়ণের নূতনভাষ্য' কাহিনীতে দেখান হয়েছে—পণ্ডিত একই রামায়ণ কাহিনী প্রথমে ক্ষমতাসীন কৌরবপক্ষে ও পরে ক্ষমতাসীন পাণ্ডবপক্ষে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে রাজাকে তুষ্ট করেছেন। এটি চিরন্তন তোষামোদ প্রিয়তারই

একটি ঘটনা। পরশুরামের (রাজশেখর বসু) মতই এই পৌরাণিক বিষয়গুলিকে তিনি 'সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে' 'বাহন' রূপে ব্যবহার করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে আর একটি নূতন ধারা লক্ষ্য করা যায়, সেটি হল বাংলা সাহিত্যের বিষয় নিয়ে রচিত গল্প। বিষয় বলতে—সাহিত্যের চরিত্র কাহিনী অথবা ঘটনা কেন্দ্রিক গল্প। তাঁর পূর্বে এই ধারায় আর কেউ গল্প রচনা করেছেন বলে জানা যায় নি। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান নিয়ে এরকম গল্প অনেকেই লিখেছেন, প্রমথনাথ বিশীও কয়েকটি গল্প লিখেছেন কালিদাসকে নিয়ে (রাজকবি, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, অসমাপ্ত কাব্য)। কিন্তু বাংলাসাহিত্যকে গল্পের বিষয় করা এই প্রথম। বাংলাসাহিত্যের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক হিসাবে তিনি স্বভাবতঃই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করেছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য কোথাও তাঁর রসবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি সরাসরি সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে রসের সূত্রটিতে টান দিয়েছেন। এইজন্যই যখন তিনি 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' বা 'বঙ্কিম সরণী' লেখেন তখন তা নীরস সমালোচনা গ্রন্থ না হয়ে, সরস সাহিত্য হয়ে ওঠে, অথচ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টির অভাব কোথাও থাকে না। লেখকের 'বিচিত্র সংলাপ' গ্রন্থটির কথাও এই প্রসঙ্গে মনেপড়ে, সেখানেও তিনি পুরাণ সাহিত্য ও সমাজ থেকে বিভিন্ন চরিত্রকে সংলাপের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে এই গ্রন্থটি এক অনন্য সংযোজন।

বাংলা সাহিত্যের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখক কতকগুলি গল্পে নূতন ব্যাখ্যা আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীকান্তের ৫ম পর্ব ও ৬ষ্ঠ পর্ব গল্পদুটি। এই দুটি গল্পে লেখক রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে নিয়ে যে রসিকতা করেছেন তার সঙ্গে শরৎচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রের কোন মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পড়ে গোরার চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা অভিভূত হই। গোঁড়া হিন্দু গোরা যখন জানতে পারে যে সে হিন্দু সন্তান নয়, বিদেশী ক্রিশ্চিয়ান, তখন তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখিছি। শেষপর্যন্ত গোরা বিশ্বমাতা আনন্দময়ীর পদতলে নিখিল মনুষ্যত্বের দীক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু আমরা গোরার কুড়িয়ে পাওয়ার বৃত্তান্তের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ

দেখাই নি। লেখক 'সেই শিশুটি' গল্পে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পরিত্যক্ত গোরা শিশু কিভাবে কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ীর আশ্রয় লাভ করল তার বিবরণ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষর সমস্যার অন্ত সমাধান ঘটেছে 'কমলার ফুলশয্যা' গল্পে।

'রাধারাণী' গল্পটি, 'এ যুগের কলমে সে যুগের কাহিনী', অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী বিংশ শতাব্দীর প্রমথনাথের কলমে নবরূপায়ণ। যুগ বদলেছে বলেই এ যুগের রাধারাণী ও রুক্মিণীকুমারের রোমান্টিক মিলন ঘটে না, ঘটে রোমান্টিক বিচ্ছেদ। 'কুন্দনন্দিনীর বিষপান' গল্পে কুন্দ বিষপান করেও মরে না, কমলমণির আশ্রয়ে কলকাতায় থেকে বিদ্যাসাগরের উৎসাহে শিক্ষিতা হয়ে হেড্ মিস্ট্রেস-এর কাজ গ্রহণ করে।

গল্পগুলির নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্য পাঠককে আকৃষ্ট করে।

প্রমথনাথ বিশী অনেকগুলি অলৌকিক গল্প রচনা করেছেন। অলৌকিক গল্পের ধারাটি বাংলা সাহিত্যে বেশ পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পগুলিকে অলৌকিক পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' 'ভূত ও মানুষ' উপন্যাসকল্প হলেও অলৌকিক রসের দিক থেকে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর বসুর 'ভূশণ্ডীর মাঠে'র অলৌকিক আস্বাদ অনেকেই উপভোগ করেছেন।

অলৌকিক কাহিনী সাধারণতঃ দু'ভাবে পরিবেশন করা হয়, এক—পরিহাস কুশল ভঙ্গীতে কৌতুক জাগানোর জন্য, দুই—সিরিয়াস ভঙ্গীতে আতঙ্ক জাগানোর জন্য। প্রমথনাথ বিশী সামাজিক অসঙ্গতিকে নিয়ে কৌতুক করলেও, ভূতকে নিয়ে খুব বেশি একটা কৌতুক করেননি। 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পটিতে নায়কের প্রথমা স্ত্রীর আবির্ভাব: 'বিনাটিকিটের যাত্রী'তে অলৌকিক যাত্রীর কাহিনী কিছুটা কৌতুকের সঞ্চার করলেও আতঙ্কের বা রহস্যের ভাবটিও বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু 'ভৌতিক চক্ষু' গল্পে যে মেয়েটিকে খুনীর চোখ বসাবার পর তার কোমল স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে হিংস্রতায় পর্যবসিত হয় তা আমাদের ভীত করে তোলে। 'খেলনা' গল্পে গদাধরবাবুর মৃত কন্যা যেভাবে খেলনার লোভে প্রতি রাতে ঘরে আসত তার বর্ণনা অলৌকিক রসের সঙ্গে করুণরস সঞ্চার করেছে। 'কালো পাখী' গল্পে রহস্যময় কালো পাখীটি যেভাবে শিশুর প্রাণহরণ করেছে তাতে আমাদের মন বিষাদে ভরে যায়।

অলৌকিক গল্পগুলিকে লেখক শেষপর্যন্ত অলৌকিকই রেখে দিয়েছেন,

বিশ্বাসের স্তরে আনবার চেষ্টা করেননি, বিশ্বাস করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু গল্পগুলির উপস্থাপনা গুণে কোথাও আকর্ষণের কমতি হয়নি।

কতকগুলি গল্পে আবার রহস্য ও রোমাঞ্চের আমদানী করা হয়েছে—'চিলা রায়ের গড', 'পাশের বাড়ী' প্রভৃতি গল্পগুলি এই জাতীয়। এইসব গল্পে কাহিনীর জাল এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছে যাতে পাঠকের মন ধীরে ধীরে কৌতুহলী হয়ে ওঠে এবং গোয়েন্দাকাহিনীর মতই পরিণতি জানবার আগ্রহ জাগে।

রবীন্দ্রনাথ রূপক গল্প লিখেছিলেন 'তোতাকাহিনী'। তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করাই ছিল এই গল্পের উদ্দেশ্য। প্রমথনাথ বিশীও অনেকগুলি রূপকগল্প রচনা করেছেন। সামাজিক অন্যায়-অসঙ্গতিকে তুলে ধরা ও সমালোচনা করাই এর উদ্দেশ্য।

রূপক গল্পে রূপকের অন্তরালে মূলকাহিনীটি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পাঠকের সেটি বুঝে নিতে কোনই অসুবিধা হয় না। 'টিকি' গল্পটি পড়লেই আমরা বুঝতে পারি হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধটা কতো মেকি জিনিষ। 'পঞ্চশীলা' গল্পটিতে আমাদের নীতি ও কর্মের পার্থক্যটি প্রকট হয়ে উঠেছে। 'ওরা' গল্পে বাঙালীর উন্নাসিকতা ও অকর্মণ্যতা যুগপৎ প্রকাশিত। 'সিন্দুক-তত্ত্ব' গল্পে পিতা পুত্রদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন টাকা না থাকলেও টাকার খ্যাতি কিভাবে সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। 'ছোট গল্প-উপন্যাস রহস্য'—সাহিত্যের বাজারে ছোটগল্পের বদলে উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবের কালটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপরোক্ত সমস্ত ধারার গল্পেই প্রমথনাথ বিশীর সমাজ সচেতন মনটি কাযকর হয়েছে। কিন্তু তবুও স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক কাহিনী নিয়ে রচিত কয়েকটি গল্পের কথা বলা যেতে পারে। প্রথমেই মনে পড়ে 'ডাকিনী' গল্পের নাম মল্লিকা নামে যে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েটি স্বামীর ঘর করতে এসেছিল, সামাজিক কু-সংস্কারের প্রকোপে শেষপর্যন্ত তাকে ডাকিনী আখ্যা পেতে হয়েছে। এ অপবাদ খণ্ডাতে কিন্তু সে মরেও রেহাই পায় নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'জীবি

ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে সে মরেনি। 'ডাকিনী' গল্পে মল্লিকার মরার পর তার মৃতদেহটা দেখে সকলে ভেবেছিল, এতদিনে ডাকিনী তার দৈহিক খোলসটি ফেলে রেখে পালিয়েছে। সুতরাং কাদম্বিনীর চেয়ে মল্লিকার জীবনের ট্র্যাজেডী অনেক গভীরতর।

'পেন্সারবাবু' গল্পের বৃদ্ধ রতনমণিবাবু কর্মজীবনের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তিবশতঃ অফিসে যাওয়া বন্ধ করতে পারেননি। কিন্তু নতুন কাল ও নতুন মানুষদের কাছে তিনি যে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন সে শিক্ষা তাঁকে পেতে হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। 'নগেন হাঁড়ির ঢোল' 'বাগদত্তা' প্রভৃতি সামাজিক গল্প-গুলিও লক্ষণীয়। 'হাতি' গল্পে জমিদারের হাতির উপস্থিত বুদ্ধিতে জমিদার কন্যার বিবাহের রাত্রে উপযুক্ত পাত্র জুটিয়ে দেওয়ায় কাহিনীর মাধুর্য ফুটে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশী প্রেমের গল্প রচনার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁর মতে—"ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট, বার্ণাড শ ও ভালটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্যপক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতে ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।" (প্রমথনাথ বিশী লিখিত 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী' ১ম খণ্ডের ভূমিকা।) লেখকের এই সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রেমের গল্প আমরা পেয়েছি। 'উল্টাগাড়ি', 'মাধবীমাধী', 'অতি সাধারণ ঘটনা', 'বিপত্নীক', সুতপা', 'শকুন্তলা', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। 'শকুন্তলা' গল্পে কালিদাসের শকুন্তলার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অতীশ ও মালতীর প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনা করে লেখক রোমান্টিক প্রেমের আবেশ জাগালেও, বিবাহের পর তুচ্ছতার মধ্যে তাদের মোহভঙ্গ ঘটেছে।

শকুন্তলাকে তপোবনের শান্ত পরিবেশে দুষ্মন্তের যতই রোমান্টিক লাগুক না কেন, নাগরিক সভ্যতার সিংহাসনে আরোহণ করে শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন কেন ?

'স্বতপা' গল্পের শিক্ষয়িত্রী স্বতপা যখন জানতে পারল যে তার প্রণয়ী মিহির তারই আশ্রিত শিক্ষয়িত্রী রমার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ষড়যন্ত্র করেছে তখন নিজের মৃত্যু দিয়ে তাদের মিলনের পথ বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পের আরণ্য কিশোরী তুলসী নিবারণবাবুকে ভালোবেসে শহরে এসেছিল। নিবারণবাবুর মৃত্যুর পর অসহায়া তুলসী যখন আবার তার পুরাতন জায়গায় ফিরে গেল তখন সে দেখল—"যে মানুষকে এতকাল সে আশ্রয় করেছিল, সেও গিয়েছে আর যে জঙ্গল ওর পিতৃভূমি তাও গিয়েছে।"

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়, কিন্তু এই সময়সীমার মধ্যে তার বিপুল বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয়তা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। যে-সমস্ত ছোট গল্পকার বাংলা গল্পকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রমথনাথ বিশীও তাঁদের অন্যতম।